323.209597

B-243
W(9)

51985

2. 6.73

1-12-72—3,000

ভিয়েতনাম :

গেরিলাযুদ্ধের কাহিনী

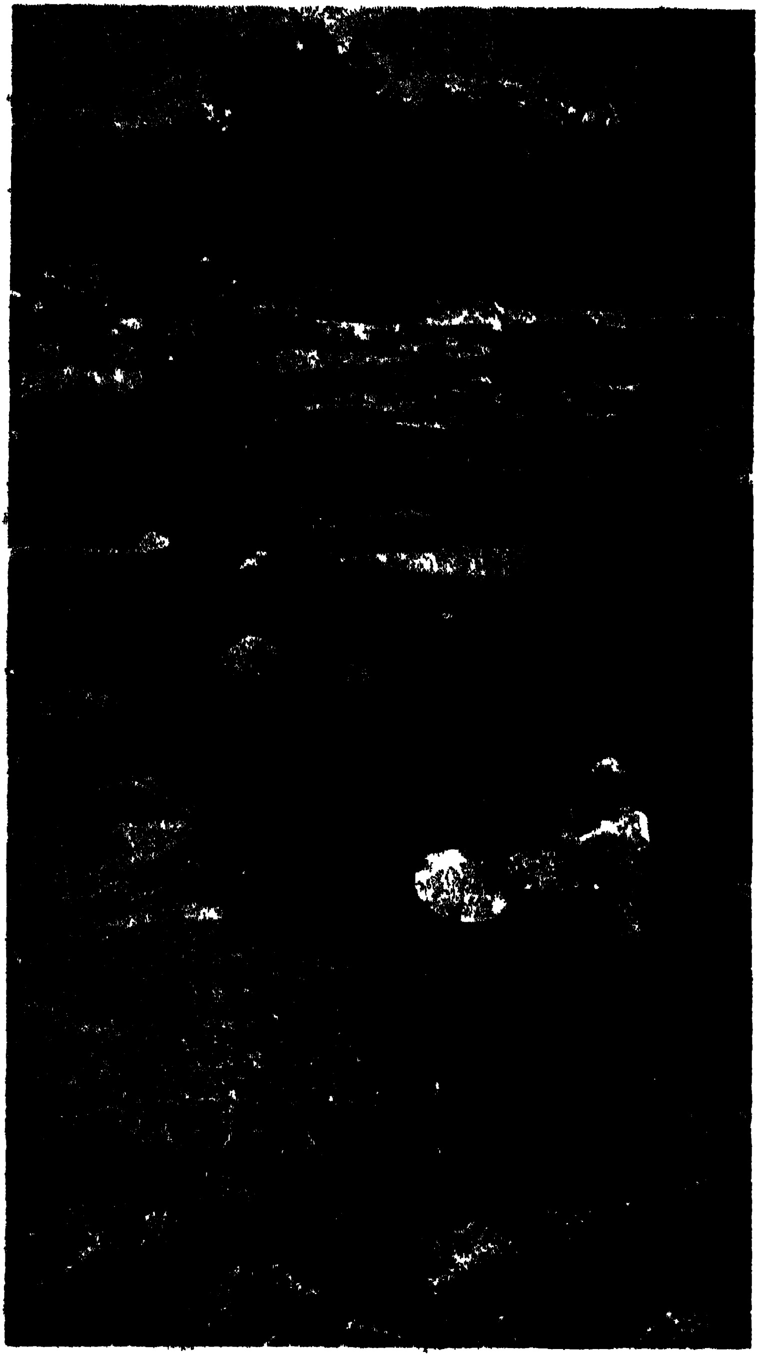
উইলফ্রেড বার্চেট

অনুবাদ : বিজন চক্রবর্তী

আনন্দধারা প্রকাশন



ভিয়েতনাম : মার্কিন অনুপ্রবেশের আগে



ধান ভানছে কৃষক পরিবার

প্রথম পরিচ্ছেদ

পার্বত্যাঞ্চল থেকে ॥ জংগলে সংঘর্ষ

একনাগাড়ে পথ চলার সেটা ছিল চতুর্থ দিন। একের-পর-এক [illegible]ড়া পর্বতশিরার ঢাল বেয়ে গত চারদিন ধরে আমরা সমানে চলে[illegible]লাম। খাদগুলোর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বর্ষাকালে তারা [illegible]ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। প্রতিটি খাদ হয়ে ওঠে ভয়াবহ গর্জনশীল [illegible]-একটি জলপ্রপাত। আমাদের ছোট্ট দলটিকে চলতে হচ্ছিল [illegible]ক গতিতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, এক একটি প্রস্তরখণ্ড অতিকষ্টে [illegible]তিক্রম করে। মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠছিল নিঃসীম [illegible]লিমায় পরিব্যাপ্ত কুয়াশাবৃত স্বপ্নময় গভীর অরণ্যানী। অপূর্ব সে [illegible]। অপূর্ব, কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নিবিড় অরণ্যের পর্দা সরিয়ে সহসা একটু হাতছানি দিয়ে প্রলুব্ধ করেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল তারা। মাঝে-মাঝে গভীর জলাশয় ছাড়া, প্রায়-খাড়া নালাগুলোতে জলের ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। নিষ্করুণ শুষ্কতার প্রতিমূর্তি যেন।

কিন্তু আশ্চর্য, পাথরগুলো ছিল বিপজ্জনক ভাবে পিছল। চড়াইগুলো ছিল আরো দুর্গম। মনে হচ্ছিল যেন ভয়ংকর খাড়া কোনো অন্তহীন সিঁড়ি বেয়ে আমরা উপরে উঠছি। তাও আবার এমন সিঁড়ি, যার মাঝোমাঝেই দু-তিনটি করে ধাপ বেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পরবর্তী ধাপে উঠতে হলে হাত এবং পা উভয়েরই সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সৌভাগ্যক্রমে বেশ শক্ত একটি প্রশিক্ষণ-কার্যক্রম পূর্বেই আমার মাংসপেশীগুলোকে এই ধরনের কঠিন কাজের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। তাই চড়াইগুলোর মোকাবিলা করা গেল কোনো রকমে। কিন্তু উত্তরাইগুলোই বিপদ বাধাল সবচাইতে [illegible]শী। কারণ পাথরের উপর পা পিছলে যাওয়া, কিংবা পায়ের

তলার পাথরটির নিঃশব্দে সরে যাওয়া এবং তড়িঘড়ি পা না-চালালে সেই চলমান প্রস্তরখণ্ডের অনুসরণ করে অতলে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রতি পদক্ষেপে। অবশ্য এ ধরনের কোনো কিছু আমার কপালে ঘটল না। কিন্তু আমার সঙ্গীদের এমনই কয়েকটি অনিবার্য সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আঁতকে উঠতে দেখেছিলাম।

আঁকা-বাঁকা পথের চাইতে নালার শুকনো খাতগুলোকেই আমার অধিকতর পছন্দ হয়েছিল। ঘন ঝোপ-ঝাড়ের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গের মতো সেগুলো চলে গেছে মাইলের পর মাইল। পা পিছলে অতলে গড়িয়ে যাবার কোনো ভয় নেই। সুতরাং, ছোট-ছোট, দুরন্ত স্বভাবের টাট্টু ঘোড়াগুলোর ঘাড়ের লোম ধরে ঝুলে থাকার চাইতে, নিজের পায়ে ভর করে পাহাড়ে আরোহণ করাটাই আমার নিরাপদ মনে হয়েছিল বেশী। যাত্রাপথের কোনো কোনো অংশে এই ধরনের ঘোড়া আমাদের দেওয়া হয়েছিল। এগুলো উপরে ওঠে বেড়ালের মতো এবং বে-এক্তিয়ার মোটর গাড়ির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, কিন্তু কখনো মুখ থুবড়ে পড়ে না।

সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল। তবু কুয়াশার মতো দমকা বৃষ্টিপাত ঝোপ-ঝাড়গুলোকে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। সেই প্রত্যূষে হিমশীতল জলের ফোঁটা টুপটাপ ঝরে পড়ছিল ঘাড়ের ওপরে। কিন্তু সেজন্য আমার কিছুমাত্র উদ্বেগ ছিল না। উদ্বিগ্ন ছিলাম অন্য কারণে। এড়াবার শত চেষ্টা সত্বেও, পাশের ডালপালার সঙ্গে শরীরের ঘষা লাগছিল এবং উপর থেকে লাফিয়ে পড়ছিল ছোট্ট-ছোট্ট সবুজ রংয়ের জোঁক; নরম, ঠাণ্ডা, জলের ফোঁটার মতো। পড়েই সুকৌশলে কামড়ে ধরছিল গায়ের চামড়া। জলের ফোঁটার সঙ্গে পার্থক্যটুকু মালুম হচ্ছিল তখনই, যখন দেখা যাচ্ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিকোণাকার দংশন-স্থান থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। এছাড়া ছিল সাধারণ কালো রংয়ের জোঁক। স্যাতসেঁতে মাটির উপর দিয়ে হাঁটবার সময় সেগুলো আক্রমণ করছিল পায়ে। আমাদের পায়ে ছিল রবারের টায়ারের চপ্পল। প্যান্টের পা-দুটো ছিল গোটানো।

সুতরাং সহজেই দেখা যাচ্ছিল কালো জোঁকগুলোকে। জ্বলন্ত সিগারেটের সামান্য স্পর্শেই সেগুলো কুঁকড়ে পড়ে যাচ্ছিল। নালার খাত ধরে গেলে ঝোপ-ঝাড়ের শীতল আলিঙ্গন এবং সবুজ জোঁক, এই দুইয়ের কবল থেকেই রেহাই মেলে। তাছাড়া নালার পাথুরে খাতে কালো জোঁকের উপদ্রবও কম। সুতরাং নালার পথ আমার বেশী পছন্দ হওয়ার কারণ ছিল যথেষ্ট।

সব চাইতে কাহিল হয়ে পড়েছিলাম খাদ্যের ব্যাপারে। শত্রু-পক্ষের ঘাঁটিগুলি ছিল আমাদের খুব কাছেই। একটু সন্দেহ হলেই সেদিক থেকে ছুটে আসবে বুলেটের ঝাঁক। পাহাড়ী জলাশয়গুলোতে মাছ ছিল প্রচুর। গেরিলারা মাঝে-মাঝে সোৎসাহে নিজেদের হাত-বোমাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাতও করছিল। এই বোমাগুলো হল তাদের মাছ ধরবার মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু সব কিছু থেকেও, মাছ ধরবার কোনো উপায় ছিল না। ধোঁয়া দেখলেই ছুটে আসবে বোমারু বিমানের ঝাঁক। তাই ভোরের আলো ফুটে ওঠবার আগেই সেরে ফেলতে হত রান্নার পাট। তারপর আবার উনন জ্বালানো হত সন্ধ্যার পর। তাও কেবল খানিকটা ম্যানিওকের শিকড় সিদ্ধ করবার জন্য।

সুতরাং, সেই সাত-সকালে তৈরী করা হত ভাতের মণ্ড। প্রাতরাশ, দুপুরের খাবার, সব কিছু সারতে হত এই ঠাণ্ডা বিরাট বিরাট ভাতের গোলা দিয়ে। অথচ শুধুমাত্র চা দিয়ে প্রাতরাশ করা আমার আজীবনের অভ্যাস। তাই ভাতের মণ্ডগুলো কিছুতেই গলা দিয়ে নামত না। প্যারাসুটের নাইলনে মোড়া ভাতের মণ্ডগুলোকে দেখতে ঠিক গেরিলাদের বেল্ট-এ আঁটা মাঝারি আকারের বোমার মতো।

সত্যিকারের বিপদে পড়ছিলাম বিচিত্র পুলগুলো পার হবার সময়। এই ধরনের সেতুর নির্মাণ-কৌশলও অদ্ভুত। যেগুলো একটু উন্নত ধরনের সেগুলো হল জংলী লতার দড়িতে বাঁধা ঝোলানো ধরনের। দু-ধারে দুটো লম্বা-বাঁশের মধ্যে পা রাখবার জন্য আড়া-আড়িভাবে পাতা-লতার ঘন-বোনা মাদুর। দুই পাশে লতার

রেলিং। তার উপর দিয়ে চলবার সময় দোলানির চোটে মনে হত বুঝি এখনি নিচে পড়ে যাবো। দড়ির বাঁধনগুলো মনে হত বুঝি এখনি খুলে যাবে। তবু রক্ষে, এই উন্নত ধরনের পুলগুলোতে পায়ের তলায় কিছু অন্ততঃ চেপ্‌টা এবং চওড়া বস্তু থাকতো। কিন্তু আরেক ধরনের পুল ছিল আরো মারাত্মক। পা রাখবার জন্য কতগুলো বাঁশ এক সংগে বাঁধা এবং বাঁশের অথবা চারাগাছের রেলিং। সবচাইতে ভয়ংকর ছিল একটিমাত্র গোল গুঁড়ি অথবা বাঁশের পুল।

রবার টায়ারের চপ্পল অন্যান্য কাজের পক্ষে অপূর্ব হলেও এক-গুঁড়ির পুল পার হবার পক্ষে ছিল মারাত্মক। বিশেষ করে গুঁড়ি-গুলো ভিজে এবং স্যাঁতসেঁতে হলে।

এই বিশেষ যাত্রাটির চতুর্থ দিনে সব কিছুই আমরা পেয়েছিলাম। সমস্ত রকমের পুল, সবুজ ও কালো জোঁক এবং নালার পথ। শেষ বিকেলের দিকে মনে হল সব বিপদ বুঝি কেটে গেছে। বেশ খানিকটা ফাঁকা সমতল জায়গায় বেরিয়ে এলাম। মাঝে-মাঝে পরিষ্কার জায়গা, ইতঃস্তত ঝোপ-ঝাড়। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে আমি একটা ঝোপের মধ্যে ছিটকে পড়লাম। বেশ একটা ব্যস্ততার ভাব ফুটে উঠল সকলের চোখ মুখে। কারবাইনগুলোতে গুলি ভরা হল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে দুজন ছিল ম'নঙ্ গোষ্ঠীর লোক। খানিকটা ফিসফিস আলোচনার পর যে পথ ধরে আমরা চলেছিলাম, সেই পথে তাঁরা দুজন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একজনের হাতে রাইফেল, অন্য জনের হাতে হালকা মেশিনগান। আমাকে খুব সাবধানে জঙ্গলের গভীরতর একটি স্থানে সরিয়ে দেওয়া হল। উন্মুক্ত স্থানটির অন্যধারে অনুরূপ আরেকটি দাগের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দোভাষী। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছু নজরে পড়ল না। শুধু কানে এল মানুষের কণ্ঠস্বর, এবং চশমার আড়াল থেকে আমার দিকে তাকিয়ে দোভাষী ফিসফিস করে একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন "শত্রু"। তাঁর ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হল, শত্রুদল এবং আমরা কাছাকাছি এবং প্রায় সমান্তরাল পথ ধরে

এতক্ষণ হেঁটেছি। আর প্রায় দু'শো গজ এগিয়েই পথ দুটো একসংগে মিশেছে। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। সঙ্গী গেরিলা কয়েকজন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন এবং গাছের গুঁড়ি ও বড়-বড় ঘাসের ঝোপের আড়ালে গিয়ে সাপের মতো পেটের উপর ভর দিয়ে শুয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

কথাবার্তার আওয়াজ মিলিয়ে গেল। নেমে এল কঠিন স্তব্ধতা। তারপর অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধতা খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ল আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দে। শব্দটা আসছিল আমাদের গন্তব্যপথের সামনের দিক থেকে।

আমার দোভাষীর নাম থান্। সায়গনে তিনি ডাক্তারী পড়তেন। তারপর পড়াশুনা ত্যাগ করে প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দেন। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনের সংগে সংগে তিনি আমাকে একটা বিশাল গাছের আড়ালে মাটির উপর চেপে ধরলেন। আমাদের কর্মসূচীর মধ্যে কোনো কিছু গণ্ডগোল হলেই থানের মুখে, চাপা ঠোঁটে এবং লোমশ ভ্রূতে ফুটে উঠত ব্যথিত একটা ভাব। এবারও সেই ব্যাপারটি লক্ষ্য করলাম। পরবর্তী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শোনা গেল প্রচুর গুলি বিনিময়ের আওয়াজ। মনে হল, স্বয়ং-ক্রিয় রাইফেল এবং কার-বাইনের শব্দগুলো আসছে আমাদের ঠিক সম্মুখে অবস্থিত একটি অর্ধচন্দ্রাকার স্থান থেকে, এবং প্রত্যুত্তরে গুলির আওয়াজ আসছে আমাদের সোজাসুজি কোনো নিকটবর্তী স্থান থেকে। ক্ষণিক বিরতি; তারপর আবার শোনা গেল কণ্ঠস্বর। এবার বেশ উত্তেজিত। তারপর দেখলাম, আমাদের গেরিলারা মাটির সংগে মিশে আগ্নেয়াস্ত্রের নিশানা ঠিক করছে। সেই সংগে নজরে পড়ল সবুজ ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে দ্রুত ধাবমান কয়েকটি মূর্তি।

আবার মুখরিত হয়ে উঠল বনভূমি। আগুনের ঝলক ফুটে উঠল গেরিলাদের কারবাইনগুলোতে। এবং থান আমার মাথাটাকে আবার সজোরে মাটির উপরে চেপে ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম কয়েকটি মূর্তি দ্রুত পিছনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার

অগ্ন্যুদ্গারণ করল গেরিলাদের কারবাইন। তারপর চক্ষের নিমেষে তারা শত্রুর পলায়ন-পথের সমান্তরালভাবে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে আবার গুলি চালালো। এইভাবে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে করতে অবিরাম গুলি চালিয়ে গেল তারা। কিন্তু সেই অগ্ন্যুদ্গারের কোনো জবাব এল না; এবং অনতিবিলম্বেই বনভূমি আবার শান্ত হয়ে পড়ল।

কয়েক মিনিট বাদেই ম'নঙ্ দু'জন ফিরে এল হাসতে হাসতে। দ্রুত পরামর্শের উদ্দেশ্যে আমাদের দলটি আবার জড়ো হল এক জায়গায়। থান্ বললেন,—"শত্রু পালিয়েছে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে। এখনো পার হতে বাকি আছে বিরাট একটা খোলা জায়গা। ওই সৈন্যেরা এখনি আশ-পাশের ঘাঁটিগুলোকে সাবধান করে দেবে। অবশ্য এখনো যদি তারা গুলির শব্দ না শুনে থাকে।"

আমি ক্ষয়-ক্ষতির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। গেরিলাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে থান্ জবাব দিলেন,—"ওদের মারবার জন্য আমাদের লোকেরা গুলি চালায় নি। আসল উদ্দেশ্য ছিল ওদের ভাগিয়ে দেওয়া। যে দুজন কমরেড প্রথমে গিয়েছিল, তারা শত্রুসৈন্যের সম্মুখভাগে বিভিন্ন স্থানে থেকে গুলি চালিয়েছে। আর অগ্রসর হলে আমাদের বিরাট একটি বাহিনীর মুখে তারা পড়বে এই ভয়টা তাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। আসলে তাদের আমরা আঘাত করতে চাই নি। কারণ সে ক্ষেত্রে বিমান আক্রমণের আশংকা আছে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল আজ রাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আপনাকে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া। ওই লোকগুলো হল শত্রুর পদাতিক বাহিনীর একটি ছোট অংশ অথবা টহলদারী কোনো দল। সাধারণতঃ এই অঞ্চলে এটা দেখা যায় না। মনে হয়, ওরা নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে গেছে। তবু এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার উদ্দেশ্যে আমাদের একজন কমরেড অনুসরণ করেছে ওদের।"

নিজের নিজের হ্যাভারস্যাক আবার আমরা কাঁধে তুলে নিলাম। এবার চললাম অপেক্ষাকৃত হালকা গাছ-পালার ভিতর দিয়ে। আধ ঘণ্টা মত হাঁটবার পর প্রায় আধ মাইল চওড়া একটা খোলা জায়গায় পৌঁছুলাম। মনে হল, পথের ওপাশ থেকেই শুরু হয়েছে গভীর জংগল। আমার আপত্তি সত্ত্বেও, ম'নঙ্‌দের একজন আমার হ্যাভার-স্যাকটি নিয়ে নিল, এবং থান্‌ বললেন—"সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের ছুটতে হবে।" এ অভ্যাস অবশ্য আমার আগে থেকেই ছিল। এক-নাগাড়ে পনের মিনিট দৌড়, এবং একনাগাড়ে দু-ঘণ্টা দ্রুততম গতিতে কাজ করা—এ দুটির ট্রেনিং আগেই নিয়েছিলাম। আজ মনে হল, সেই ট্রেনিং বোধ হয় নিয়েছিলাম এই রকম অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্যই।

দ্রুতগতিতে আমরা রওনা হলাম। উন্মুক্ত স্থানের মাঝামাঝি পৌঁছুতেই দেখলাম, ম'নঙ্‌টি আমাদের পিছন দিকে আকাশপানে চাইছেন। ম'নঙেরা হল বিখ্যাত হস্তিশিকারী; এবং তাদের বড়-বড় কানের জন্যও তারা প্রসিদ্ধ। লোকটির সন্দেহ যথার্থ প্রমাণিত হল। কয়েক মুহূর্তের ভিতরেই শোনা গেল হেলিকপ্টারের গম্ভীর গর্জন। এবার আমরা সত্যিই দ্রুত ছুটলাম। হিসাব করে দেখলাম, ধীরে-সুস্থে চললেও আমাদের হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে। এবং, যদিও হেলিকপ্টারগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, তবু পাঁচ মিনিটের মধ্যে তারা যে কী করতে পারে তা' জানাই আছে। শব্দটা ক্রমশঃ কর্ণবিদারী গর্জনের রূপ নিল। তারপর চারটি কালো, জবুথবু আকার, খুব নিচু দিয়ে উড়তে উড়তে এসে দর্শন দিল একটু আগে জংগলের যে রাস্তা আমরা ছেড়ে এসেছি, সেখানে। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত ঠিক যেন চারটি শকুনি। যেন, আমাদের অবস্থান তারা সঠিক জানে। এবার আমরা শ্লথগতিতে চলতে শুরু করে দিয়েছিলাম। কয়েকজন গেরিলা গুলি চালাবার মত উপযুক্ত স্থান বেছে নিয়ে অস্ত্র-গুলো ঠিক করে নিল। আমাকে ইঙ্গিতে বলা হল প্রাণপণে দৌড়ুতে। শেষ শ' দুয়েক গজ আমরা চারজন পড়িমরি করে ছুটলাম। এবং

গুলিবৃষ্টি শুরু হবার প্রায় সংগে সংগেই বলতে গেলে, ঝাঁপিয়ে পড়লাম জংগলের ভিতরে। কাছেই একটা পাথর বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে একটা গুহার মতো সৃষ্টি করেছিল। গাছ-পালার আড়ালে ঢাকা সেই গুহার দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল।

হেলিকপ্টার থেকে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ হল ঝাঁকে ঝাঁকে। গেরিলারা সংখ্যায় ছিল সামান্য কয়েকজন। তবু তাদের দিক থেকে জলস্রোতের মতো প্রবাহিত হতে থাকল স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং কারবাইনের গুলি। সঙ্গীদের মুখভাব এবং চারিদিকের পরিস্থিতি দেখে বুঝলাম, আমাদের যাত্রা শুরু হবার পর থেকে আজ এই প্রথম যথার্থ কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়েছি। চারটি হেলিকপ্টারে ধরে আশি থেকে একশ জন সৈন্যের একটি কম্পানি। পক্ষান্তরে, আমাকে নিয়ে আমরা ছিলাম মাত্র দশ জন। লক্ষ্যস্থল স্থির করবার উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারগুলো উন্মত্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে; গর্জন করছে ভয়ংকরভাবে। আর কোনো শব্দ ধরবার মতো স্থান কানে ছিল না। তবু মোটরের শব্দ ছাপিয়ে উঠেছিল তাদের মেশিনগানের নির্ঘোষ এবং প্রত্যুত্তরে গেরিলাদের সামান্য দুটি মেশিনগানের করুণ, অসম আওয়াজ। হেলিকপ্টারগুলো নাছোড়বান্দার মতো ঘুরতে লাগল। মনে হল, যেন তারা অবতরণের স্থান খুঁজছে।

হঠাৎ চৌকোণা, তিমিমাছের মতো এক আকাশমুখো করে হেলিকপ্টারগুলোর মোটর গর্জে উঠল আলো জ্বেলে। তারপর অস্তগামী সূর্যকিরণের মধ্যে উপর পানে উড়তে-উড়তে দূরে চলে গেল। আমরা জংগলের কিনারা অভিমুখে ছুটলাম, এবং গেরিলারা এক-এক করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতেই আনন্দে আমার চোখে প্রায় জল এসে গেল। 'কেউ আহত হয়েছে কি না?' এইটাই ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন। কেউ আহত হয় নি শুনে আশ্বস্ত হয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম, কেন হেলিকপ্টারগুলো নামল না!

"চারিদিকে ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন কেন তারা নামে নি", দলের ছোট্ট, গাঁট্টাগোট্টা সর্দার দিন্‌হ্‌ জবাব দিলেন।

ভাল করে তাকাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আশ্রয়ের জন্য ছুটোছুটি করছিলাম বলে এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। ফাঁকা স্থানটির অপর অর্ধেক অংশ জুড়ে রয়েছে সমান দূরত্বে মাটিতে পোঁতা দশ থেকে পনের ফুট উঁচু, তীক্ষ্ণ, ছুঁচলো মুখের অসংখ্য খুঁটি। দিন্‌হ্‌ আবার বললেন, "হেলিকপ্টারগুলো এখানে নামলেই হয় তাদের প্রপেলার ভাঙতো, নইলে নিজেরাই ওই খুঁটিগুলোতে গেঁথে যেত। ওই খুঁটিগুলো খুব বিজ্ঞানসম্মতভাবে বসানো হয়েছে। এই কারণেই হেলিকপ্টারগুলো এতক্ষণ ধরে একটু ফাঁক খোঁজবার উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।"

"কিন্তু অন্য অংশে, যেখানে খুঁটি নেই, সেখানে তারা নামলো না কেন?" আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

দু'পাটি দাঁত বার করে হেসে ফেললেন দিন্‌হ্‌। "নামলো না, কারণ সেটা হত বৃথা। লক্ষ্যবস্তুর উপর সোজা ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলে এই হেলিকপ্টারগুলো কিছুই করতে পারে না। দালালেরা এই কৌশলের নাম দিয়েছে 'ঈগলের মুরগির বাচ্চা ধরা'। আমাদের গুলিবর্ষণের মুখে যদি তাদের সৈন্যদের কয়েক শ গজও এগুতে হয়, তাহলে তাদের ক্ষয়-ক্ষতি হবেই; এবং একবার ক্ষয়-ক্ষতি হলেই তারা হয়ে পড়বে ছত্রভঙ্গ। যাই হোক, আমরা যে জংগলের ধারেই রয়েছি এটা তারা জানতো এও জানাতো যে আমরা সংঘর্ষ এড়াতে চাইলে, খোলা জায়গার আধ মাইল অংশও যতক্ষণে তারা অতিক্রম করবে, ততক্ষণে, আমরা গভীর জংগলে অদৃশ্য হয়ে যাবো। সেখানে আমাদের অনুসরণ করবার সাহস ওদের নেই। এদিকে সূর্যও অস্ত যেতে বসেছে। অন্ধকার নামবার পর ওরা আর বাইরে থাকে না। তা'ছাড়া, আমাদের গুলি বর্ষণে ওদের হেলিকপ্টারগুলো নিশ্চয়ই কিছুটা জখম হয়েছে। হেলিকপ্টারগুলো লক্ষ্য করেই আমরা গুলি চালিয়েছিলাম। এবং সেই গুলি সরাসরি ওদের আঘাত করতে আমি দেখেছি। কিন্তু ওগুলোকে নিচে পেড়ে ফেলতে হলে বিশেষ কয়েকটি স্থানে আঘাত করা দরকার। আমাদের

অভিজ্ঞতা বলে, যে মুহূর্তে ওদের হেলিকপ্টারগুলোকে আঘাত করা হয়, সেই মুহূর্তেই ওরা সরে পড়ে। তাই, পরিস্থিতি যদিও আপনার কাছে খুব ভাল মনে হয় নি, আসলে কিন্তু উদ্বিগ্ন হবার মতো কিছুই ছিল না।"

"কিন্তু ওদের মেশিনগানের আওয়াজ বেশ গুরুগম্ভীর শোনাচ্ছিল।"

"ফুঃ! ওই আওয়াজ মাত্রই সার," অবজ্ঞাভরে জবাব দিলেন দিন্ হ্। "ওগুলো অকারণে ভয়ানক শব্দ করে। পাগলের মতো এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। প্রথম-প্রথম আমরাও বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম। ওদের গুলি চালানো এবার ভাল করে লক্ষ্য করেছি। একজনকে দেখলাম হেলিকপ্টারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গুলি করছে; কিন্তু মেশিনগানের নিশানা দেখে পরিষ্কার বুঝলাম, গুলি আমাদের ধারে-কাছেই আসছে না। আমার ধারণা, নিজেদের সাহস দেবার জন্যই ওরা গুলি ছোঁড়ে। যাই হোক, আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যাব। শত্রুরা সেখানে প্রবেশ করতে কখনই সাহস করে না।"

কথা মতো সূর্য অস্ত যাবার সামান্য পরেই আমাদের দেখা হল সহাস্য মুখ, ম'নঙ্ গেরিলাদের ছোট্ট একটি দলের সংগে। তারা আমাদের আরো আধ ঘণ্টা ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল কতগুলো কুড়ে ঘরের দিকে। রান্নার আগুন জ্বলছিল; ভাতের পাত্র চাপান ছিল উননের উপর। পরে অবশ্য আবিষ্কার করলাম, পাত্রগুলোতে ভাত ছিল না। ছিল অপূর্বস্বাদের বানরের মাংসের ঝোল।

নাম্ বো-তে

কাঁধের ওপর হালকা একটা স্পর্শ পেতেই চট করে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই দেখলাম ছিপছিপে, তামাটে মুখের আমার পথপ্রদর্শক হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঠোঁটের উপর তাঁর

একটা আঙুল। নিঃশব্দ থাকবার ইংগিত।

এই দোলনা বিছানাটায় সারাদিন এবং বেশ কিছুটা রাত-অবধি বিশ্রাম নিয়েছি। এখন নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামতেই প্রায় এক ডজন নতুন মুখের গেরিলা আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। এত-দিনের পরিচিত পথ প্রদর্শক ম'নঙ্‌ উপজাতীয় গেরিলাটি আগের মতোই দ্রুত আমার দোলনা বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে একটা থলের মধ্যে ভরে ফেললেন। তারপর আমার দিকে ফিরে নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর হাতখানা। উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম। তাঁর চোখে জল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমরা একসংগে কখনো পদব্রজে, কখনো বা ঘোড়ার পিঠে ভ্রমণ করেছি। এক সংগে ভাগ করে নিয়েছি কষ্ট এবং বিপদ। তাঁর শেষ দায়িত্ব ছিল আমাকে এই স্থানে পৌঁছে অন্যদের হাতে তুলে দেওয়া। উদ্যত রাইফেল হাতে নবাগতেরা আমাকে ছোট্ট লাইনটির ভিতরে স্থান গ্রহণ করতে ইংগিত করল। আমার ম'নঙ্‌ বন্ধু সেই গাছটির কাছেই দাঁড়িয়ে-ছিলেন। কয়েক মিনিট আগে ওই গাছটি থেকেই তিনি আমার দোলনা বিছানাটা নামিয়েছেন। শেষ বারের মতো তাঁর উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে যাত্রা শুরু করলাম। সংগে সংগে তাঁকে এবং গাছটিকে গ্রাস করে নিল নিকষকালো অন্ধকার।

একটি শব্দও উচ্চারিত হল না এই নিঃশব্দতা কিন্তু পরস্পরের ভাষা না বোঝবার দরুণ ততটা ছিল না। আসল কারণ, আমরা যাচ্ছিলাম শত্রু-এলাকার ভিতর দিয়ে। আমি যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলাম শত্রুর নিকটতম ঘাঁটি ছিল সেখান থেকে এক হাজার গজেরও কম দূরত্বে। এবং মিত্র-এলাকায় পৌঁছুবার আগে, শত্রু-ঘাঁটির আরো কাছ দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছিল। ম'নঙ্‌ পথ প্রদর্শকটি মাটির ওপর ছোট্ট একটি মানচিত্র বিছিয়ে সাবধানতা অবলম্বনের গুরুত্ব আমাদের পূর্বেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

গভীর অন্ধকারের জন্য প্রথমে আমি আমার সম্মুখবর্তী গেরিলাটির কাঁধের রাইফেলের নল ধরে পথ চলছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই তার

পিঠের হ্যাভারস্যাকের সাদা ত্রিকোণটি দেখতে পেলাম। এবার বিনা অবলম্বনেই তাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করা বেশ সহজ হল। এবং এই ভাবেই সেই সরু, আঁকাবাঁকা পথে ভুলদিক এড়িয়ে যেতে পারলাম। পায়ের নিচে শুকনো পাতাগুলো খরখর আওয়াজ তুলছিল। তবুও আমরা যথাসাধ্য নিঃশব্দে এবং দ্রুতগতিতে চলতে লাগলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বসলাম একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর। সেই সময় গেরিলারা আরো সাবধান হতে ইশারা করল। কারণ জায়গাটা ছিল শত্রু-ঘাঁটির সবচাইতে কাছাকাছি। কয়েক মিনিট পর আর একজন গেরিলা এসে জানাল সব ঠিক আছে, এবং আমরা যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারি। সংগে সংগে আবার পথচলা শুরু হল। এবার হাঁটলাম ঠিক দুটি ঘণ্টা। সেই অন্ধকারের মধ্যেই একাধিকবার আমাদের এক-গুঁড়ি-বিশিষ্ট ভয়াবহ সেতু পার হতে হল।

অবশেষে থামলাম। পিঠের হ্যাভারস্যাকগুলো মাটিতে জড়ো করে রাখা হল। গেরিলাদের মুখে দেখা দিল নিশ্চিন্ততার হাসি। পরস্পরের হাত মেলানোর সংগে শোনা গেল একটি শব্দ—'নাম্-বো।' সিগারেট ধরান হল। সবাই বিশ্রামের জন্য এলিয়ে পড়লাম। আবার আমরা মিত্র এলাকায় পৌঁচেছি। আমার কাছে সেটা ছিল এক আবেগপূর্ণ মুহূর্ত। কারণ এতদিনে আমি সত্যিকারের দক্ষিণে পৌঁছেছি। উপস্থিত হয়েছি 'নাম্-বো'-তে (কোচিন চায়নায়)*। এবং সায়গনের শহরতলীতে পৌঁছে যখন খোদ রাজধানীর প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধের মূলসূত্র অনুধাবন করতে পারব, তখনই

---

* ভিয়েনামীদের কাছে তাদের দেশ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। উত্তরে বাক্-বো; ফরাসীরা যাকে বলত টন্‌কিং। মধ্যস্থলে হল ত্রাঙবো অথবা আন্নাম্; যেটাকে বর্তমানে সপ্তদশ অক্ষরেখা বরাবর দু'ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। এবং দক্ষিণে হল নাম্-বো অথবা কোচিন চায়না। এর আগে আমি বেশ কয়েক সপ্তাহ ছিলাম ত্রাঙবো-র অন্তর্গত পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল তে-নুয়েন'এ।

যাত্রাপথে আমার হবে এই ভ্রমণের বিশিষ্টতম অভিজ্ঞতা-লাভ। এ বিষয়ে আমি ছিলাম নিশ্চিত। এখন বার্তালাপের একমাত্র অন্তরায় হল ভাষার প্রভেদ। আমার ছিল সামান্য কয়েকটি ভিয়েতনামী শব্দের জ্ঞান এবং তাদের ছিল সামান্য কয়েকটি ফরাসী শব্দের ভাণ্ডার।

বিশ্রাম করতে করতেই লক্ষ্য করলাম, দু-জন গেরিলা তাদের ছুরি বার করে ছোট্ট একটা গাছ কেটে ফেলল। তারপর সেটাকে চেঁচে-ছুলে পরিষ্কার করে আমার দোলনা বিছানার দড়িগুলো বেঁধে ফেলল সেটার দুই মুখে। ভাবলাম- এটা বোধ হয় আমার দোলনা-বিছানা টাঙাবার নতুন উপায়। সম্ভবতঃ এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব আছে তাই এরা আমাকে গাছের উপরে বেশ উঁচুতে রাখতে চায়। ধূমপান শেষ হবার পর দলের নেতা ইশারায় আমাকে সেই দোলনায় উঠতে বললেন। দু-জন গেরিলার কাঁধে দোলনাটা এবার হল একটা পাল্‌কির মতো দেখতে। গেরিলা দু-জনের আকার আমার অর্ধেক। সুতরাং, জবাবে আমি তাদের আহ্বান জানালাম আমার পায়ের লোহার মতো শক্ত পেশীগুলো পরীক্ষা করে দেখতে। কিছুক্ষণ হাসা-হাসি এবং অনুচ্চ কথোপকথনের পর খুলে ফেলা হল দোলনাটাকে। কাঠের খুঁটিটা পরিত্যক্ত হল।

পরদিন একজন দোভাষী হাজির হতেই ব্যাপারটা জানতে পারলাম। গেরিলাদের খবর দেওয়া হয়েছিল . . আমি বৃদ্ধ এবং হাঁটতে অভ্যস্ত নই। আমার বাহান্ন বছর বয়স, এবং পূর্ববর্তী কয়েক-মাসের কার্যকলাপের প্রতি এটা ছিল একটা অপমান। এবং, এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে দেখেছিলাম, গেরিলারা ভুল সংবাদ পেয়েছে।

এবার তারা তাদের বোতল-বাতিগুলো জ্বেলে ফেলল এবং শুরু হল আমাদের পথ-চলা। আমরা যে মিত্র এলাকার ভিতর দিয়ে চলেছি, সম্ভবতঃ সেটা বোঝাবার জন্যই ... তারা মাঝে-মাঝে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল। থেকে থেকে তাদের কেউ একজন একটা বড় পাতা গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে বাতির পিছন দিকে ধরছিল যাতে আলো প্রতিফলত হয়ে সামনের পথের উপর

পড়ে। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ইলেক্ট্রিক টর্চ কি আরো সুবিধা জনক নয়?" জবাব এল, "না, কারণ অন্যান্য অসুবিধা ছাড়াও, এই আবহাওয়ায় ব্যাটারি সঞ্চিত করে রাখা খুব কঠিন। পক্ষান্তরে যাতায়াতের পথ বরাবর গোপনস্থানে অনির্দিষ্টকালের জন্য কেরোসিন তেল সঞ্চিত করে রাখা যায়।" বাতিগুলোর বিশেষত্বও রয়েছে। ফরাসী প্রসাধন সামগ্রীর বোতল দিয়ে সেগুলো তৈরী। পলতে আটকানো হয় একটি তামার নলে। তারপর সেটাকে লাগানো হয় ৩০৩ নং টোটার খোলে। সংগে থাকে একটা স্প্রীং। ফলে, খোলটা উন্মুক্ত করবার সঙ্গে-সঙ্গেই পলতেটা বেরিয়ে আসে। গেরিলাদের প্রখ্যাত নৈশকালীন আক্রমণাত্মক অভিযানে পথ দেখাতে এই বাতি-গুলোর অবদান হল অপরিসীম।

তখনো আমরা চলেছিলাম গভীরতম অরণ্যের মধ্যে দিয়ে। নিচের ঝোপ-ঝাড় এবং বাঁশবনের তলা দিয়ে আমাদের পথটি সুড়ঙ্গের মতো চলে গেছে। 'নাম্-বো'-তে সে সময়টা ছিল শুকনোর সময়। তাই পথ ছিল বেশ ভাল। জেঁাকও ছিল না। প্রথম দিকে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভংগ হচ্ছিল কেবলমাত্র নিশাচর পাখিদের ডাকে এবং আমাদের পায়ের চাপে শুকনো পাতার শব্দে। পরে অবশ্য শুনতে পেলাম দূরে কোথাও কামানের গোলা ফাটবার কয়েকটি চাপা শব্দ।

চার ঘণ্টা ধরে পথ চলবার পর এবং শেষবারের মতো সেই ভয়াবহ একটা কাঠের পুল পার হয়ে, আমরা হাজির হলাম একত্রে ঠাসাঠাসি গুটিকয়েক কুটিরের কাছে। এখানেই আমাদের রাত্রিবাস করতে হবে। আমাদের দলনেতা জিদ ধরলেন যাতে আমি একটা কুটিরের ভিতরে বিছানায় শয়ন করি। আমার কিন্তু আগাগোড়াই পছন্দ ছিল গাছের ডালে ঝোলানো দোলনা-বিছানা। কিন্তু নেতা জানালেন এখানে বাঘের উপদ্রব আছে। অগত্যা তাঁর কথা রাখতে হল। এবং 'নাম্-বো'-তে আমার প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করলাম বাঁশের বাতা জোড়া দেওয়া একটা নিষ্করুণ শক্ত বিছানায়। ওপরে একটা

খড়ের মাদুর বিছানো। তাতে কাঠিন্য বিন্দুমাত্রও কমে না। তার ওপর চারিপাশে নানা বয়সের শত শত শুয়োর। থেকে থেকে এক বা একাধিক শুয়োর এসে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে আমার খাটের পায়ায় পিঠ ঘষছে। থেকে-থেকে আবার দলবদ্ধভাবে বীভৎস চিৎকার। কখনো সম্পূর্ণ দলটি ছুটতে ছুটতে বনের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আবার কয়েক মিনিট বাদে সেই বেগেই চীৎকার করতে করতে ফিরে আসছে ঘরের মধ্যে। অনুমান করলাম, আশে পাশে নিশ্চয়ই কোন বন্যজন্তু রয়েছে। তাই শুয়োরগুলো হয়ে পড়েছে চঞ্চল।

পরের দিন আবিষ্কার করলাম, কুটিরগুলো হল মুক্তি ফৌজের ছোট্ট একটি দলের। অন্যান্য দলের মতোই এরাও চাষবাস করে। শুয়োর এবং মুরগী পোষা হল তাদের একটি আবশ্যিক কাজ। পরে একটা অপূর্ব শব্জি বাগান দেখলাম। সারবন্দী করে লাগানো রয়েছে পেঁপে, নারকোল এবং কলাগাছ। বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্যে আগত শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্য সম্পূর্ণ বাগানটিকে আশপাশের জংগলের সংগে অদ্ভুতভাবে মিলে-মিশে একাকার করে রাখা হয়েছে। বাগানে কর্মরত একজন সৈনিক চটপট একটা নারকোল গাছে উঠে কয়েকটা ডাব ফেলে দিল। প্রথমেই ডাবের জল দিয়ে অতিথিকে আপ্যায়িত করা হল 'নাম্-বো'র ঐতিহ্য। ডাবের জল পান করা শেষ হতে না হতেই, জংগলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি দল। কাঁধে তাদের রাইফেল। এই দলটিই এবার আমাকে নিয়ে যাবে। ফরাসী-জানা একজন দোভাষীও ছিলেন তাদের মধ্যে।

অভিনন্দন এবং পরিচয় আদান-প্রদানের পর, তারা খুব সন্তর্পণে জানতে চাইল আমি বেশ কিছু সময়ের জন্য সাইকেল চালাতে পারব কি না! 'তে-হুয়েন্'-এ সামান্য দু-একবার সাইকেলে চড়া ছাড়া, তিরিশ বছরের বেশী হল আমি সাইকেল চালান ছেড়ে দিয়েছি। বললাম, সম্ভবতঃ পারব, তবে হেঁটে যাওয়াই আমার বেশী পছন্দ।

অপরাহ্নে আমরা রওনা হলাম। চার ঘণ্টা হাঁটবার পর এসে পৌঁছুলাম আর এক সারি কুটিরের সামনে। কুটিরগুলো আরো

সুন্দর। সঙ্গে রয়েছে 'দিয়েন-বিয়েন্-ফু'-স্নান্না ঘর। ফরাসীরা যে যুদ্ধে শেষ পরাজয় বরণ করে, সেই 'দিয়েন-বিয়েন-ফু'র যুদ্ধের সময়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল এই ধরনের রান্নার ব্যবস্থা। বিরাট পরিখার মধ্যে উনুনগুলো মাটির নিচে সাজানো ; সাধারণতঃ বাঁশের মেঝে কেটে তৈরী করা। ওপরে খড়ের চাল। চিমনীর পরিবর্তে প্রতিটি উনন থেকে সমান্তরালভাবে অথবা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে জংগলের মধ্যে চলে গেছে সুড়ংগ পথ। সুড়ংগের মাটির দেওয়াল-গুলোই অধিকাংশ ধোঁয়া টেনে নেয়। অবশিষ্ট ধোঁয়া মিশে যায় ঝোপ-ঝাড়ের সংগে। এই ব্যাপারটির গুরুত্ব হল সর্বাধিক। কারণ ধোঁয়ার সামান্যতম চিহ্ন মার্কিন বৈমানিকদের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ায় ; এবং তারাই পরিচালনা করে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিমান-বহর তথা বিমান-যুদ্ধ।

ইয়াংকিদের সম্ভবতঃ দৃঢ় বিশ্বাস যে জীবনের অস্তিত্ব ছাড়া ধোঁয়া হতে পারে না ; এবং শহর ও বন্দীশিবিরে পরিণত গ্রামগুলির বাইরে জীবনের অস্তিত্বের অর্থই হল শত্রুদের অস্তিত্ব। যে-কোন ধরনের জীবনের অস্তিত্ব অথবা চিহ্ন, তা' মানুষ, জীবজন্তু অথবা সাকশব্জি, খাদ্যশস্য বা ফলের বাগান যাই হোক, তা' হল তাদের নাপাম্ বোমা অথবা বিমান হতে ছড়িয়ে দেওয়া রাসায়নিক বিষের লক্ষ্য স্থল। ভুট্টা অথবা ধানের ক্ষেত যে মুহূর্তে সবুজ হয়ে উঠেছে, সেই মুহূর্তে সেগুলো বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে ওরা বিমান থেকে ছত্রী বাহিনী অথবা হেলিকপ্টার থেকে সেনাবাহিনী নামিয়ে দিয়েছে সেখানে। 'তে-হুয়েন্'-এ এ-রকম অসংখ্য ঘটনার কথা আমি শুনেছি। ক্ষেতের পাকা শস্য নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে ওরা নিয়মিতভাবে নাপাম্ বোমা ব্যবহার করে। মাঠে চাষরত কোন চাষী, ডোবায় গড়াগড়ি দেওয়া অবস্থায় কোনো মোষ, অথবা ধান কেটে নেবার পর সেই ক্ষেতে ক্রীড়ারত কোনো মহিষ-শাবক ; চাষের জমির মধ্যে চকিতে দেখা কোন সবুজ একটুকরো জমি—এ সমস্তই হল মার্কিন বৈমানিকদের প্রাথমিক লক্ষ্যস্থল। এবং তারা একলাই চালিয়ে যাচ্ছে এই বিমান-

যুদ্ধ। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে জেঃ গুয়েন্ খান সায়গনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পরিবেশিত পরিসংখ্যা অনুযায়ী, ১৯৬৩ সালে "ভিয়েতকং"-দের যে পরিমাণ ক্ষতি করা হয়েছে বলে সায়গন দাবি করেছিল, তার অর্ধেকই হয়েছিল বিমান আক্রমণের কারণে। বৈমানিকরা যে কীভাবে "ভিয়েৎকং" এবং সাধারণ চাষীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছিল, সে তত্ত্বটুকু কিন্তু স্পষ্ট করে বলা হয় নি।

সুতরাং দক্ষিণাঞ্চলে প্রবর্তিত দিয়েন-বিয়েন-ফু রন্ধন ব্যবস্থা ছিল বিরাট একটি আবিষ্কার। বিশেষ করে এর সমধিক গুরুত্ব ছিল সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে যাদের মাটির নিচে চিমনী খোঁড়বার জন্য প্রচুর জনবলের অভাব ছিল না। এই চিমনী-গুলো খাঁজে খাঁজে বহু গজ পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং হাপরের সাহায্যে সহজেই চুল্লীর অগ্নিকুণ্ডে বাতাস প্রবেশ করানো যায়।

পরের দিন সকালে আমাকে একখানা সাইকেল দেওয়া হল। প্রথমে অসুবিধা হলেও পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে পাঁচশো মাইল পথ অতিক্রম করলাম সাইকেলে চেপেই। এ ছাড়া, আরো বেশ খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে এবং সামপানে চড়ে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, এই যাত্রার জন্য আমি যে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলাম, তাতে সাইকেল চড়া ছিল না। থাকলেও ইতর-বিশেষ কিছু হত না। কারণ বাস্তবে যে পথ দিয়ে চলেছিলাম, তা কল্পনা করাও অসম্ভব।

পায়ে-চলা পথটি ছিল এককথায় সাংঘাতিক। সরু আঁকা-বাকা, তিন কিংবা চার গজের বেশী কখনই একনাগাড়ে সোজা নয়। চারিধারে তার গাছের শিকড় ও গুঁড়ি, ছোট ছোট কাটা গাছের খুঁটি। সেই খুঁটিগুলোর উপর পাশের ঝোপঝাড় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে। পায়ের নিচের ভূমি অসমতল, মাথার ওপরে ঘন লতার ফাঁস। একটু অন্যমনস্ক হলেই গলায় ফাঁসি লাগবার প্রবল সম্ভাবনা। বাঁশের ঝাড় এমনভাবে মাথার উপর এসে পড়েছে যে, সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে মাথা ছুঁইয়েও আঘাত এড়াবার উপায় নেই। সেই সংগে, অসংখ্য কঞ্চি উদ্যত হয়ে রয়েছে সার্ট এবং

শরীরকে ফালা-ফালা করে দিতে। বস্তুতঃ, প্রতিটি বাঁকে ফাঁদ, গোঁজ, লতার ফাঁস এবং সূচীমুখ কীলক সম্মিলিতভাবে যেন উঁচিয়ে রয়েছে হোঁচট খাইয়ে নিচে ফেলে দিতে। এবং যে দিকটা এড়াতে চাই, চলতে শুরু করলেই সাইকেল যেন সেই দিকেই যাবার জন্য জিদ ধরে। সব চাইতে খারাপ অবস্থা হল সেই ভয়াবহ কাঠের পুলগুলোকে নিয়ে। এর আগে শুধু সমস্যা ছিল নিজেকে পার করবার। এবার সেই সঙ্গে জুটলো সাইকেল। এবং তাও কাঁধের উপর নিয়ে। কিন্তু গোঁজে-ভরা, আঁকাবাঁকা সেই পথের নাগপাশ থেকে কয়েক ঘণ্টা পর টেনে-হিঁচড়ে বেরিয়ে রাজপথের মতো আপাতঃ সদৃশ একটা রাস্তার উপর যখন পড়লাম, তখন আবার সাইকেলে চেপে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। ভারসাম্য রক্ষার পুরনো অভ্যাসটা ফিরে এল শীঘ্রই এবং মাইলের পর মাইল পথ পার হয়ে যেতে লাগল হু-হু করে। জীপে করে যাওয়ার চাইতে এটা ছিল অনেক ভাল। কারণ সাইকেল চলছিল প্রায় নিঃশব্দে। তার ফলে সমীপবর্তী প্লেনের যথেষ্ট সংকেত আমরা পূর্বাহ্নেই পাচ্ছিলাম এবং সেই মত ঝোপঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছিলাম।

আমেরিকার উপহার

'নাম্-বো'-তে আমি প্রথম যে সাইকেলটি ব্যবহার করি, সেটা ছিল একটি 'মভিক'। গাড়িটি ফ্রান্সে তৈরী হলেও, তার কাঠামো এবং চাকাতে ছাপ মারা ছিল আমেরিকার; আমেরিকার পতাকার নিচে আমেরিকা-ভিয়েৎনামের করবদ্ধ হাত এবং 'আমেরিকার জনগণের উপহার' কথা-কটি লেখা। যেমন উপহার হল বোমা এবং নাপাম্! পথে যত গেরিলা এবং অন্যান্য সৈনিকদের দেখলাম, তাদের প্রত্যেকের হ্যাভারস্যাকগুলোও তাই। হ্যাভারস্যাকগুলো আসলে সাদা রংয়ের গমের থলে এবং তাতে বড় বড় হরফে ছাপ মারা: 'এটা হল আমেরিকার জনগণের উপহার। বিক্রয় কিংবা

বিনিময়ের জন্য নয়।'

অদ্ভুত পরিহাস! আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করতে, অথবা তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে দল বেঁধে চলেছে মুক্তিফৌজ; তাদের পিঠের হ্যাভারস্যাকে বড় বড় হরফে লেখা: 'আমেরিকার জনগণের উপহার।' নাম্-বো-তে ব্যাপার দেখে মনে হল, বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ সেই হাতের ছাপ আমেরিকার নিজস্ব অঞ্চলে যত না রয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশী রয়েছে মুক্তিফৌজের অঞ্চলে। অধিকৃত মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়াও, বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র থেকে নিয়ে ঝালাই করবার যন্ত্র এবং এক্স-রে যন্ত্র প্রভৃতি যা-কিছু নজরে পড়ল, সে সবেতেই দেখলাম সেই বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হাতের ছাপ।

মুক্তি ফ্রন্টের কোনো সৈনিকের দিকে লক্ষ্য করলেই 'মার্কিন উপহার'-এর পরিমাণটা আরো বেশী করে বোঝা যায়। সৈনিকের কোমরের বেল্টটি হল মার্কিন ছাপ-মারা। ছোট্ট বোতল বাতির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই বাতিগুলোতে মার্কিন বন্দুকের গুলির খোল অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মার্কিন নাইলনের তৈরী দোলনা বিছানা হল মুক্তি সৈনিকের ঘুমোবার আদর্শ শয্যা। সেই বিছানাকে গাছে বাঁধবার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে আমেরিকার প্যারাস্যুটের দড়ি। তার সংগের জলের বোতলের উপরে বড় বড় হরফে 'ইউ. এস.' শব্দ দুটি ছাপা রয়েছে। মুক্তি ফ্রন্টের নিজস্ব কারখানায় তৈরী হাত-বোমাগুলো যে থলেতে রাখা রয়েছে সেটাও আমেরিকার। এমন কি, তার চব্বিশ ঘণ্টার রেশন, সেই বোমার আকারের ভাতের গোলাও জড়ান রয়েছে মার্কিন প্যারাস্যুটের নাইলনে। সেই একই নাইলনে তৈরী তার জামা। তার সর্ব-সময়ের সংগী অস্ত্র হল আমেরিকার কারবাইন। অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক সৈনিকের রয়েছে হাতবোমা, টমিগান, ৩৭ এম. এম. মেশিনগান, নানা রকমের বাজুকা ও মর্টার, এবং ব্যাটেলিয়নগুলোতে রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক ৫৭ এম. এম. রিকয়েললেস্ কামান।

পূর্বেকার ভিয়েতমিন সৈনিকদের মতো মুক্তি ফৌজের সৈনিকরাও

ব্যবহার করে বিখ্যাত 'হো-চি-মিন' চপ্পল। পার্থক্য শুধু হল ফরাসী সাইকেলের টায়ারের পরিবর্তে আমেরিকার গুডইয়ার টায়ার। চপ্পলের তলাটা হল টায়ারের। প্রমাণ সাইজের ট্রাকের টায়ার থেকে কাটা যায় দশ জোড়া চপ্পল। দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকার দশ চাকার জেনারেল মোটর ট্রাক প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এই রকম একটি মোটরের টায়ার থেকে পাওয়া যায় একশ' জোড়া চপ্পল। টিউব কেটে তৈরী হয় চপ্পলের উপরের ফিতে। গ্রীষ্ম প্রধান এবং জংলা জায়গার পক্ষে এই ধরনের চপ্পল হল আদর্শ। প্রায় পাঁচ মাস ধরে এ ছাড়া অন্য কিছু আমি পায়ে দিই নি। এই সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে একজন মুক্তিসৈনিক সূর্যাস্তের পর পনের মাইল পথ মার্চ করে যেতে পারে শত্রু-ঘাঁটি ধ্বংস করতে, এবং কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসতে পারে সকালের আগেই।

সাইকেলে যাত্রার প্রথম দিনে পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করে একটি শান্ত, গৈরিক বর্ণের নদীর ধারে আমরা পৌঁছুলাম। দিনের বাকি সময়টুকু এখানেই বিশ্রাম নিতে হবে। সন্ধ্যার দিকে দুটি সামপান এল। একটিতে মোটর লাগানো। সেটা অন্যটাকে টেনে আনছে। সাইকেল ছেড়ে এবার আমরা সামপানে উঠলাম। মোটরটিতেও দেখলাম সেই বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হাতের ছাপ, এবং লেখা 'কোহ্‌লার ৭ অশ্বশক্তি। ইউ. এস. এ.তে প্রস্তুত।' সারারাত ধরে আমাদের সামপান সেই শান্ত নদী বেয়ে চলল। উভয় তীরে ঘন অরণ্য। গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে ইতস্ততঃ দু-একটি গ্রাম। মাথার উপর উজ্জ্বল তারার ঝিকিমিকি এবং মাঝে মাঝে সৈন্য পরিবহণের কাজে ব্যস্ত বিমানের গর্জন ছাড়া কোথাও আর কিছু নজরে পড়ল না।

এই ভাবে আমরা নির্বিঘ্নে চললাম বেশ কয়েক দিন ধরে। দিন না বলে রাত বলাই ঠিক, কারণ সাধারণতঃ আমরা দিনের বেলায় বিশ্রাম নিতাম এবং চলতাম রাত্রি বেলা। কারণ নদীর এই অংশে মাথার উপর ঘন জংগলের আচ্ছাদন না থাকায়, বিমান

আক্রমণের আশংকা ছিল। বিভিন্ন স্থানে আমাদের দলে দু-একজন করে লোক বাড়তে লাগল। এইভাবে, দোভাষী ছাড়াও এলেন একজন করে ডাক্তার, পাচক, মুক্তিফ্রণ্টের প্রেস অফিসার, নিরাপত্তা অধিনায়ক, শরীররক্ষী এবং পথ প্রদর্শক। প্রতি অঞ্চলেই এই পথ প্রদর্শকদের পরিবর্তন হত। অবশেষে, বিশেষ একটি স্থানে দেখলাম আরেক দল লোক সাইকেল নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই সাইকেলগুলোর গায়েও দেখলাম বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হাতের ছাপ মারা।

আমাদের দলটি এইবার গুছিয়ে নিয়ে আবার সাইকেলে চেপে বেশ একটা নিয়মমাফিক রুটিনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলল। যতদূর সম্ভব, ভোরের আলো ফুটে ওঠার সংগে সংগেই আমাদের যাত্রা শুরু হত এবং চেষ্টা করতাম দুপুরের প্রচণ্ড উত্তাপের আগেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে। নাম্বোতে বেলা ১১টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উত্তাপের তারতম্য সাধারণতঃ ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশী হয় না। দিবাভাগের প্রচণ্ড গরমে পথ-চলা অথবা কঠিন পরিশ্রম এড়িয়ে, অপরাহ্নের শেষ দিকে আমরা ঘুরে-ঘুরে দেখতাম গ্রাম, সেনাদলের আস্তানা, ফ্রণ্টের প্রতিষ্ঠান, কারখানা ইত্যাদি এরই মধ্যে হত সভা এবং সাক্ষাৎকার। রাত্রির তাপমাত্রা সর্বদাই সহনীয় থাকতো, এবং কামানের গোলাগুলো কাছাকাছি এসে বিরক্ত না করলে, দোলনা বিছানায় মশারির নিচে শুয়ে ঘুম হত চমৎকার। পাতা এবং পোকামাকড় আটকাবার জন্য মশারির উপরে থাকতো নাইলনের আচ্ছাদন।

এবার সায়গনে

আমাদের যাত্রার মধ্যে প্রায় প্রতি ঘণ্টাতেই সংবাদ-বাহকেরা আসত ছোট ছোট খাম নিয়ে। ভিজিটিং কার্ডের জন্য যে ধরনের খাম ব্যবহার করা হয়, সেই আকারের খাম। তার ভিতরে থাকত

শত্রুপক্ষের গতিবিধির সর্বশেষ সংবাদ। যত আমরা সায়গনের কাছে উপস্থিত হচ্ছিলাম, ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল শত্রুপক্ষের সামরিক ঘাঁটির সংখ্যা। সুতরাং সেই মুহূর্তে কার্ডগুলোর গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। সে-গুলোর বিষয়বস্তু অনুসারে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্তিত হচ্ছিল আমাদের ভ্রমণপঞ্জী। খামগুলোর ভিতরের ছোট-ছোট কাগজগুলোতে ঠাসা খুদে খুদে অক্ষরগুলোকে আমাদের নিরাপত্তা-প্রধান এবং তাঁর সহকর্মীরা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। সময় সময় তাঁরা একত্রে বসে মাটির উপর একটার পর একটা মানচিত্র আঁকতেন। কখনো একটা মুছে ফেলতেন, তার উপর আঁকতেন আর-একটা। যতক্ষণ না কোনো সন্তোষজনক পথের হদিস মিলত ততক্ষণ চলত এই রকম। আমরা চলেছিলাম সরাসরি সায়গনে। সুতরাং দিনগুলো ছিল ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ। এই সময়ে আমি ডাইরিতে যে নোট লিখেছিলাম, নমুনা হিসেবে তার থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি :

"সারাদিন ধরে মাথার উপরে বিমানের গর্জন। বি-২৬, এ.ডি-৬, এইচ.ইউ-১এ হেলিকপ্টার এবং ফ্রান্সে তৈরী মোরেন জাতীয় টহলদারী বিমান। আমার সহযাত্রীরা, এমন কি যারা ফরাসী ভাষা বলতে পারে না, তারাও কেউ শেষোক্ত জাতের বিমানগুলোর নামকরণ করেছে 'মাস্‌ মোয়াজেল্‌।' জংগল ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসছে। প্রায়শই দেখা যাচ্ছে উন্মুক্ত তৃণভূমি এবং ধানের ক্ষেত। উন্মুক্ত স্থানগুলো অতিক্রম করবার সময় যাতে বিমানের দৃষ্টিপথে না পড়ি, তার জন্য আমাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। কখনো-সখনো আমরা যাচ্ছি সামরিক ঘাঁটিগুলির খুব কাছ দিয়ে। এমন কি, মাঝে-মাঝে সায়গনের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চল অথবা এলাকা দিয়েও চলেছি আমরা। এই সমস্ত এলাকার উপর মুক্তি-ফ্রন্ট সার্থকভাবে কর্তৃত্ব করে কেবলমাত্র রাত্রি বেলা। আমাদের পথপ্রদর্শককে হতে হচ্ছে নির্ভুল। বিশেষ ভংগিমায় রাখা কয়েকটি সবুজ পল্লব হয়তো নির্দেশ করছে চৌরাস্তার কোন্ পথটি আমরা ধরব। এবং সঠিকভাবে পল্লবগুলোকে রাখা হল পথ-প্রদর্শকের

দায়িত্ব। ভুল পথ ধরে এক কিংবা দুই মিনিট হাঁটবার অর্থই হল সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়া।

সায়গনের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চল এবং মুক্তিফ্রণ্টের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের পার্থক্য আমার পক্ষে বলা খুবই কঠিন। এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে, সায়গনের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে জন সংখ্যা খুবই কম। যারা আছে, তারা সবাই রয়েছে আবদ্ধ অবস্থায়। সৈন্যেরা আবদ্ধ রয়েছে নিজের নিজের ঘাঁটিতে, এবং জনসাধারণ রয়েছে তাদের বন্দীশিবির গ্রামগুলোতে। পথপ্রদর্শক জানালেন, সম্মুখের একেবারে উন্মুক্ত অঞ্চলটি আমরা অতিক্রম করব রাত্রি বেলায়। কারণ, পথের দুই ধারে, ছয় এবং চার মাইল দূরত্বে রয়েছে দুটি শত্রু-ঘাঁটি, এবং সেই ঘাঁটি দুটির মধ্যে রয়েছে একেবারে খোলা মাঠ। প্রকৃতপক্ষে আমরা কিন্তু পার হলাম দিনের বেলাতেই। কারণ ওইছোট-ছোট খামগুলো। ব্যাপারটি আমি জানতে পারলাম গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পর। রাতটুকু অতিবাহিত করলাম গভীর বনের মধ্যে, অন্য আরেকটি শত্রু ঘাঁটির দু-মাইলের ভিতরে। আমার সহযাত্রী রক্ষিদল সারারাত তাদের অস্ত্রগুলো প্রস্তুত রেখে পাহারা দিল।"

পরের দিন যে পথ ধরলাম সেটি কোথাও কোথাও যেমন গিয়েছে রবারের বাগানের মধ্য দিয়ে অথবা পাশ কাটিয়ে, তেমন চলে গিয়েছে বহু খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে। বিমান তৎপরতা দেখলাম প্রচণ্ড। খুব ভোরেই এলো একটি মন্দ্‌মোয়াজেল্‌। আমাদের ছোট্ট দলটিকে সর্বক্ষণ কেন্দ্র করে প্রথমে বড়-বড় চক্র কেটে উড়তে লাগল। তার পর শুরু করল চক্রটিকে ছোট করতে। গাছপালা এবং ঝোপে ঢাকা ছোট্ট এক খণ্ড স্থানে আমরা আশ্রয় নিলাম। এটা লক্ষ্য করে তার কৌতূহল বোধহয় আরও বেড়ে গেল। ভিয়েতকংদের সঙ্গে একজন য়ুরোপীয় রয়েছে এ সংবাদ কেউ ওদের দিয়েছে বলে আমার সহযাত্রীরা সন্দেহ করল। এবং সেই খবরের উপর ভিত্তি করে আমেরিকানরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে যে আমি একজন যুদ্ধ-বন্দী। এই ধরনের সংবাদের জন্য আমেরিকানরা দশ থেকে ত্রিশ হাজার

পিয়াস্ত্রা* পর্যন্ত পুরস্কার দিয়ে থাকে। এবং এই ধরনের যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্ত করতে তারা হেলিকপ্টার থেকে সৈন্য নামিয়ে দেওয়া হতে শুরু করে কয়েক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করা—সব কিছু করতে প্রস্তুত। মাদ্‌মোয়াজেল্‌ ফিরে যাবার সংগে সংগেই আমরা যত শীঘ্র সম্ভব নিরাপদ অঞ্চলে চলে যেতে মনস্থ করলাম। কিন্তু সেটি যেতে না যেতেই হাজির হল আরেকটি; এবং আমাদের ছোট্ট দলটিকে কেন্দ্র করে খুব নিচু দিয়ে উড়তে লাগল। আমরাই যে তাদের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু, এটি এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আসলে যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যবর্তী এমন একটি অঞ্চলে গিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম, সেখানকার সব কিছু গতিশীল বস্তুই সায়গনের চোখে শত্রু বলে বিবেচিত হয়।

শুরু হল যেন লুকোচুরি খেলা। প্লেনের লেজের দিকটা আমাদের দিকে হবার সংগে সংগে দৌড় লাগাই। আশা করতে থাকি প্লেনটি আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। আবার, যখন তার সম্পূর্ণ দৃষ্টি-পথের মধ্যে পড়ে যাই তখন যা-কিছু আচ্ছাদন পাওয়া যায় তার নিচেই লুকোবার চেষ্টা করি। কিন্তু এ ব্যাপারও আর বেশীক্ষণ চলল না। কারণ আমরা যাতে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে না পারি, সেই উদ্দেশ্যে সে আর একটি প্লেনকে ডেকে আনলো। মাংসের দোকানের মাছির মতো উড়োজাহাজ দুটো চারিদিক ঘিরে গর্জন করতে লাগল। উড়বার পরিধি ক্রমশঃ ছোট করে এনে সেই পরিধির মাঝবরাবর কেটে যায় এবং সেই সংগে ক্রমাগত নিচে নেমে আসতে থাকে। কাছেই ছিল একটি রবার বাগিচা। উপায়ান্তর না দেখে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে সেইদিকে ছুটলাম। চারিদিকের উন্মুক্তস্থানে পাছে ওরা হেলিকপ্টার থেকে সৈন্য নামিয়ে দেয় সেই ভেবে আমাদের নিরাপত্তা-প্রধান বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সুতরাং আমাদের রক্ষীবাহিনীও প্রস্তুত হল আবার। প্লেনদুটো গর্জন করতে করতে যতক্ষণে প্রায়

---

* সরকারি বিনিময় হার হল আমেরিকার এক ডলার সমান পঁয়ত্রিশ পিয়াস্ত্রা।

গাছগুলোর মাথা অবধি পৌঁচেছে, আমরা প্রাণপণে ছুটে রবার-বাগিচার ছায়ায় ঢুকে পড়লাম। গভীর অরণ্যের ছাদের মতো লুকোবার জায়গা সেই বাগিচায় ছিল না। তবু আমাদের উন্মুক্ততা ঢাকবার পক্ষে একেবারে খারাপও হল না তেমন।

লুকোচুরি খেলা চলল প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। সূর্য বেশ উপরে উঠে এল। আমাদের সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল। তবু পথ-প্রদর্শক দৌড় থামালেন না। অবশেষে 'নিরাপদ অঞ্চলে' পৌঁছে আমরা থামলাম। কয়েক গজ দূরেই ছিল ছোট্ট একটি বস্তি। প্লেনটাটোও লক্ষ্য করেছিল বস্তিটাকে। দেখে অবাক হলাম, আমরা থামবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্লেনটাটো গোত্তা খেয়ে নিচের দিকে নামল এবং বস্তিটার ওপর কতগুলো নাপাম বোমা ফেলল। টহলদারী প্লেন যে অস্ত্র-শস্ত্রও বহন করতে পারে, এ সন্দেহ আমার হয় নি। একটি কুঁড়ে ঘরের উপর বোমা পড়ল। মারা গেল নয় বৎসর বয়সের একটি বালিকা। ভয়ানক মুষড়ে পড়লাম। কারণ, আমাদের অনুসরণ করেই প্লেনটাটো ওই বস্তিটির খোঁজ পেয়েছিল।

বিকালে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। একটি শত্রুঘাঁটির দেড়শো গজের মধ্য দিয়ে আমরা গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে পথে ছিল সেই সবুজ পল্লবের নির্দেশ-চিহ্ন। সুতরাং পথ ভুল হল না। ঘন ঘন প্লেনের আনাগোনা ; কিন্তু বিশেষ করে আমাদের দিকে কোনটাই নয়। ডাইভ বম্বার প্লেনগুলো থেকে ফেলা অজস্র বোমার শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, যে মুহূর্তে দিগন্তে সূর্য অস্ত গেল সেই মুহূর্তেই থেমে গেল এ সমস্ত তৎপরতা। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হল, সম্মুখের সাইকেলটিকে খুব সাবধানে অনুসরণ করতে। কারণ, সারাটা পথ গেরিলারা বিস্ফোরক পদার্থ এবং তীক্ষ্ণ বর্শার মতো ফাঁদ দিয়ে ভরে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, রাস্তার মাঝে-মাঝে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে পথও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বৈশিষ্ট্য ছিল গর্তগুলি কাটার মধ্যেও। চাকার চারিধারে

যেমন খাঁজ কাটা থাকে সেই রকমভাবে কাটা হয়েছিল গর্তগুলোকে। ফলে তার মধ্য দিয়ে একটু সাবধানে চললেই বেশ সহজে সাইকেল নিয়ে যাওয়া যায়।

এইভাবে উপস্থিত হলাম একটি গ্রামে। গ্রামটিকে দেখলাম প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এবং আনন্দে উচ্ছল। ফ্রণ্টের পতাকা এবং চান্দ্র নববর্ষকে অভিনন্দন জানিয়ে লাল কাপড়ের উপর বিভিন্ন স্লোগান লেখা কাপড়ে সারা গ্রাম সাজানো। পথ দিয়ে যেতে যেতে দু-ধারের কুটিরগুলোর দিকে লক্ষ্য করে সর্বত্র একটা স্বস্তির চিহ্ন অনুভব করলাম। পরিবারের সবাই ঘরের বাইরে বসে সন্ধ্যার খাবার খাচ্ছে; বালক-বালিকারা খেলা করছে গাছের তলায়; আমাদের দেখে কুকুরগুলো জুড়ে দিয়েছে চীৎকার। শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক একটি গ্রাম্য-জীবন। এমন কি, অতি-পরিচিত বিদ্যুৎ-চালিত সেচ-পাম্পের যান্ত্রিক শব্দও কানে এল। এগুলো ব্যবহৃত হয় সবজি ক্ষেতে জল দেবার জন্য এবং এই অঞ্চলে এ ধরনের পাম্প খুব কমই দেখা যায়।

অতঃপর আমাকে একটি কুটিরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। টেবিলের উপর এক বোতল জন-হেগ্ হুইস্কি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার নিমন্ত্রণকর্তা, কুঞ্চিত মুখমণ্ডল একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন। ইনি হলেন ১৯৪০ সনের নভেম্বর বিপ্লবের একজন ঝানু বিপ্লবী। সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন সোডা চাই কি না! তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এনে হাজির করলেন এক পাত্র বরফ এবং এক বোতল সোডা। বরফ কোথা থেকে এলো জিজ্ঞাসা করতে জবাব পেলাম, "আপনি এখন সায়গনে রয়েছেন।" বস্তুতঃ সায়গনের শহরতলি থেকে আমরা ছিলাম মাত্র ছয় মাইল দূরে।

সারাদিন ধরে বিশ্রাম নিয়ে এবং গ্রামবাসী ও স্থানীয় গেরিলাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, আবার সেই আঁকা-বাঁকা পথ ধরে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। পৌঁছুলাম রাজধানীর আরো নিকটে। এবং যখন 'বিড়ালের বৎসর' শেষ হয়ে 'ড্রাগনের বৎসরে' পড়ল, অর্থাৎ ১৯৬৪

সালের ১২ই ফেব্রুয়ারির মাঝরাত নাগাদ, ছোট্ট একটা খাল ধরে এগিয়ে চললাম আলোকোজ্জ্বল সায়গনের দিকে। নৌকোর মোটরটি মৃদু শব্দ করছিল। রক্ষী বাহিনীর কয়েকজন সৈনিক হাঁটুর উপর কারবাইন ধরে এবং ঘোড়ার উপর আঙুল রেখে অন্ধকারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। পথের চিহ্নসূচক প্রতিটি গাছ এবং আড়া-আড়ি ভাবে চলে যাওয়া প্রতিটি খালকে দেখছে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।

নৌকোর মোটর বন্ধ করে দেওয়া হল। হয় আমরা গন্তব্যস্থলের খুব কাছে এসে গেছি, অথবা সেটাকে ছেড়ে এসেছি। এই সময় ভুল পথে এক কি দুই মিনিট গেলেই ঘটে যাবে মারাত্মক বিপদ। এমন কি জ্বলন্ত একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠিও এক ঝাঁক কামানের গোলাকে আমন্ত্রণ করে আনতে পারে। যাই হোক, একটি বাঁক পার হবার সংগে সংগেই বাঁশবনের গভীর অন্ধকারের ভিতরে ছোট্ট একটি আলোর বিন্দু দু-বার দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। আবছা একটি বস্তুর দিকে এগিয়ে গেল আমাদের নৌকো। নৌকো এবং তীরের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে আদান-প্রদান হল কয়েকটি কথার। ফলে, বাঁশ-বনের ভিতরে একটি ফোকড়ের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম। এবং পরক্ষণেই, আমাকে নৌকো থেকে নামিয়ে অন্ধকারের মধ্যে পথের উপর নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে কেউ আমার হাত ধরল।

ফিস্‌ফিস্‌ করে ওই শব্দ ছাড়া আর কোনো কথাবার্তা হল না। রক্ষীবাহিনী সতর্ক নজর রাখতে লাগল সামনে এবং আশে-পাশে। একটি আনারস বাগানের ভিতর দিয়ে আমরা দ্রুতপায়ে হেঁটে চললাম। লক্ষ্যস্থল ছিল একটি গাছের কুঞ্জ। সেখানে রাত্রির বিশ্রামের জন্য আমাদের দোলনা বিছানাগুলো টাঙানো হবে। সায়গন থেকে তখন আমরা মাত্র পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। খুব কাছেই অনেকগুলো বিস্ফোরণের শব্দ হল। এর মধ্যে কতগুলো মনে হল মেশিনগানের আওয়াজ। শুনে অবাক হলাম যে ওগুলো হল নববর্ষের উৎসব উদ্‌যাপনকারীদের।

জেনারেল ন্যুয়েন্‌ খান-এর আদেশ ছিল, আগামী ড্রাগনের নব-

বর্ষকে অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে কোনো রকমের বাজি পোড়ানো চলবে না। কিন্তু উৎসবকারীরা সে আদেশ মানে নি। খান-এর ভয় ছিল, বাজির আওয়াজে পাছে নতুন কোনো বিদ্রোহের শব্দ চাপা পড়ে যায় এবং গুলি-গোলার শব্দ বলে সেগুলোকে তিনি সময়মতো চিনতে না পারেন। মাত্র সপ্তাহ দুয়েক পূর্বে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং আকস্মিক বিদ্রোহ সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত ছিলেন ভয়ানক আতংকগ্রস্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সায়গনের চারপাশের সংগ্রাম ॥ কাদের অঞ্চলে ?

জনৈক চাষীর কুটিরে রাত্রিবাসের জন্য আমার দোলনা বিছানাটি টাঙানো হয়েছিল ; শুতে হয়ে গিয়েছিল দেরী। শুয়ে-শুয়ে শুনছিলাম প্লেন এবং হেলিকপ্টারের একঘেয়ে গর্জন। মনে হচ্ছিল একই স্থানে রয়েছে আওয়াজটা। কাছেও আসছে না, দূরেও যাচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সায়গনের প্রধান বিমান বন্দরে ওরা নিজেদের প্লেনের মোটরগুলোকে গরম করছে।

এমন সময় একজন ছিমছাম পোশাকের, হাসিমুখের ব্যক্তি সেই কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন। জ্বল-জ্বলে দুটো চোখ, মুখে সরু একটু গোঁফের রেখা হাবভাব দেখে মনে হল এইমাত্র বুঝি তাঁর সায়গনের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেই আমন্ত্রণ জানানোর ভঙ্গীতে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ফরাসী ঢঙের উচ্চারণে বললেন, "সায়গনে সুস্বাগতম্! আমাদের কমিটির সভ্যদের সংগে মিলিত হোন।" মুক্তিফ্রণ্টের 'সায়গন-জিয়াদিন' শাখার (জিয়া-দিন হ'ল সায়গনের একটি প্রদেশ।) কার্যনির্বাহক সমিতির ষোল জন সদস্যের মধ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বারো জন। তাঁদের ভিতরে চার জন এই সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে গত রাত্রেই সায়গন থেকে গোপনে পালিয়ে এসেছিলেন। সহাস্যমুখ ব্যক্তিটি হলেন সায়গনের একজন বিখ্যাত স্থপতি হুইন তান ফাট। 'সায়গন জিয়াদিন' কমিটির নেতা ছাড়াও, তিনি হলেন মুক্তিফ্রণ্টের বিখ্যাত নেতৃবৃন্দের অন্যতম ; মুক্তিফ্রণ্টের কেন্দ্রীয় সমিতির সেক্রেটারী জেনারেল, এবং জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের সঙ্গে সংযুক্ত তিনটি রাজনৈতিক

দলের অন্যতম দল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা। ফ্রন্টের অন্যান্য বহু নেতার মতো তিনিও অস্থায়ীভাবে নিজের জীবিকা এবং শহরের আরাম আয়েস ত্যাগ করে মুক্তি সংগ্রামের কঠিন, বিপদসংকুল জীবন বেছে নিয়েছিলেন। আগেই জানতাম, তাঁর স্ত্রী ১০।৫৯ * আইনের ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

হুইন তান ফাট সমিতির সদস্যদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার। সদস্যদের মধ্যে দু-জন সাংবাদিক, একজন লেখক, একজন সংগীতজ্ঞ, দু-জন কৃষক, একজন কারখানার শ্রমিক, একজন সায়গনের যুব-প্রতিনিধি, যাঁর জীবিকা আমি লিখে নিই নি, একজন গৃহিণী, একজন ছাত্র, একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং স্থপতি স্বয়ং।

আমার প্রথম প্রশ্নই ছিল, আমাদের এই সাক্ষাৎকার মুক্ত অঞ্চলে হচ্ছে, না 'শত্রু অধিকৃত' অঞ্চলে। এই প্রশ্নের কারণও ছিল। সাইকেলে আসবার সময় একাধিকবার আমাকে টুপীটি নামিয়ে মাথা নিচু করে চলতে বলা হয়েছে। ভিয়েতনামীদের অপূর্ব মোচাকৃতি এই ঘাসের টুপীগুলো মুখখানাকে সবসময় ছায়ায় ঢেকে রাখে এবং প্রয়োজনের সময় সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে ফেলে। আবার সামপানে আসবার সময় বলা হয়েছে পাটাতনের উপর চিত হয়ে শুয়ে থাকতে। কারণ, আমরা নাকি শত্রু এলাকার ভিতর দিয়ে আসছিলাম।

হুইন তান ফাটের চোখ দুটো অপূর্ব কৌতুকের আভাষে ঝিকমিক করে উঠল। এই জিনিসটির অনুপস্থিতি তাঁর চোখে কদাচিৎ দেখেছি। বললেন, "শত্রুর সংগে আমাদের অন্তরংগ সংহতি রক্ষা করে থাকতে হয়। যেমন, তারা ভাবে এই ছোট্ট গ্রামখানা হল তাদের। প্রকৃতপক্ষে এটা কিন্তু আমাদের। সায়গন থেকে প্রায়ই লোকজন এখানে আসে। কিন্তু তাদের ধারণাই নেই যে তারা আমাদের অন্যতম মুক্তঅঞ্চলে এসে পড়েছে। আমরাও তাদের

* ১৯৫৯ সালের এই আইন অনুসারে, "রাষ্ট্রের নিরপত্তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করলে, অথবা এই ধরনের কোনো অপরাধ করবার ইচ্ছা পোষণ করলে" যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

উত্যক্ত করি না। বস্তুতঃ, যতক্ষণ না কাউকে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বলে সন্দেহ হয়, ততক্ষণ পরিচয়পত্রও দেখতে চাই না। সে রকম ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের পূর্বাহ্ণেই সাবধান করে দেওয়া হয়। আমাদের এবং শত্রুপক্ষের অঞ্চল আসলে ঘনিষ্ঠ সংবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে; বিশেষ করে এইখানে, সায়গনের এত নিকটে। কিন্তু যতক্ষণ না আপনি সরাসরি শত্রু-ঘাঁটির ভিতরে গিয়ে পড়ছেন, অথবা তাদের কামান কিংবা মেশিনগানের দৃষ্টিপথে পড়ে যাচ্ছেন, ততক্ষণ শত্রুর মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আমাদের একটি কৌশল হল, যাকে বলে শত্রুঘাঁটিগুলোকে 'ছিপিবন্ধ' করে দেওয়া। অর্থাৎ, তারা দিবারাত্র আমাদের গেরিলাবাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে, এবং আমাদের অনুমতি ছাড়া বাইরে বেরুতেই পারবে না।"

পরিস্থিতিটাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার জন্য তিনি একখানা মানচিত্র মেলে ধরলেন। তারপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বিন ছান প্রদেশের ছোট্ট একটি গ্রামের দিকে। এই গ্রামটিতেই আমি 'ড্রাগন' বৎসরের প্রথম কয়েকটি ঘণ্টা অতিবাহিত করেছিলাম। জেনে অবাক হলাম, একটি শত্রু ঘাঁটির কয়েক গজের মধ্যেই সেই রাতটা এবং পরের দিন বেশীরভাগ সময় কাটিয়েছিলাম। "প্রকৃত-পক্ষে ওই ঘাঁটিটির অস্তিত্ব আর নেই;" বলেই তিনি ঘাঁটির চিহ্নের উপর একটা ঢেঁড়া টেনে দিলেন। তারপর আবার বললেন, "মাস দুয়েক আগেই ওটাকে দখল করে নেওয়া হয়েছে। তার আগে বেশ কয়েকমাস ধরে ওটাকে দিবারাত্র ঘিরে রাখা হয়েছিল। ওখানকার গ্যারিসনটি আমাদের গেরিলাদের অনুমতি নিয়ে তবেই বাজারে যেত অথবা পার্শ্ববর্তী কিন জাং খাল থেকে রান্নার জন্য জল নিত। আক্রমণের ভয়ে সর্বদা তারা থাকত তটস্থ হয়ে। তাই শেষ পর্যন্ত তারা ঘাঁটিটাকে পরিত্যাগ করেছে।" ঘাঁটিটা ছিল সায়গন সেনাবাহিনীর একটি কোম্পানির; এবং সায়গন থেকে ওটার দূরত্ব ছিল প্রায় ৮০ মাইল। অবশ্য এর চাইতেও বিপজ্জনক বলে মনে হল এই গ্রামটির আশপাশের অবস্থা। অথচ এখানেই একজন

কৃষকের কুটিরে আমাদের সাক্ষাৎকার চলেছে।

মানচিত্র অনুসারে চারিদিকে রয়েছে শত্রুঘাঁটি। অথচ একটিতেও ঢেঁড়ার চিহ্ন নেই। এর মধ্যে দুটি হল এক হাজার এবং দেড় হাজার গজের মধ্যে। এবং অকস্মাৎ শুরু হল কামান এবং মর্টারের গোলা ও ভারি মেশিনগান ফায়ারের ভয়ংকর শব্দ, আক্রমণোদ্যত প্লেনের গর্জন এবং নাপাম বোমা বিস্ফোরণের চাপা আওয়াজ। হুইন তান ফাটের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ল; এবং শত্রু যে কখনই এখানে এগিয়ে আসতে পারবে না সে আশ্বাসবাণী তিনি খুব শান্ত এবং দৃঢ়ভাবে জানালেও, আমার পক্ষে তা' মেনে নেওয়া হয়ে পড়ল কঠিন। কিন্তু তিনি সেই রকমই শান্ত, অবিচলিত স্বরে বললেন; "হ্যাঁ, মানচিত্রের উপরে অবশ্য পরিস্থিতিটাকে ভীতিপ্রদ বলেই মনে হয়। মনে হয়, শত্রু-ঘাঁটি দ্বারা আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছি। আসলে কিন্তু তারাই আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। সায়গনের মোবাইল রিজার্ভ বাহিনীর সংগে যুক্তভাবে বিরাট আক্রমণাত্মক অভিযান ছাড়া, শত্রুর ওই গ্যারিসনগুলো কখনই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে না।"

বীভৎস শব্দটা ক্ষণকালের জন্য থামল। সেই অবসরে জিজ্ঞাসা করলাম, "মনে হচ্ছে খুব কাছেই প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে। অথচ আপনারা কেউ সেদিকে দৃকপাতও করছেন না?"

ক্ষমা প্রার্থনার ভংগিতে হুইন তান ফাট হাসলেন, "আপনাকে কেউ ব্যাপারটা বলে দেয় নি? শব্দটা আসছে এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে অবস্থিত 'ত্রাঙহোয়া'র আমেরিকান প্যারাসুট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে। লোকদের ওরা জোর করে সৈন্যদলে ভর্তি করেছে ঠিকই; কিন্তু তাদের প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দেওয়াটা আর শেখাতে পারছে না। কারণ ওদের বেশীর ভাগই এসে পড়ে আমাদের অঞ্চলে; অনেকে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে। তাই এখন তারা নকল যুদ্ধের অভিনয়ের মাধ্যমে ওদের পদাতিক সৈনিকের শিক্ষা দিচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন সকালেই এটা হয়। কারো উচিত ছিল এ বিষয়ে

আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখা।”

জিয়া দিন্ প্রদেশের মানচিত্রে, মুক্তিফ্রন্ট এবং সায়গন নিয়ন্ত্রিত ‘সংবদ্ধ’ অঞ্চলগুলোকে লাল এবং নীল রংয়ে দেখান ছিল। দুইয়ের মধ্যে আবার বড় বড় হলুদ রংয়ের ছোপ, যার অর্থ হল, এই অঞ্চলগুলো দিনের বেলায় থাকে নামেমাত্র সায়গনের নিয়ন্ত্রণে, এবং রাত্রি বেলা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ থাকে মুক্তিফ্রন্টের। মুক্তিফ্রন্টের কর্মীরা লাল এলাকাগুলোকে বলে ‘গেরিলা শিবির’, এবং হলুদ এলাকাগুলোর অর্থ হলো ‘গেরিলা অঞ্চল’। সায়গন-চোলোন এলাকার নির্দেশসূচক বিরাট একটি সবুজ ফুটকি ছাড়াও মানচিত্রে অন্যান্য সবুজ বিন্দুগুলোর অর্থ হলো সায়গন-নিয়ন্ত্রিত জেলা সদর এবং সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বসতি এলাকা, সায়গন কর্তৃপক্ষ যার নাম দিয়েছে ‘স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট’। এই ধরনের প্রত্যেকটি গ্রামের সন্নিকটে রয়েছে এক বা একাধিক সৈন্য-ঘাঁটি। লাল এবং সবুজ অঞ্চলগুলোর যুক্ত আয়তনের চাইতে হলুদ অঞ্চলগুলোর আয়তন বড়, এবং এগুলো সায়গন শহরের উপান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। গেরিলারা সায়গনের একেবারে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে দেখে আমি বিস্ময় প্রকাশ করায়, হুইন তান ফাট বললেন, “মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই আমরা শহরের উপান্তের আধমাইলেরও কম দূরত্বে অবস্থিত একটি শত্রুঘাঁটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি।”

একটু থেমে আবার বললেন, “সায়গন শুধু মাত্র প্রশাসনিক রাজধানীই নয়: এটা হল শত্রুর সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র। যুদ্ধ চালাবার জন্য যা-কিছুর প্রয়োজন, যেমন প্রধান প্রধান সামরিক প্রতিষ্ঠান, সমরোপকরণের ভাণ্ডার, বিমান বন্দর, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মার্কিন সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর সব কিছু কেন্দ্রীভূত হয়েছে এখানে। ইদানীং দুটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে: একটি হল, যেমন-যেমন নতুন সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকদের জমি দখল করে নতুন নতুন সরবরাহ ভাণ্ডার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিমান বন্দরের সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য গ্রামগুলোকে বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে, যেমন-

তেমন শহর ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামাঞ্চলে। অন্যটি হল, গ্রামাঞ্চলে যেমন মার্কিন-পুতুলেরা পরাজিত হচ্ছে, তেমন তারা পশ্চাদপসরণ করছে সায়গনে। রাজধানীকে রক্ষার ব্যাপারে তারা জিয়া-দিনকেই এক ধরনের সশস্ত্র বেষ্টনী বলে মনে করে।"

মানচিত্রের দিকে ফিরে আবার বললেন, "এই দেখুন, রাজপথ, সামরিক সড়ক এবং 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেটে'র জাল এই সম্পূর্ণ অঞ্চলটিকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করেছে। এই কারণে এবং কাঁটা-তার, গর্ত, শত্রুঘাঁটি এবং অন্যান্য বাধার জন্য আমাদের সেনা-বাহিনীর পক্ষে চলাচল করা খুবই অসুবিধাজনক। তবু সৈন্য চলা-চলের কাজটা আমরা যে চালিয়ে নিই, সে অভিজ্ঞতা তো আপনার নিজেরই হয়েছে।" কতগুলি শত্রুপক্ষের বিমান আশপাশেই ঘোরা-ফেরা করছিল। সেগুলোর উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য তিনি একজনকে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থল ছিল নিকটেই। এবং প্রয়োজন হলে 'বোমা ফেলা'র সংকেত ও বিস্ফোরণের সময়-টুকুর ভিতরে সেগুলোর মধ্যে লাফিয়ে পড়বার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যেত।

একটি 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-এ

হুইন তান ফাট বলে চললেন, "প্রতিরক্ষার অংগ হিসাবে শত্রুপক্ষ জিয়া-দিন প্রদেশে ২২৮টি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বসতি এলাকা স্থাপন করেছে। ওরা এগুলোকে বলে 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'। এগুলোর উদ্দেশ্য হল, শহরের চারিধার পরিবেষ্টন করে একটি মানুষের বম তৈরী করা, এবং যাদেরই তারা 'ভিয়েতকং' বলে সন্দেহ করবে, তাদেরই উচ্ছেদ করা। 'মাছ ধরবার উদ্দেশ্যে পুকুরের সব জল বাইরে বার করে দেওয়া'র মতো একটা পরিকল্পনা তারা করেছিল। কিন্তু আপনি নিজেই দেখছেন, মাছগুলো ছিল একটু বেশী চটপটে। তাই তারা সেই কৌশলে ধরা পড়েনি। আসলে এই অঞ্চলটি হল

রাজধানীর খুব কাছে ; এবং এখানেই রয়েছে তাদের সেনা ও পুলিশ শক্তির প্রধান কেন্দ্র। তাই প্রয়োজন পড়লেই শত্রুপক্ষ বিশাল সেনাবাহিনী কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছে এবং ওই ধরনের গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। এদের মধ্যে কতগুলো আবার হল তথাকথিত আদর্শ গ্রাম —উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক ব্যক্তি ও বিদেশী পরিদর্শকদের দেখাবার উদ্দেশ্যে তৈরী। কিন্তু গত নভেম্বর মাসে দিয়েমের * বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পর জনগণ বিদ্রোহ করে এবং বহু গ্রাম ধ্বংস করে ফেলে। ১৯৬৩ সালের শেষ নাগাদ, পঞ্চাশটির ও বেশী গ্রাম একেবারে ভেঙে ফেলা হয়। তার মধ্যে কয়েকটি আদর্শ গ্রামও ছিল। কৃষকেরা তাদের পুরনো গ্রাম ফিরে যায় এবং একেবারে শত্রুর নাকের ডগায় তাদের নিজেদের জমিগুলো আবার চাষ-আবাদ শুরু করে। অবশিষ্ট প্রায় সমস্তগ্রাম থেকেই শত্রুর বজ্রমুষ্টি আলগা হয়ে যায় এবং তার বদলে স্থাপন করা হয় আমাদের সংগঠন।"

"এখনো শত্রুর অধিকারে রয়েছে এমন কোনো 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট' কি আমি দেখতে পারি ?"

"খানিকটা ঝুঁকি নিতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে তা' হলে নিশ্চয়ই পারেন।"

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "সায়গনের বেশ কাছে তো ?"

তিনি আবার মানচিত্রখানি মেলে ধরলেন। তারপর কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সংগে আলোচনার পর একটি গ্রামের নিচে দাগ টানলেন। বললেন, "এটা আপনার কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হবে। কারণ, একেবারে লাগোয়া রয়েছে একটি 'মুক্ত গ্রাম'। 'অন্তর্বংগ সংহতি রক্ষা করে বাস করা' কাকে বলে, তা' স্বচক্ষে দেখতে পাবেন এই গ্রামে।"

---

* নো দিন দিয়েম দক্ষিণ ভিয়েতনাম শাসন করেন ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত। সেই নভেম্বর মাসেই সেনাপতিরা বিদ্রোহ করেন এবং দিয়েম ও তাঁর ভ্রাতা নু নিহত হন।

পরের দিনই যাত্রা করলাম। খানিকটা সাইকেলে, খানিকটা সাম্পানে এবং খানিকটা পায়ে হেঁটে সূর্যাস্তের প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে গিয়ে পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। সামনেই পরিখা। অতিকষ্টে সেটা বেয়ে নামবার পরই সামনে পড়ল কেল্লার চারপাশ ঘিরে যেমন উঁচু দেওয়াল থাকে, তেমনি মাটির ঢিবি। এই হল সায়গনের উপকণ্ঠ থেকে ছয়-সাত মাইল দূরে অবস্থিত 'হকমন' জেলার 'তানথান তে'র স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেটে-র বহির্ভাগ। আমার সংগে রক্ষী হিসাবে এসেছিল ছোট একদল সৈন্য। তাদের দেখে গ্রামবাসীদের ধারণা হলো মুক্তি বুঝি আসন্ন। তাই, সৈনিকদের আলিংগণ করবার অভিপ্রায়ে সবাই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। এটা অবশ্য স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট বলতে যা বোঝায় ঠিক সে রকম নয়। কারণ, বেড়া ও কাঁটাতার দিয়ে পরিবেষ্টিত হবার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা সার্থক প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত যতগুলো ভিয়েতনামী গ্রাম আমি দেখেছিলাম, এটার সংগে সেগুলির একটারও মিল খুঁজে পেলাম না। জঘন্য বাড়িগুলো যেন এক জায়গায় গুঁতোগুঁতি করছে। গাছপালা, বাগান অথবা মৎস্য চাষের পুকুর, কোনো কিছুই নেই। নেই এতটুকু সবুজের চিহ্নমাত্রও। অথচ ১৭ অক্ষরেখার উত্তর অথবা দক্ষিণ, উভয় দিকের গ্রামগুলির বৈশিষ্ট্যই হলো ওইগুলি। আমার পথপ্রদর্শকেরা গ্রামবাসীদের কাছে আমার পরিচয় দিল একজন 'বিদেশী বন্ধু' বলে। সংগে সংগে চারিপাশে একটা ভীড় জমে গেল। অস্থিচর্মসার এক বৃদ্ধ সেই ভীড়ের মুখপাত্র-রূপে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, "এ একটা জীবনই নয়। পড়ন্ত বিকেলের ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যখন মাঠে যেয়ে কাজ করবার সময়, ঠিক সেই সময়েই আমাদের ঘরে ফিরে আসতে হয়। সূর্যাস্তের আধ ঘণ্টা আগেই আমাদের ঢুকতে হয় ফটকের মধ্যে। নইলে মারতে মারতে নিয়ে আসে। ছায়া দেবার মতো একটা গাছও নেই। সব কিছু ওরা কেটে ফেলেছে। এমন কি বাঁশঝাড়গুলোকেও সাফ করে ফেলেছে বুলডোজার দিয়ে। বাড়িগুলো যেন সব রয়েছে

একটার মাথার উপর আরেকটা। এমন জায়গায় শুয়োর কিংবা মুরগি পোষারও কোন সুযোগ নেই। এমনকি মাছের জন্য পুকুরও নেই একটা। তার উপর কর বসিয়ে বসিয়ে শরীরের সব রক্ত শুষে নিয়েছে। নিত্য নতুন কর বসাচ্ছে। সব কিছুর জন্যই কর দিতে হয়। এর উপর আবার ঘাঁটিগুলো থেকে সৈন্যরা আসে আর বলে 'ওই মুরগিটা দাও, এটা দাও, ওটা দাও' না দিলে বলে তুমি একজন 'ভিয়েতকং'। তারপর প্রহার করতে করতে টেনে নিয়ে যায় সদর জেলখানায়। আর, একবার এ রকমটা ঘটলে সে লোকের আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। যদি যায়, তবে জানবেন, সেটা হলো তার পরিবারের অসীম সৌভাগ্য।"

এই মহিমময় বন্দীশিবিরগুলোতে জীবন যে শুধু জীবন্ত মৃত্যুরই আরেক রূপ, সে কথা আরো অনেকেই বলল। শিশুদের খেলবার কোনো জায়গা নেই। সুতরাং তারা মায়ের আঁচল ধরে বিবর্ণ অসুস্থ মুখে মনমরা হয়ে চারিপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এরই মধ্যে একটি স্ত্রীলোক, বুকে একটা বাচ্চা নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, "নিঃশ্বাস নেবার মতো জায়গাও এখানে নেই [illegible], এরপর যে কী হবে তাই ভেবে সব সময় আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে থাকি। দিনে দুপুরে, রাত্রে, কখনই কোনো নিরাপত্তা নেই। সৈন্যগুলো আসে, চুরি করে, আর যুবতী মেয়েদের ভয় দেখায়।"

বেশীক্ষণ আমরা সেখানে থাকতে পারলাম না। কারণ শীঘ্রই সংবাদ এল যে, চারজন শত্রুসৈন্য গ্রামটির ভিতরে আমাদের প্রবেশ পথের কাছেই ছিল, এবং তারা কুটিরের বিপরীত দিকে প্রায় এক হাজার গজ দূরে অবস্থিত নিজেদের ঘাঁটির দিকে ছুটে গেছে। তাদের দিক থেকে আক্রমণের কোনো সম্ভাবনা অবশ্য ছিল না। কিন্তু আমাকে জানানো হলো যে, ঘাঁটিটিতে [illegible]২ এম. এম. মর্টার রয়েছে, এবং তারা গোলাবর্ষণ শুরু করতে পারে। সুতরাং একটু জোর পায়েই আমরা স্থান ত্যাগ করলাম, এবং থামলাম, আমাদের নিরাপত্তা-বিশেষজ্ঞের মতে, মর্টারের পাল্লার বাইরে গিয়ে ঠিক

সেই সময় সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। একটি ধান খেতের আলের উপর বসে আমরা কয়েক বোতল সায়গন বীয়ার পান করতে করতে দেখলাম, সায়গণের প্রধান বিমানবন্দরের রানওয়েতে বোমারু বিমান-গুলো সগর্জনে অবতরণ করছে।

গ্রীষ্মমণ্ডলের সন্ধ্যা দ্রুত নেমে এল। সায়গন-উপকণ্ঠের ঝিক-মিক আলোর মালা করল আত্মপ্রকাশ। জ্বলে উঠল সায়গনের ঠিক বাইরে অবস্থিত মার্কিন 'কোয়ান্‌টাঙ্‌' প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বেতার স্তম্ভগুলির শীর্ষস্থ উজ্জ্বল লাল আলোর বিন্দু। আমরা আবার রওনা হলাম। এবার লক্ষ্যস্থল মাইল খানেকেরও কম দূরে অবস্থিত পার্শ্ববর্তী 'আন নান তে' গ্রাম। আড়াআড়িভাবে ফুট তিনেক গভীর অসংখ্য পরিখা কেটে এবং পরিখার মধ্যবর্তী স্থানগুলিতে জঞ্জাল এবং পাথর জমা করে গ্রামের প্রবেশ পথটিকে একেবারে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে

জিজ্ঞাসা করলাম, "পথটাকে সারাবার কি কোনো চেষ্টা হয় না ?"

পথ প্রদর্শক জবাব দিল, "প্রথম-প্রথম ওরা চেষ্টা করত, মেরামতও করত। কিন্তু দিনের বেলায় তারা যেটাকে মেরামত করত, চাষীরা সেটাকে নষ্ট করে ফেলত রাতের বেলায়। ঠিক সেই জায়গাটা না হলেও, অন্য কোনো জায়গা। শেষ পর্যন্ত ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

যে গ্রামটির চারিপাশে 'আন নান তে' এবং আরো কিছু গ্রামকে বন্দী শিবিরে পরিণত করা হয়েছিল, স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেটে যাবার পথে সেই মূল গ্রামটিকেও আমি দেখেছিলাম। গেরিলারা যাতে আত্মগোপন করবার জায়গা না পায় সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত গাছপালা এবং বাঁশের ঝাড় কেটে এক এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছিল। অধিবাসীরা বর্তমানে তাদের আগেকার গ্রামেই আবার বাড়িঘর তৈরী করেছে। বাড়িগুলো বেশ বড়-সড়। চারিদিক ঘিরে রয়েছে ফলের গাছ এবং বাঁশঝাড়, শুয়োরের পাল চারিদিকে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ করে বেড়াচ্ছে; মাটি আঁচড়ে খাবার খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে মুরগীগুলো; চীৎকার-চেঁচামেচি করে ছুটে বেড়াচ্ছে শিশুরা। দিনের

শেষ ত্রুটি কি একটি ঘণ্টায় শিশুদের সান্ধ্যক্রীড়ার এই চেঁচামেচি প্রায় সব দেশেই শোনা যায়। বয়স্করা সবজি বাগানে জল সেচ করতে ব্যস্ত। চারিদিকেই শান্তি এবং স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার চিহ্ন প্রকট। 'সংরক্ষিত গ্রাম'টি যে সৈন্য ঘাঁটির কর্তৃত্বাধীন ছিল, সেটার ধ্বংসস্তূপও দেখলাম। মুক্তিফ্রন্টের জনৈক সৈনিকের সংগে আলাপও হল। সৈনিকটি একাদিক্রমে ছ-বছর ধরে মাটির নিচে বসবাস করে ছিল। কারণ, সামরিক ঘাঁটিটি থেকে একশ গজেরও কম দূরে একটি গুপ্ত পরিখার মধ্যে সে বাস করত। পরিখাটি ছিল একটি সুড়ংগের শেষ প্রান্তে, এবং গ্রামবাসীদের সহায়তায় সুড়ংগটি সে উক্ত গ্রাম থেকেই খনন করে। সেই পথেই গ্রামবাসীরা তার খাবার এনে দিত। সাংগঠনিক কাজকর্ম চালু রাখতে এবং চরম দিয়েমী * অত্যাচারের কয়েকটি বৎসরে গ্রামবাসীদের মনে আশা বাঁচিয়ে রাখতে, সৈনিকটি বাইরে বেরিয়ে আসত কেবল রাত্রি বেলা। সেই সুড়ংগটি ছাড়া আরো কয়েকটি সুড়ংগও খনন করা হয়েছিল একেবারে ঘাঁটির দুর্গ প্রাকারের ভিত অবধি। অবশেষে, তার সেই গুপ্ত আশ্রয় থেকেই ঘাঁটিটির উপর আক্রমণ চলানো হয়। শক্ত-সমর্থ ছোট্ট মানুষটি। এ রকম হাসি-খুশি বহু লোকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে সায়গন-জিয়া দিন অঞ্চলে।

আলাপ হতেই সৈনিকটি বলল, "শত্রুরা এ অঞ্চলে অতি বর্বরের মতো কাজ করেছে। স্থানীয় অত্যাচারী শাসকের খেয়াল-খুশী মতো নির্বিচারে হত্যা করেছে শত শত মানুষকে। কারণ, সায়গনের এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও, এটা ছিল অত্যন্ত শক্ত একটা প্রতিরোধ অঞ্চল। এমনকি ফরাসীদের সময়ও। তাই দিয়েমীরা হয়েছিল আরও কঠোর; জনগণকে বশ মানাবার জন্য তারা ভীতি প্রদর্শন, অত্যাচার

---

* নো দিন দিয়েমের শাসনকালের নীতি, কার্যাবলী এবং সেনাবাহিনীকে বোঝাতেই 'দিয়েমিস্ট' শব্দটি সর্বত্র ব্যবহার করা হয়। তাঁর পরিবর্তে সায়গনে এখন অন্য সরকার এসেছে। অবশ্য এ সরকারের চরিত্রও পূর্বতন সরকারের মতই।

কিছুই বাদ দেয়নি। স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট স্থাপনের বিরুদ্ধে এখানকার জনগণ তীব্র সংগ্রাম করেছে। কিন্তু দু-মাস কঠোর সংগ্রামের পর শত্রুরা আমদানি করল বুলডোজার। সারা অঞ্চলটিকে কয়েক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য দিয়ে ঘিরে রেখে, বুলডোজার চালিয়ে গাছপালা এবং যা' কিছু সবুজ, সব নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলল। এইভাবে তারা 'সংরক্ষিত গ্রামগুলি'র চারিধারে সৃষ্টি করেছে ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু তাদের এই কাজের প্রতিটি পদক্ষেপে জনগণের কাছ থেকে এসেছে তীব্র প্রতিরোধ। বাঁশঝাড়গুলোকে বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবার পর, জনগণ লড়াই চালিয়েছে তাদের ফলের বাগিচা রক্ষা করতে। যখন সেগুলোকেও কেটে ফেলা হল, তখন তারা লড়াই চালিয়েছে খোঁটা পুঁতে কাঁটাতার বসানোর বিরুদ্ধে। এইবার জয় হল জনগণের। শত্রুরা তাদের ঘাঁটি তৈরী করল ঠিকই। কিন্তু কেন্দ্রীভূত বাড়িগুলির উপর কেবলমাত্র লক্ষ্য রাখা ছাড়া, তারা আর কোনো রকম কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না।"

একটু থামল সৈনিকটি। তারপর আবার বলল, "ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীরা রাত্রিবেলা মাটির নিচে আরম্ভ করল সুড়ংগ খুঁড়তে; আর সেই সুড়ংগ এগিয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে শত্রু-ঘাঁটির কাছে। সেই তরুণ তরুণীদের অধিকাংশই এখন মুক্তিফৌজে যোগদান করেছে। যাই হোক, সেই সংগ্রামের সময়ও জনগণ বহুবার বিদ্রোহ করেছে এবং তাদের পুরনো বিধ্বস্ত গ্রামে ফিরে গিয়েছে। শত্রু তাদের পিছন পিছন পাঠিয়েছে সেনাবাহিনী; ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তাদের। নভেম্বর মাসে দিয়েমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পর আমরা ঘাঁটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিই। তারপর নিজের-নিজের গ্রামে ফিরে এসে আবার গড়ে তুলি স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা।"

'আন নান তে' গ্রামের একটি বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম। দেখলাম, টেবিলের উপর গাদা করা রয়েছে ফল এবং নববর্ষের মিষ্টান্ন। লাল কাগজের মালা ঝুলছে ছাদ থেকে।

সেগুলিতে চীনা ভাষায় লেখা রয়েছে 'ড্রাগনের নববর্ষ শুভ হোক।' এক মহীয়সী ছোট-খাট বৃদ্ধা এলেন। ইনি হলেন 'সৈনিকদের জননী' সংস্থার সদস্যা। জনৈক কর্মী জানাল, দিয়েমা পুলিশ বাহিনী থেকে পলাতক বহু কর্মীকে লুকিয়ে রাখা, খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে মহিলাটি বহু অদ্ভুত সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করেছেন। বৃদ্ধা নিঃশব্দে কথাগুলো শুনলেন। তারপর বললেন, "জনগণের সেবার জন্য এই ছেলেরা প্রতিদিন যেভাবে জীবন বিপন্ন করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তার তুলনায় আমাদের মতো বৃদ্ধেরা যতই ত্যাগ স্বীকার করুক, তা তুচ্ছ।" 'সংরক্ষিত গ্রাম'গুলির দুঃখময় জীবন এবং বর্তমানে কঠিনতম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা যে নতুন মুক্ত জীবন অধিকার করেছেন, সে সম্বন্ধেও বৃদ্ধা অনেক কথা বললেন। 'বিদেশী বন্ধুর এই অভূতপূর্ব আগমনের সংবাদে, মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর ঘর ও আঙিনা মানুষের ভীড়ে ভরে গেল। গ্রামের মানুষেরা এর আগে একমাত্র যে বিদেশীদের দেখেছে, তারা হল শত্রুর ঠিক বিপরীত। কথাটা এমনি ব্যাখ্যা করলেন উক্ত বৃদ্ধা নিজেই। এরপর সৌজন্যের প্রতীক হিসাবে এল চা, কড়া তিক্ত স্বাদের। এই ধরনের চা দক্ষিণ ভিয়েতনামে অত্যন্ত জনপ্রিয়। শুধু তাই নয়, উত্তরে যে বড় বড় পাত্রে চা দেওয়া হয়, তাও এরা পছন্দ করে না। এরা চা পরিবেশন করে ছোট ছোট পাত্রে; এদের মতে তাতেই চায়ের প্রকৃত স্বাদ বজায় থাকে। যাই হোক, চায়ের পালা শেষ হলে, আমার সম্মানে উচ্চারিত নানাবিধ শুভেচ্ছা, প্রশংসাবাক্যের মধ্যে তাঁরা আমাকে বিদায় দিলেন।

মুক্তাঙ্গণ অনুষ্ঠান

সেই রাতে জেলা অভিনেতৃ সংঘ কর্তৃক আয়োজিত একটি মুক্তাঙ্গণ অনুষ্ঠানে আমার যাবার কথা ছিল। সারাদিন ধরে শরীরের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছিল যেন। ক্লান্তবোধ করছিলাম খুব। তাই

জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, যাবো কি না যাবোনা তা' স্থির করব রাত্রের আহারের পর। যে সময়ে আমাদের রওনা হবার কথা, ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ শত্রুপক্ষের ১৫৫ মি. মি. কামান আমাদের দিক লক্ষ্য করে প্রচণ্ড অগ্ন্যুদগার শুরু করে দিল। প্রথম গোলার ঝাঁকটি এত কাছে এসে পড়ল যে আমরা সোজা আশ্রয়স্থলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বিস্ফোরণের ফলে গাদা-গাদা মাটি ও ধূলো এসে পড়ল ঘাড়ের ওপর। এক-একবারে এক সংগে আসছিল চারটি করে গোলা। প্রথম কয়েক ঝাঁক গোলা বর্ষণের পর, নিকটবর্তী কোনো ঘাঁটি থেকে তাদের সংগে যোগ দিল ভারী মর্টার। কামানের ভারী একঘেয়ে আওয়াজের মধ্যে মর্টারের তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিল। প্রায় আধঘন্টা ধরে গোলা-গুলি বর্ষণ করে তবে থামলো তারা। চারিদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে জেগে উঠল একটি ল্যামব্রেটা পরিবহণ ট্যাক্সির পরিচিত শব্দ। শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ট্যাক্সিটি বোধ হয় সায়গন থেকে আসছে বরফ যোগান দিতে।

অনুষ্ঠান শুরু হবার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই আশ-পাশের গ্রাম, এমন কি শত্রু নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি গ্রাম থেকেও কাতারে-কাতারে মানুষ এসে জড়ো হয়েছিল মুক্তাঙ্গনে। সম্ভবতঃ তাই থেকেই শত্রুরা পূর্বাহ্নে ব্যাপারটা আঁচ করে। কারণ, তাদের লক্ষ্যস্থলও ছিল সেই মুক্তাঙ্গন মঞ্চ। যে পথ দিয়ে আমাদের যাবার কথা ছিল, সেই পথের ওপরেই পড়েছিল প্রায় সবকটি গোলা। অবশ্য কেউ আহত হয় নি। মঞ্চের আলো সমস্ত নিভিয়ে ফেলা হয়েছিল সংগে সংগেই। দর্শকেরাও শুয়ে পড়েছিল মাটির ওপর। তারপর, সব কিছু শান্ত হবার পর শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠান।

পরের রাতে, ওই একই স্থানে আরেকটি অনুষ্ঠানে আমরা যোগদান করলাম। প্রধান কর্মকর্তা প্রথমেই নিরাপত্তার জন্য কি কি করণীয় তা' ঘোষণা মারফত জানিয়ে দিলেন। বিমান এলে অথবা গোলাবর্ষণ শুরু হলে, আলোগুলো নিবিয়ে দিতে হবে প্রথমেই।

দর্শকেরা চলে যাবে ট্রেঞ্চের মধ্যে। গতরাত্রের ঘটনার পর ট্রেঞ্চগুলো কাটা হয়েছিল। চীৎকার করে কোনো রকম প্রশংসা জানানো চলবে না; কারণ তাতে সমীপবর্তী বিমানের শব্দ ঢাকা পড়ে যাবে।

শুরু হল অনুষ্ঠান। এবং প্রায় সংগে সংগেই দেখা দিল একটি বিমান। উজ্জ্বল কেরোসিন বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলা হল। কিন্তু বিমানটি সেখানে চক্কর দিল না দেখে, সকলেই বসে রইল নিজের নিজের জায়গায়। লেজের দিকে একটা পিটপিটে লাল আলো নিয়ে বিমানটি সগর্জনে মিলিয়ে গেল রাতের আঁধারে। মনে হল, কোন দুষ্ট প্রেতাত্মা বুঝি মায়াময় সন্ধ্যাটিকে নষ্ট করতে এসেছিল।

এবার অনুষ্ঠান আরম্ভ হল গান এবং সমবেত সংগীত দিয়ে। সংগে বাজতে লাগল প্রথাগত বাঁশি এবং তারের যন্ত্রে মিষ্টি, মধুর সুর। সুরের রচয়িতা ছিলেন সায়গনের কার্যনির্বাহক সমিতির একজন সদস্য। তারপর, দক্ষিণ-ভিয়েতনামে জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস বোঝাবার উদ্দেশ্যে মাদলের সংগে সুর, তাল এবং লয়ের সুনিপুণ হ্রাস-বৃদ্ধি সহকারে একটি মাদল-নৃত্যও পরিবেশিত হলো। তাতে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা হলো প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রাম: শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠায় জনগণের আনন্দোচ্ছ্বাস; দমন-পীড়ন-ভয়ংকর দিনগুলোতে সারা দেশের অবর্ণনীয় দুঃখ এবং শোকের আর্তনাদ; দ্বিতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান; বিজয় এবং সব শেষে, মুক্তাঞ্চলের সুখী জীবন-যাত্রা। এছাড়া, পার্বত্যাঞ্চলের উপজাতীয় নৃত্য এবং তালের উপর ভিত্তি করে রচিত একটি উদ্ভট কল্পনাশ্রয়ী 'মায়াবী নৃত্যো'র অনুষ্ঠানও হল।

পরবর্তী অনুষ্ঠানে কিন্তু সোল্লাস অভিনন্দন জ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আরোপিত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিত হল বারংবার। অনুষ্ঠানটি ছিল, চান্দ্র-নববর্ষ উপলক্ষে ফ্রন্টের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব এবং ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রচিত একটি একাংক নাটিকা। ফ্রন্ট প্রস্তাব করেছিল, যুদ্ধ বিরতির অবকাশে সৈনিকরা নিজ-নিজ পরিবারবর্গকে দেখতে যেতে পারে। নাটকে দেখান হল, ফ্রন্টের প্রস্তাব অনুযায়ী আপন আপন

পরিবারবর্গকে দেখতে যাবার জন্য শত্রুঘাঁটির সৈনিকরা তাদের অফিসারের অনুমতি প্রার্থনা করে। অফিসারটি প্রত্যাখ্যান করে অনুরোধ। এবং প্রচুর হাস্যরসাত্মক বাদানুবাদের পর সৈনিকরা আদেশ অমান্য পূর্বক নিজেদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত অফিসারটিও একই পন্থা অনুসরণ করতে মনস্থ করে। (এটা অবশ্য কোনো কষ্ট-কল্পনা নয়। প্রকৃতপক্ষে, হাজার হাজার সৈনিক ঠিক এই কাজই করেছিল। এমনকি, ত্রাঙ্‌ হোয়া ছত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২৫০ জন শিক্ষার্থী উপরআলার আদেশ উপেক্ষা করে ফ্রন্টের নিয়ন্ত্রাধীনে অবস্থিত নিজেদের গৃহে চলে যায়। নব-বর্ষের সময় যে গ্রামটিতে আমি একটি রাত কাটিয়েছিলাম, তার সংলগ্ন একটি সৈন্যঘাঁটির অফিসার ও সৈনিকরা, সেই একই জেলা অভিনেতৃ সংঘ কর্তৃক আয়োজিত একটি মুক্তাঙ্গন অনুষ্ঠান দেখতে আসে।)

এরপর ছিল একটি ছায়াছবির অনুষ্ঠান। সে পর্যন্ত অবশ্য আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না। কিন্তু সেই দুই হাজারের উপর দর্শক মুক্তাঙ্গনে যেন শিকড় গেড়ে বসে রইল। নাট্যদলের পরিচালক আমায় জানালেন অনুষ্ঠানগুলোতে সব সময়েই প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। সায়গনের উপকণ্ঠের এক মাইলের মধ্যেও তাঁরা এ ধরনের অনুষ্ঠান করেছেন, এবং সেখানেও প্রচুর দর্শক এসেছে। "প্রথম দিকের এই রকম একটি অনুষ্ঠানে সায়গন থিয়েটারের কয়েকজন এসেছিল। তারা অবশ্য এসেছিল উপহাস করতে; কিন্তু ফিরে যায় খুশী হয়ে। যাবার সময় বলে যায়, জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আমরা একটা কাজের কাজ করছি, কিন্তু তারা এখনো হাবুডুবু খাচ্ছে পাশ্চাত্যের যৌন এবং রোমাঞ্চকর উত্তেজক বিষয়বস্তুর মধ্যে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "সায়গন কর্তৃপক্ষ আপনাদের এই সমস্ত কাজ সহ্য করে?"

—"নিশ্চয়ই করে না," জবাব এল। "গত রাত্রের ঘটনা আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন। সম্ভব হলে সায়গন কর্তৃপক্ষ আমাদের, এবং

এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যারা আসে, সবাইকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। কিন্তু সর্বত্রই জনগণ রয়েছে আমাদের সঙ্গে। স্থানীয় গেরিলারা আমাদের রক্ষা করে। অবশ্য, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরও রয়েছে। অনুষ্ঠান চলছে এখবর জানা সত্ত্বেও শত্রুর পক্ষে সাযগনের কয়েকশ গজের মধ্যে বোমাবর্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর উপর, আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈনিকরা, আমাদের উপর যে কোন নৈশ আক্রমণের মোকাবিলা করতে রয়েছে সর্বদা সজাগ।”

একটি সুরক্ষিত গ্রাম

পর দিন যাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুন্দর একটি তরুণী দুই জন নারী গেরিলা। ভিয়েতনামী ভাষায় তাঁদের নামের অর্থ হল ‘মুকুল’ ও ‘কোমল’। উভয়ের বাড়ি ছিল একই গ্রামে। এঁদের সম্বন্ধে ওই জেলার গেরিলা নেতা আগেই আমাকে কিছু কিছু জানিয়েছিলেন। তরুণী দু জন নাকি একবার এক কোম্পানি শত্রু সৈন্যকে হটিয়ে দিয়েছিলেন কেবলমাত্র গ্রামের পাঁচজন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে।

উভয়েরই পরিধানে ছিল নিখুঁত এবং পরিচ্ছন্ন কালো সুতির সার্ট ও ট্রাউজার। কোমরে আঁটা মার্কিন ‘ওয়েবিং বেল্ট’ থেকে ঝুলছিল হাতবোমা। এছাড়া, দু-জনেরই হাতে ছিল মার্কিন কারবাইন। দেখে তাঁদের বয়স মনে হল পনের বছর। কিন্তু ‘মুকুল’ জানালেন তাঁর বয়স উনিশ এবং ‘কোমল’ জানালেন তাঁর বয়স বাইশ বছর।

ঘটনাটির প্রকৃত নায়িকা ছিলেন ‘মুকুল’ এবং সেই প্রসঙ্গ খুব সহজভাবে বললেন, “শত্রু যখন খুব কাছে এসে পড়েছে, তখন আমি বন্দুক দাগার জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলোর একটা থেকে আরেকটাতে ছুটে ছুটে কারবাইন থেকে গুলি চালাতে শুরু করলাম। প্রতিটি গুলিতে একটি করে ‘পুতুল’ সৈন্য মারা পড়তে লাগল। ঘন-ঘন নিজেদের

অবস্থান পরিবর্তন করতে লাগলাম, যাতে শত্রুপক্ষ ভাবে যে সংখ্যায় আমরা অনেক। আসলে সেদিন কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষী দলের অধিকাংশই ছিল বাইরে; এবং আমরা ছিলাম মাত্র সাতজন।" কথাগুলো 'মুকুল' বললেন খুব হাল্কাভাবে ছেলেমানুষী স্বরে। "আমাদের একটি অবস্থান স্থলের উপর গুলি চালাবার মতলবে শত্রুরা মেশিনগান বসানো আরম্ভ করেছিল। ব্যাপার বুঝেই ছুটে গেলাম সেখানে। একটি হাতবোমাতেই গোলান্দাজটি সংগে সংগে মারা পড়ল এবং মেশিনগানটিও হয়ে গেল অকেজো। ততক্ষণে নিহত এবং আহত মিলিয়ে শত্রুপক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে নয় জন। ফলে তারা পালাল। পরে অবশ্য তারা কয়েকটি গোলা বর্ষণ করেছিল, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি করতে পারে নি।"

ঘটনাটি হল এই। কিন্তু ৮০ থেকে ১০০ সৈন্যের একটি কোম্পানি নিহত ও আহত মিলিয়ে ৯ জন লোকের ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করে এবং প্রবল আক্রমণে জায়গাটি দখলের চেষ্টা না করে লড়াই ছেড়ে চলে যাবে, এটা আমার কাছে কেমন অবিশ্বাস্য বলে মনে হল।

যাই হোক, ঘটনাস্থল সেই সুরক্ষিত গ্রামটি দেখতে নিয়ে যাওয়া হল আমায়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম দেখলাম মোট প্রায় কুড়ি মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথের একটি জাল। প্রতিটি পথ চলে গেছে বন্দুক দাগার জন্য তৈরী প্রশস্থ জায়গাগুলো অবধি এবং, প্রতিটি জায়গা থেকেই গ্রামের সব কটা আগমন-নির্গমন পথের উপর নজর রাখা যায়। সুড়ঙ্গপথগুলোর আয়তন যথেষ্ট বড়। সাধারণ দৈর্ঘ্যের ভিয়েতনামীদের পক্ষে বন্দুক দাগার জায়গাগুলোর একটির থেকে আরেকটিতে দৌড়ে যেতে কোন অসুবিধা হয় না। মুকুলও লড়াই চালিয়েছিলেন এই ভাবেই।

পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়া হল একটি বাঁশ ঝাড়ের কাছে। অনুরোধ করা হল, শিকড়গুলির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পাই কি না তা' ভাল করে লক্ষ্য করে বলতে। কিছুই পেলাম না। তারপর আমাকে সুড়ঙ্গের ভিতরে ৩।৪ জন মানুষ ধরে

এমন একটি বন্দুক দাগার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। সামনে দেখলাম কতগুলো অন্ধকার ফাটল। মনে হল, সেগুলোর পিছনে রয়েছে মাটির তৈরী বন্দুক রাখবার স্থান। একজন একটি ছড়ি দিয়ে সেই ফাটলের মধ্যে খোঁচা মারল। সংগে সংগে খুলে গেল ফাটলগুলো। সামনে দেখা গেল, কয়েক মিনিট আগে যে পথ দিয়ে সাইকেলে করে এই গ্রামে প্রবেশ করেছি, সেই পথ। আবার আমাকে নিয়ে যাওয়া হল বাইরে, সেই বাঁশ ঝাড়ের কাছে। বাঁশের শিকড়গুলোর ভেতরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটলগুলো উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল আমার। দেখে অবাক হলাম। সামান্য কয়েক গজ দূর থেকেও সেগুলোকে আবিষ্কার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

অন্যান্য বন্দুক দাগার জায়গা সবগুলোই সার্থকভাবে দৃষ্টিপথের আড়ালে করা রয়েছে। গুলির আগুনের ঝলক অথবা ধোঁয়া কোনো বন্দুক দাগার স্থানের সঠিক নির্দেশ দিলেও, সেদিক লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি চালানো হবে নিরর্থক। কারণ গেরিলারা সর্বদা অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে। গ্রামে প্রবেশের সমস্ত পথ-ঘাট এবং খালগুলো দেখলাম যথোচিতভাবে ঢাকা দেওয়া। গুলি বিনিময় শুরু হলে আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে কোথাও লাফিয়ে পড়লে অবশ্যম্ভাবীরূপে পড়তে হবে সারি সারি সাংঘাতিক ফাঁদগুলির যে-কোন একটির মধ্যে। সেগুলোর অধিকাংশই হল গভীর খাদ। ভিতরে পোঁতা রয়েছে বাঁশ আর ইস্পাতের সূচ্যগ্রমুখ কীলক। কোনোটাতে রয়েছে ছোট ছোট বোমা। কোনোটাতে আবার স্থানীয় অস্ত্র নির্মাণ কারখানার তৈরী 'এন্‌টি পারসোনেল মাইন।' এবারে বুঝলাম কেন নয়জন হতাহতের পর লড়াই পরিত্যক্ত হয়েছিল। এই ধরনের সুরক্ষিত গ্রামের বহিসীমাটুকু দখল করতেও প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি বরণ করতে হবে। আক্রমণকারীদের যদি সুড়ঙ্গগুলোর ভিতরে প্রবেশ করতে হয়, তা'হলে হস্ত-চালিত সমস্ত রকমের ফাঁদ সংগে সংগে কাজ শুরু করে দেবে। আক্রমণকারীদের হয়ত এমন একটা অংশে চালিত করা হবে যেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সমস্ত লোকজন সহ

সেটা উড়ে যাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। আক্রমণকারী বাহিনী মধ্যভাগে আক্রমণ করলে তাদের উপর গুলি করা হবে পার্শ্বদেশ থেকে; যদি তারা পার্শ্বদেশ আক্রমণ করে সে ক্ষেত্রে গুলি করা হবে মধ্যভাগ থেকে; যদি তারা বহিসীমা অধিকার করে নিয়ে আরও ভিতরে ঢুকে পড়ে. সে অবস্থায় দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পরে চতুর্থ সারির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো সক্রিয় হয়ে উঠবে। যদি পরিস্থিতি খুবই বিপর্যয়কর হয়ে পড়ে, গেরিলারা স্রেফ সরে পড়বে পলায়নের জন্য নির্মিত সুড়ঙ্গ-পথগুলো দিয়ে। হয়তো সে পথ গিয়েপড়েছে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে নয়তো নদী তীরে, নয়তো পার্শ্ববর্তী গ্রামে।

আমার দেখা 'সুরক্ষিত গ্রাম'গুলোর মধ্যে এই ধরনের নিখুঁত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাযুক্ত প্রথম দেখলাম 'মুকুল' ও 'কোমল'দের গ্রাম। পরে অবশ্য আরো বিস্তৃত সুড়ঙ্গ-ব্যবস্থাও দেখেছি। সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো গ্রামকে যুক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলোর ভিতরে রয়েছে পাঁচশ'রও বেশী বন্দুক দাগার স্থান এবং পর পর ফাঁদের সারি। 'ফ্লেম থ্রোয়ার' অথবা কোন রকম বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণ হলে, আক্রান্ত অংশকে একেবারে বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থাও আছে সেগুলোতে। কোন কোন গ্রামের সুড়ঙ্গ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ করতে লেগেছে হাজার হাজার ঘণ্টার কঠিন পরিশ্রম। তৈরী করেছে গ্রামের যুবকেরা; উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। বৃদ্ধেরা যোগান দিয়েছে ভাত, চা এবং ফল।

সায়গন—জিয়াদিন-এর সামরিক অধ্যক্ষ বললেন, "গ্রামাঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে শত্রুরা বড় বড় ঘাঁটি তৈরী করে তার মধ্যে বিরাট উঁচু উঁচু সমস্ত প্রহরামঞ্চ বসায়। আমরা আমাদের বন্দুক দাগার স্থানগুলো নির্মাণ করি যতখানি সম্ভব মাটির লাগোয়া; এবং বাকীগুলো মাটির নিচে। কারণ আমাদের লোকেরা রক্ষা করছে নিজেদের ঘর-বাড়ি। শত্রু যখন বদ মতলবে গ্রামের প্রবেশ-পথে হাজির হয়, তখনই প্রয়োজন পড়ে তাকে দেখবার এবং নজরে রাখবার। আমাদের বন্দুকের নজর এড়িয়ে শত্রুর পক্ষে গ্রামগুলির

নিকটস্থ বড়রাস্তা অথবা গলিপথে ঘোরাফেরা করা অসম্ভব। জনগণের যুদ্ধ বলতে আমরা এইটাই বুঝি।”

সেই সময় দক্ষিণ ভিয়েতনামে এ ধরনের ‘সুরক্ষিত গ্রামে’র সংখ্যা ছিল ৪,৩০০’র মতো। এগুলোর অধিকাংশই ছিল মেকং নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে। কিন্তু মধ্য ভিয়েতনামে এ ধরনের গ্রামের সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। আমার ধারণা, যারা এগুলোর পরিকল্পনা করেছিল, তারা মিলন ঘটিয়েছে তিনটি ঘটনার অভিজ্ঞতার। এক, দিয়েন বিয়েন ফু-তে সার্থকভাবে ব্যবহৃত জেনারেল ভো গুয়েন গিয়াপের গুঁড়ি মেরে চলা সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা; দুই, জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় হোপেই প্রদেশে চীনা গেরিলাদের ব্যবহৃত সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা, যাতে সমস্ত ছোট ছোট অঞ্চলগুলিকে ভূগর্ভস্থ প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জাল দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছিল; এবং তিন, কোরিয়ার মাঝ বরাবর ৩৮ ডিগ্রি অক্ষরেখার নিকটে কোরিয়া-চীনা সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত প্রতিরক্ষামূলক সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা। এই ধরনের একটা ছোট্ট গ্রাম যদি এক কোম্পানি সৈন্যকে হটিয়ে দিতে পারে—এবং আমি এমন বহু ঘটনা শুনেছি যেখানে এমন কি ব্যাটেলিয়নগুলোকেও হটিয়ে দেওয়া হয়েছে—তা’ হলে সেগুলোকে পুনর্দখল করতে হলে কোনো সরকার অথবা সামরিক প্রশাসনকে কি বিশাল কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে, তা কাজটিকে ৪,৫০০ দিয়ে গুন করলেই মোটামুটি অনুমান করা যায়।

‘মুকুল’ এবং ‘কোমলে’র সংগে সাক্ষাৎকারের পর, সেই দিনই মধ্যরাত্রির পর থেকে মাঝে মাঝে গোলাবর্ষণ চলছিল। আমাদের দোলনা বিছানাগুলো টাঙানো হয়েছিল একটা রবারের বাগানের মধ্যে। গোলাগুলো পড়ছিল দূরে; আশংকা করবার মতো কিছু নয়। তাই আমরা স্থান ত্যাগ করি নি। ভোরের দিকে গোলাবর্ষণ আরো তীব্র হয়ে উঠল; এবং এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। ‘মাদ্-মোয়াজেল’গুলোও দেখলাম খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। আমাদের ছোট্ট আশ্রয়স্থলের প্রতি যেন মনে হল তাদের বিশেষ আকর্ষণ

গর্জিয়ে উঠেছে হঠাৎ। সায়গনের প্রভাতী সংবাদপত্র যখন আমার দোভাষীর হাতে পৌঁছুল, সেই সময়েই এল পূর্বকথিত ছোট্ট খাম-গুলোর একটা। খামটি ছিল সায়গন-জিয়াদিন-এর সামরিক অধ্যক্ষের নামে। তিনি সে সময় ছিলেন আমাদের সংগেই। চটপটে, হাসি-খুশি, সতর্ক এবং স্থির সংকল্পের মানুষ। যে কোনো সেনাবাহিনীতে তাঁর মতো মানুষ একজন প্রথম শ্রেণীর 'স্টাফ অফিসার' হতে পারেন। চিঠিখানা পড়ে তিনি খস খস করে একটি জবাব লিখলেন; দেখালেন আমার উভয় সংগীকে। তারপর নিজের কোল্ট পিস্তলটি কোমরে গুঁজে কয়েকটি কঠিন শব্দ উচ্চারণ করে প্রসন্ন হাসির সংগে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন।

আমার দোভাষী সংবাদিক হুইন বললেন, "মাঝরাত নাগাদ ছত্রী সৈন্যদের একটি কোম্পানি এই বাগিচার অপর দিকে ঢুকে পড়েছে। আমরা তাদের উপর নজর রেখেছি। এই মুহূর্তে তারা এই দিকেই এগিয়ে আসছে। আপনাকে আমাদের গোপন সুড়ঙ্গের ভেতরে রাখাই ভাল হবে।" ততক্ষণে চারিদিকে বেশ একটা তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। ডাক্তার নিজের ঔষধ-পত্রের থলেটি পরীক্ষা করে দেখলেন। আমাদের থলেগুলোকে যে কোনো সময় সরিয়ে ফেলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখা হত। সেগুলোকে অতি দ্রুত বাগিচার গভীরতম অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হল। হুইন সংক্ষেপে বললেন, "এখনো তারা আধ মাইল দূরে রয়েছে। আমাদেরও কিছু সৈন্য এখানে আছে। তবু এখানে আর অযথা সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। কারণ এখনই ছুটতে শুরু করবে বুলেটের ঝাঁক।"

গুপ্ত সুড়ঙ্গগুলো আমার মতো দৈর্ঘ্যের মানুষের মাপে তৈরী হয় নি। সুতরাং অনির্দিষ্ট কালের জন্য তার ভিতরে থাকতে আমার আপত্তি ছিল। অবশেষে একটা রফা হল। খুব ভালভাবে নজরের আড়াল করা অর্ধবৃত্তাকার একটি পরিখার মধ্যে আমি চলে গেলাম। সেই পরিখা থেকে অনেকগুলো যোগাযোগ রক্ষাকারী পরিখা চলে গেছে পশ্চাৎভাগে। সবুজ রংয়ের ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরিহিত ছত্রী

সৈনিকেরা খুব সাবধানে, অস্ত্র উদ্যত রেখে, দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এক ভাগে ছিল প্রায় ৫০ জন। অন্যভাগে মর্টার সজ্জিত ৩০ জন। বড় দলটির সংগে ছিল তিন জন মার্কিন উপদেষ্টা।

প্রায় একশ' গজ দূরে দুটি পরিখার মধ্যে কয়েক জন মুক্তিসেনাকে তারা হঠাৎ দেখতে পেল। সংগে সংগে ধুপ্ধাপ্ শব্দে হুমড়ি খেয়ে পড়ে উভয় দলই ভারী মেশিনগান চালাতে শুরু করে দিল একই সংগে। মুক্তিসেনারা তাদের দুটি ভারী মেশিনগান থেকে কয়েকবার গুলি চালিয়ে ঘায়েল করল তিনজন ছত্রী সৈন্যকে। নিজের জায়গায় বসেই দেখলাম, প্রথম গুলি চালনার সংগে সংগে আমেরিকান তিন জন লাফিয়ে পড়ল একটি পরিখার ভিতরে, এবং সেখান থেকেই হাত নেড়ে দলটিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিতে লাগল। কিন্তু সৈন্যেরা মুহূর্তের জন্য দোমনা হয়ে পরক্ষণেই যে মেশিনগান এবং মর্টারগুলোকে সাজাতে শুরু করেছিল, সেগুলো গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়তে আরম্ভ করল গাছ-পালার আড়ালে। সংগে সংগে আমেরিকান তিনজনও হুড়মুড় দুদ্দাড় করে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল আগে-আগে। এমনভাবে মাথা নিচু করে তারা পালাল যে, তাদের দুপুরের খাবার পরে রইল সেই পরিখার মধ্যেই। গেরিলারা অনুসরণ করল তাদের। পরক্ষণেই আসতে শুরু করল ছোট-ছোট খাম। ছত্রী সৈন্যেরা পালাচ্ছে; এক, দুই, তিন মাইল দূরে; ত্রাং হোয়া'তে তাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। মুক্তিফ্রন্টের পরিখায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নি এবং আমি যেটাতে ছিলাম, সেদিকে আদৌ কোন গুলিই চলে নি।

'সব শান্ত'—এই—খবর পাবার সংগে সংগেই স্থানীয় একজন গেরিলা নেতা এলেন। যে 'নিয়মিত বাহিনী' গুলি বর্ষণ করেছিল তার ইউনিট কমাণ্ডারের সংগে গেরিলা নেতার উত্তেজিত কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ ধরে। দোভাষী আমায় জানালেন, ওরা এত তাড়াতাড়ি গুলি চালিয়েছে বলে গেরিলা নেতা ক্রুদ্ধ হয়েছেন। জানতে চাইছেন, গেরিলা কৌশল মতো দশ-পনেরো গজের ভিতর শত্রুকে এনে তারপর গুলি না চালিয়ে, কেন ওরা একশ'গজ

ঘুরে থেকে গুলি চালিয়েছে। তা করলে, পুরো দলটাকেই খতম করা যেত এবং সেই সঙ্গে পাওয়া যেত ওদের অস্ত্র-শস্ত্রগুলো। জবাবে ইউনিট কমাণ্ডার জানালেন, ওদের তাড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, খতম করা নয়। কারণ একজন 'বিদেশী বন্ধু'কে রক্ষা করবার দায়িত্ব তাঁর উপর রয়েছে। ওদের খতম করলে এবং আমেরিকানদের হত্যা করলে, মৃতদেহগুলো উদ্ধারের জন্য ওরা বিরাটাকারে আক্রমণ করত এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য গ্রামের উপরেও বোমা ফেলত। 'বিদেশী বন্ধু'-কে 'যথাসম্ভব নিরাপত্তা' দেবার জন্য তাঁর উপর যে নির্দেশ রয়েছে, এসমস্ত ঘটলে সেই নির্দেশকে করা হত অমান্য।

স্থানীয় গেরিলাদের কাছে জানলাম, ওই ছত্রী সৈনিকরা হল শিক্ষার্থী। এইবার ওরা 'স্নাতক' হবে। তার আগে নকল যুদ্ধে ওদের অংশ গ্রহণ করতে হয়, এবং সব শেষে হাল্কা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত স্থানীয় গেরিলাদের সঙ্গে করতে হয় প্রকৃত যুদ্ধ। কিন্তু আজ তারা অজান্তেই ভারী মেশিনগানে সজ্জিত নিয়মিত বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। পুনরায় শত্রুর গুলিবর্ষণের মুখোমুখি হবার পূর্বে নিশ্চয়ই ওদের নকল লড়াইয়ের আর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। গেরিলা নেতা বললেন, "আমরা কয়েকটি গুলি চালাতে না চালাতেই ওই সমস্ত শিক্ষার্থীরা পালায়; এবং ওদের ফেলে যাওয়া কিছু না কিছু অস্ত্র-শস্ত্র আমরা সব সময়েই পেয়ে থাকি।"

যে গ্রামটির নিকটে উপর্যুক্ত সংঘর্ষ হয়েছিল, সেই গ্রামের ভিতর দিয়ে ঘণ্টাখানেক পর সাইকেলে যাবার সময় দেখলাম, স্থানীয় তথ্য-কেন্দ্রের একজন মহিলা কর্মী একটি মেগাফোন নিয়ে রাস্তা দিয়ে ঘোষণা করতে করতে চলেছেন যে শত্রুপক্ষের একটি আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছে, এবং "ক্ষয়-ক্ষতি ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের সংবাদ পরে জানানো হবে।"

রবার বাগানের ওই সংঘর্ষটি ছিল সায়গন অঞ্চলে আমার রোমাঞ্চকর দিনগুলির সূত্রপাত; এবং 'শত্রুর সংগে সংবদ্ধ অবস্থায় বাস করা'-র প্রকৃত অর্থ যে কি, তা কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লুকোচুরি ॥ মুক্তিফ্রণ্টের গোয়েন্দা ব্যবস্থা

যে ব্যাপারটি আমাকে সব সময় অবাক করেছে, তা হল মুক্তিফ্রণ্ট বাহিনীর কাজ-কর্মের চরম নির্ভুলতা। শত্রুঘাঁটিগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য সর্বদাই দেখেছি ঠিক সময়ে, ঠিক গাছটির পিছনে দূত অপেক্ষা করছে। ঘন কালো অন্ধকার রাতে ক্ষুদ্র একটি আলোক-সংকেত আমাদের উদ্দেশ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠেছে ঠিক সেই সময়, যখন দ্বিতীয় রক্ষা দলটি আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবার জন্য হাজির। ওই বিশেষ আলোর বিন্দুটি যে ওই বিশেষ স্থানে এবং ওই বিশেষ সময়েই জ্বলে উঠবে একথা যে জানে না, সে ওটাকে জোনাকির আলো বলেই ভুল করবে। শত্রু-নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে কোনো নদী পার হবার জন্য নির্দিষ্ট সময়েই হাজির থাকবে সামপান। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অতিক্রম করবার জন্য যে বিশেষ স্থানটি নির্দিষ্ট করা আছে, ঠিক সেই জায়গাতেই দেখা যাবে যথাসময়ে কাঁটাতারগুলো কাটা রয়েছে। গুপ্ত সুড়ঙ্গগুলোতে নিয়ে যাবার যে পথপ্রদর্শক, তার যখন এবং যেখানে থাকবার কথা, তখন সেখানে সে থাকবেই। এর কখনো অন্যথা দেখি নি।

অথচ আশ্চর্য, সায়গনের সন্নিকটে, যেখানে প্রভাতী সংবাদপত্র আসে সে সমস্ত স্থান ছাড়া, অন্য কোন স্থানের কাউকে জিজ্ঞাসা করলে প্রায়শই বলতে পারত না সেটা সপ্তাহের কোন দিন অথবা অথবা কোন্ তারিখ। উচ্চপদস্থ ক্যাডাররাও আমাকে বলেছেন যে, সঠিক তারিখ নির্ধারণ করতে তাঁদের মাঝে-মাঝে বিস্তারিত আঁক-জোঁক করতে হয়। কিন্তু যেই ঘণ্টা এবং মিনিটের মধ্যে এসে যায়, সেই তারা হয়ে পড়ে স্পুটনিকের মতো নির্ভুল। এটা অবশ্য না হয়ে

তাদের উপায় নেই। বিশেষ করে সায়গনের বহিঃসীমা ঘিরে সেই অগ্রবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু গভীর জংগলের মধ্য দিয়ে সরু একটা পথ ধরে সাইকেলে যেতে যেতে, পাচক হঠাৎ যখন ঝুঁকে পড়ে এবং সাইকেলের গতি শ্লথ না করেই জংলি লতা দিয়ে পা দুটো বাঁধা আমার দুপুরের খাবার একটা মুরগি পাশের ঝোপ থেকে চট করে টেনে নেয়, তখন আমি অবাক না হয়ে পারি না। সেই বিশেষ স্থানে একটি মুরগির ব্যবস্থা যে কী ভাবে করা হল, সেটা আজও আমার বোধগম্য হয় নি। এবং ঠিক কোন্ ঝোপটার মধ্যে মুরগিটা রাখা আছে সেটা পাচক কি করে জানল সে কথা ভেবে আরো বেশী অবাক হয়েছি।

এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হল, শত্রুপক্ষের শুধুমাত্র গতিবিধিরই নয়, তাদের উদ্দেশ্যেরও যে নির্ভুল সংবাদ ফ্রন্টের সামরিক ক্যাডারেরা রাখে, সেইগুলো যাত্রা পথের কোনো একটি স্থানে, গেরিলা দলটির নেতা হয়তো বিশ্রামের প্রস্তাব করলেন। সেটা জংগলের পথে বা খালের ধারে অথবা পাহাড়ী রাস্তায় যে কোনো স্থানে হতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছোট-ছোট খাম নিয়ে দলের কোনো লোক নিশ্চয়ই উপস্থিত হবে। এই খামগুলোর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এদের প্রতি খুব তাড়াতাড়ি আমার ভালবাসা জন্মে গিয়েছিল। কারণ শত্রুপক্ষের গতিবিধি এবং কর্মপন্থা সম্বন্ধে তারা অনবরত খবর আনত। খামগুলো প্রায়ই আসত শত্রু ঘাঁটিকে ঘিরে দিবারাত্রি প্রহরারত গেরিলা দলগুলোর কাছ থেকে, অথবা সেই ঘাঁটির ভিতরে অবস্থানরত কোনো লোকের কাছ থেকে। কখন কখন এই ছোট ছোট চিঠিগুলো আমাদের ভ্রমণ-সূচীতে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিশেষত সায়গন অঞ্চলে। ব্যাপারটা প্রায়ই হত এই রকম। একটা চিঠি পড়ে দলের নেতা তাসের মতো কতগুলো কার্ড বার করতেন। তারপর, সেই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যে পথপ্রদর্শক আমাদের নিয়ে যাবে, তার সংগে পরামর্শ করে, কার্ডগুলোকে বেছে বেছে চিঠির খবরের সংগে মেলাতেন, এবং পথ-প্রদর্শক যেটার সংগে একমত হতেন,

সেটাকেই বেছে নিতেন। এই গেরিলাদের কাজই হল ডাকপরিবহণ করা এবং শত্রু ঘাঁটিগুলোর ভিতর দিয়ে ক্যাডারদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কার্ডগুলো অক্ষর এবং সংখ্যায় ঠাসা; এবং মুখের কঠিন, গম্ভীর ভাব দেখে যে কোনো লোকের ধারণা হবে যে, বিরাট অংকের বাজি ধরে বুঝিবা কোন খেলা হচ্ছে। আসলে কিন্তু ওই সংখ্যা এবং অক্ষর গুলো হল, যে অঞ্চলের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি, তার প্রতিটি সড়ক এবং পায়ে চলার পথ, প্রতিটি নদী-নালা ইত্যাদির সাংকেতিক চিহ্ন। প্রতিটি কার্ড হল বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজনের প্রতীক; 'ক' বিন্দু থেকে 'খ' বিন্দু পর্যন্ত চলাফেরার সমস্ত গন্তব্য পথের নিশানা। শত্রুর গতিবিধির সংবাদ অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্ডটি বাছা হয়, এবং সেই অঞ্চলের গেরিলাদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

সাইকেলে ভ্রমণকালে প্রায়শই আমাদের ছোট দলটি ছড়িয়ে পড়েছে সরু সরু পায়ে চলা পথগুলোতে। সে পথও বিচিত্র। সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলে গেছে জংগলের ভিতর দিয়ে। কখনো কখনো সেগুলো আবার এমন এক কেন্দ্রস্থলে গিয়ে মিশেছে যেখান থেকে সাইকেলের স্পোকের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে বহু পথ। এক্ষেত্রে, পথ-প্রদর্শকের দায়িত্ব হল, যারা পিছনে পড়ে গেছে তারা যাতে বিপথে চলে না যায় সেজন্য কোন্ পথটি অনুসরণ করতে হবে তার নির্দেশ করা। এই নির্দেশ দেওয়া হয় এমন চিহ্নের সাহায্যে যা একমাত্র গেরিলারাই জানে। এবং সেই নির্দেশ হতে হবে নির্ভুল। কারণ প্রায়ই আমরা দিনের আলোয় শত্রুঘাঁটির দুই-এক মাইলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করেছি। এরকম অবস্থায়, সামান্য ভুল হলেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোজা গিয়ে পড়তে হবে শত্রু-ঘাঁটির মুখোমুখি। হুইন তান-ফাট-এর কথামতো, শত্রু গ্যারিসনটি 'ছিপি আঁটা' অবস্থায় থাকলেও, তাদের কামানের গোলা এবং মেশিনগানের বুলেট নিশ্চয়ই 'ছিপি আঁটা' থাকে না।

একটি ঘটনা এখনও বেশ মনে আছে। যেদিন আমরা সায়গন-

জিয়াদিন অঞ্চল ছেড়ে উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা করব, ঘটনাটি ঘটেছিল তার আগের দিন সন্ধ্যায়। যথারীতি একটা ছোট্ট খাম এলো; এবং সেটা পাঠ করে সকলের মুখ হয়ে উঠল ভয়ানক গম্ভীর। সেই অঞ্চলের সেনাপতি বললেন, "আগামী দু-দিনের মধ্যে শত্রুরা আমাদের নির্মূল করবার উদ্দেশ্যে বিরাট অভিযান চালাতে যাচ্ছে। এতে তারা পাঁচ ব্যাটেলিয়ান—প্রায় চার হাজার সৈন্য নিয়োগ করবে। যে অঞ্চলটির ভিতর দিয়ে আপনারা যাবেন, অভিযান চালানো হবে সেই অঞ্চলেই। যে সমস্ত রাস্তা আপনাদের পার হতে হবে, অথবা যেগুলো দিয়ে আপনারা যাবেন, সে সমস্ত তারা অধিকার করবে। যে নদীপথ দিয়ে আপনাদের যেতে হবে, সেগুলোতে পাহারা দেবে ওদের টইলদারী বোট। এ অভিযান চলবে চারদিন ধরে। সুতরাং আমরা প্রস্তাব করি আপনি এখানেই থাকুন। এখানে আমরা আপনাকে রক্ষা করতে পারব।"

ঠিক দু-দিন পর, একদিন সকালে দেখা গেল বিমান এবং হেলিকপটারের প্রচণ্ড তৎপরতা। প্রভাতের প্রথম আলোর রেখা দেখা দিতে না দিতেই, বোমারু বিমানের জন্য লক্ষ্যস্থল খুঁজে বার করবার উদ্দেশ্যে, চারিদিকে সগর্জনে উড়ে বেড়াতে লাগল মাদ্‌মোয়াজেলগুলো। বেতার মারফত তারা যে কি সংবাদ পাঠাল তা অনুমান করতে পারলাম না। কিন্তু সকাল আটটা নাগাদ, দুটি বি-২৬ বোমারু বিমান আকাশে দেখা দিল এবং চার ঘণ্টা ধরে চালিয়ে গেল একনাগাড়ে আক্রমণ। একটিমাত্র বৃত্তপথ ধরে বার বার সে দুটো উড়তে লাগল, এবং প্রতিবার ফেলতে লাগল কয়েকটি করে বোমা। পড়ন্ত বোমার গতিপথ সম্বন্ধে আমার দোভাষী ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। বোমাগুলোর গতিপথ দেখে এবার তিনি নিজের যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দিলেন। আগন্তুক বিমানগুলোকে ঈগল-দৃষ্টিতে নজরে রেখে তিনি বলে যেতে লাগলেন কখন্ বোমাগুলো ছাড়া হচ্ছে, সেগুলো কাছাকাছি আসছে কিনা এবং আমাদের পরিখার ভিতরে লাফিয়ে পড়তে হবে কিনা। বোমাগুলোর নেমে

আসার শব্দের সংগে সংগে আমরা লাফিয়ে উঠছিলাম এবং পরিখার ভিতরে আমাদের পা পড়বার শব্দ ও বোমা বিস্ফোরণের ভয়াবহ শব্দ দুটিই হচ্ছিল একই সংগে। পরিখার ভিতরে প্রবেশ করাটা যতদূর সম্ভব আমরা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ মাটির ছাদের ভিতর দিকটা বড় বড় ঠ্যাংওয়ালা মাকড়সায় ভরা ছিল। বোমা বিস্ফোরণের ধাক্কায় প্রতিবারই তার কয়েকটা করে আমাদের ঘাড়ের উপর পড়ছিল।

সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা

ছোট ছোট খামগুলো আসতে থাকল সারাদিন ধরে। এর মধ্যে দুপুরের মাঝামাঝি সময়ে একটা খাম এল জরুরী সংবাদ নিয়ে। তাতে জানানো হয়েছিল যে, শত্রুদের ঘাঁটির দিকে সাংগন সেনাবাহিনী মাত্র আধ মাইল দূরের একটা রাস্তা দখল করে নিয়েছে। সুতরাং আমাকে এবং আমাদের দলের কয়েকজনকে একটা গুপ্ত সুড়ংগের মধ্যে লুকোতে হবে। অন্যদের তৈরী হতে হবে 'সামরিক ব্যাপারে'র জন্য। পূর্বে ঠিকই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পাঁচ ব্যাটেলিয়ন সৈন্যই নিযুক্ত করেছিল শত্রুপক্ষ। তাদের সংগে ছিল ২৩টি এম-১১৩ ট্যাংক।

কামান এবং মর্টারের গোলাগুলো এসে খুব কাছেই পড়ছে। আশংকাজনকভাবে গর্জন শোনা যাচ্ছে মেশিনগানের। এই অবস্থায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল কলার বাগিচার ভেতর দিয়ে সরু পথ ধরে একটা চৌকো গর্তের কাছে। এই গর্ত দিয়েই সবাই একটা সুড়ংগে নামলাম। আমার অবশ্য নামতে কষ্ট হল বেশ। সবাই ভিতরে প্রবেশ করবার পর গর্তের মুখ মাটি এবং পাতা দিয়ে ঢেকে আমাদের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলা হল। ঘটনা প্রবাহের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য খুব ভালভাবে দৃষ্টির আড়াল করা বিভিন্ন ঘাঁটিতে মোতায়েন হয়ে গেল প্রহরীরা। আমাকে আশ্বাস দেওয়া হল, সুড়ংগটি বিরাট লম্বা। বিভিন্ন গ্রামকে সংযুক্ত করে যে সুড়ংগের

জাল রয়েছে, এটি হল তাদের অন্যতম। আমরা ভিতরে প্রবেশ করবার পূর্বে যথারীতি একগোছা কার্ড নিয়ে পরামর্শের পর, 'প্রকৃত জরুরী অবস্থা'র উদ্ভব হলে কোন্ দিকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে সে সম্বন্ধে সুড়ংগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন গাইডকে নিখুঁতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

আমার আকারের মানুষের জন্য সুড়ংগগুলো তৈরী হয় নি। অন্যেরা এর ভিতরে অনায়াসে সোজা হয়ে হাঁটতে অথবা ছুটতে পারে। কিন্তু আমার পক্ষে গুঁড়ি মেরে চলা ছাড়া উপায় নেই। তাই, মুহূর্তের জন্য আমার একটা দমবন্ধ ভাব-হল। মাটির নিচে আবদ্ধ জায়গায় থাকাটা চিরদিনই আমার কাছে ভীতিপ্রদ মনে হয়। লোকে যে কি ভাবে খনিতে কাজ করে ভেবে অবাক হই। প্রথমে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কারণ, সবাই আমরা এক জায়গায় জড়াজড়ি করে ছিলাম। নিজেদের এবং মালপত্রগুলোকে সুড়ংগের ভিতরে আনার পরিশ্রমে হাঁফাচ্ছিলাম সবাই।

পরে, গাইডের নির্দেশে দলের বাকী লোকেরা অন্যত্র চলে গেলে বাতাস খানিকটা হালকা হল। মাটির উপরে লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে দেখলাম শ্বাস-প্রশ্বাসও আবার সহজ হয়ে আসছে। অবশ্য, তখনো থেকে-থেকে ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে বাইরে বেরিয়ে যাই। তাতে যা হবার হবে। কিন্তু রক্ষা এই যে, ইচ্ছেটা অন্তর্হিত হচ্ছিল সংগে সংগেই। মাটিতে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা; ধূলিকণার চাইতে আকারে বড় নয়। কিন্তু আশ্চর্য দ্রুততার সংগে সেগুলো শরীরে গেন গেঁথে যায়। এবং আক্রান্ত স্থান ছুঁলেই মনে হয় ছুঁচ ফোটার মতো জ্বালা। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু চুলকানি শুরু হতেই ব্যাপারটা আমাকে জানিয়ে দেওয়া হল। মাটিতে বিছিয়ে শোবার জন্য একজন এনে দিল একখণ্ড নাইলনের কাপড়। এবার একটু রেহাই পেলাম। নতুন আর কোন পোকা ঢুকতে পারল না। কিন্তু যেগুলো আগেই ঢুকে পড়েছিল, সেগুলো শরীরের ছিল কয়েক সপ্তাহ ধরে। মনে হয় জ্বালা করা ছাড়া ওদের দ্বারা আর কোনো

ক্ষতি হয় না।

কিছুটা চাপা হলেও, লড়াইয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল পরিষ্কার-ভাবে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল লড়াইটা চলছে খুব কাছেই, এবং এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই। তাই, প্রথমে সমস্ত মালপত্র সুড়ংগ পথে সরিয়ে দেওয়া হলো। এই রকম অবস্থায় কোনো জিনিস একবার হাতছাড়া হলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। তাই জিনিসপত্র সব এতক্ষণ সংগে সংগেই এনেছিলাম। জিনিসপত্র বলতে অবশ্য আমার ছিল মূল্যবান কিছু নোট এবং তোলা ছবির ফিল্ম। শত্রুপক্ষের হাতে পড়বার আশংকা থাকলে সেগুলোকে যাতে নষ্ট করে ফেলা হয় সেই জন্য আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। এই উদ্বেগ আরো ছিল এই কারণে যে, সেই গর্তের ভিতরে যখন নিজেকে দুমড়ে মুচড়ে কোনো রকমে প্রবেশ করাচ্ছি, সেই সময়েই প্রায় এক শ' গজ দূরে ভয়ংকর শব্দে গর্জে উঠেছিল মেশিনগান এবং তার পরেই বিশ-ত্রিশ গজের মধ্যেই শোনা গিয়েছিল কারবাইন দাগার শব্দ। তাই ধারণা হয়েছিল, গুলি চালানো হয়েছিল আমাদের লক্ষ্য করেই এবং সায়গন-সৈন্যেরা ভিতরে ঢুকে পড়েছে ও আমাদের গুপ্ত আশ্রয়স্থল দেখে ফেলেছে।

প্রকৃত ব্যাপারটি অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম কয়েক ঘণ্টা পরে। সায়গন বাহিনীর একটি টহলদারী দল কয়েক শ' গজের মধ্যে এসে পড়েছিল, এবং ফ্রন্ট ফৌজ তাদের প্রতি ক কবার ভারী মেশিনগানের গুলি চালায়। ফ্রন্টের সান্ত্রীরাও টহলদারী দলটিকে দেখতে পেয়েছিল এবং কারবাইন দেখে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিল।

যাই হোক, মনে হচ্ছিল গুলি আসছে চারদিক থেকে। এবং প্রকৃত ঘটনা আমার দোভাষী হুইন নিজেও জানতে পারেন নি। তাই তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "উদ্বিগ্ন হবেন না। এর ভিতর থেকে আমরা আপনাকে বাইরে নিয়ে যাবোই।" জবাবে বললাম, আমার প্রথম উদ্বেগ হল নোট এবং ফিল্মগুলোর জন্য। দ্বিতীয় হল, মস্কোতে আমার স্ত্রীর কাছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে

কোনো সংবাদ পাঠাতে পারি নি। শুনেই তিনি গুঁড়ি মেরে চলে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন :

"তিন-চার শব্দের খুব সংক্ষিপ্ত কোনো সংবাদ যদি পাঠাতে চান তা'হলে তা আমরা এখান থেকেই পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সেটা এখনি দিতে হবে।" সংগে সংগে নোট বইয়ের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে আমার টেলিগ্রামের ঠিকানা ও গতানুগতিক 'সম্পূর্ণ সুস্থ আছি' বার্তাটি লিখে তাঁর হাতে দিলাম। হুইন সেটা নিয়ে গুঁড়ি মেরে চলে গেলেন, এবং একটু পরেই ফিরে এসে জানালেন, টেলিগ্রামটি পাঠাবার জন্য একজন বার্তাবাহক সেটাকে নিয়ে তখনি যথাস্থানে চলে গেছে। বস্তুতঃ আমার স্ত্রী দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন, এবং তিন দিন পরে মস্কোতে তিনি আমার বার্তাটি পান। যে পরিস্থিতিতে সেটা পাঠানো হয়েছিল তা জানতে পারলে তাঁর উৎকণ্ঠা নিশ্চয়ই আরো বেশী হত। যাই হোক, হুইন আরো জানালেন যে, আমার নোট (তিন শ' টাইপ করা পৃষ্ঠা) এবং ফিল্মভর্তি থলেটা এই সুড়ংগের দেওয়ালে বিশেষভাবে তৈরী গর্তগুলোর একটিতে সিল করে রাখা হয়েছে। এরপর আমাকে সেই খাঁজকাটা সুড়ংগের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল অন্য একটি স্থানে। বাতাস আসবার জন্য সেখানে সমান্তরাল ছোট্ট একটি ফোকড় রয়েছে দেখলাম। গর্তটা সুড়ংগ থেকে বেরিয়ে সোজা যেয়ে পড়েছে সূচালো মুখের খোঁটা পোঁতা একটা ফাঁদের মধ্যে। গর্তের ভিতর দিয়ে নির্মল বাতাসের স্রোত আসছিল। সেই দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লাম। ঘুম এসে গেল। কামান-দাগার শব্দের তরংগ মনে হল যেন কিছুটা কমেছে।

ঘুম ভাঙলো দোভাষীর ঝাঁকানিতে। জানালেন, কিছু ক্ষয়-ক্ষতির পর সায়গন-বাহিনী কয়েক মাইল হটে গেছে ; তাই কিছুক্ষণের জন্য আমরা মুক্ত বাতাসে বেরুতে পারি। চারিদিক থেকে সেই রকম ছোট ছোট খাম আসতে শুরু করল ; এবং সেগুলো থেকে জানা গেল, সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক আগে শত্রুরা বেশ ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য

করে প্রায় তিন মাইল দূরে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। বেশ খানিকটা আলোচনার পর স্থির হল, শত্রুর কাছ থেকে আরো কিছুটা দূরে আমরা সরে যাব। সেখানকার সুড়ংগ আরো আরামদায়ক; এবং বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য খুব ভাল আশ্রয়স্থলও রয়েছে। সুতরাং আবার শুরু হল ঘণ্টাখানেকের পথ পাড়ি দেওয়া। বেশ বড় একটা নদীর তীরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আবার জরুরী পরামর্শ সভা বসল। আমাদের কাছাকাছি কোথাও থেকে কোনো বড় জলযানের ইঞ্জিনের অশ্বস্তিকর শব্দ ভেসে আসছিল। কয়েক মিনিটের ভেতরেই এসে হাজির হল একটি খাম। জানা গেল, ভাটির দিকে মাইল খানেক দূরে একটা জেটিতে একখানা বিমানবাহী জলযান নোঙর করা রয়েছে; এবং তাতে রয়েছে কেবলমাত্র নাবিকেরা।

আলোচনা সমাপ্ত হলে সামরিক অধিনায়ক বললেন, "এর দুটি সম্ভাবনা হতে পারে। হয় ওই জাহাজটি সৈন্যদের মূল ঘাঁটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে; অথবা এই অঞ্চলে আক্রমণের উদ্দেশ্যে সৈন্যদের বহন করবার জন্য অপেক্ষা করছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই মনে হয় ঠিক; কারণ, মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এই তৎপরতা চলবে আরো তিন দিন। সুতরাং আপনাকে নিয়ে আমরা আবার সরে যাবো।"

আকাশ ভেঙে ঝরে পড়ছে অপূর্ব চাঁদের বন্যা। অবিলম্বে ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হল। খোলা চপ্পলের ফাঁক দিয়ে পায়ে বিঁধতে লাগলো কাঁটা ধানগাছের শুকনো গোড়াগুলো। আধ ঘণ্টা ধরে দ্রুত চলবার পর বিমানবাহী পোতটির মোটরের শব্দ আবার কানে এল। স্পষ্ট বোঝা গেল, যে স্থান একটু আগেই আমরা ছেড়ে এসেছি, সেই দিক লক্ষ্য করেই সেটা চলেছে। প্রায় সংগে সংগেই ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা উড়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। প্রতিটি বিস্ফোরণের সংগে সংগে আমরা মাটির উপর শুয়ে পড়তে লাগলাম। পরক্ষণেই আবার যাত্রা। এইভাবে একটানা তিন ঘণ্টা মার্চ করলাম। গোলাবর্ষণের সময় ওই উপুড় হয়ে পড়াটুকু ছাড়া আর কোনো বিশ্রাম নেওয়া হল না। অবশেষে একটা ঘন

জংগলের মধ্যে গিয়ে আমাদের দোলনা বিছানাগুলো টাঙানো হল। আমারটা টাঙানো হল যে গাছে, তার পাশেই দেখলাম হাজার পাউণ্ডের একটা বোমা বিস্ফোরণে সৃষ্ট বিরাট একটা খাদ। আমরা পৌঁছুবার আধঘণ্টা পর দূরে স্বয়ং-ক্রিয় অস্ত্রের দমকা ফায়ারের একটি তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল। পরে একটা থাম এলে জানলাম, আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি সেই পথ ধরে ফ্রণ্টের একজন কর্মী আসছিল। হঠাৎ বিমানবাহী পোতের একটি টহলদারী দল তাকে ঘিরে ফেলে এবং টমিগানের গুলিতে নিহত করে।

সামরিক মানুষ-শিকার

সায়গন-বাহিনীর প্রধান অংশটি সেই অঞ্চলে চলে আসায়, পরের দিন খুব ভোর থেকেই শত্রুর তৎপরতা পুরোদমে শুরু হল। ফ্রণ্টের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলোকে খুঁজে বার করে সোজাসুজি কামান দাগার উদ্দেশ্যে মাদ্‌মোয়াজেলগুলো ভিমরুলের মতো উড়তে লাগল মাথার ওপরে। আক্রমণকারীদের কামান ও মর্টারের গোলা, মেশিনগানের একটানা ফায়ার ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের শব্দ এবং প্রতিরোধকারীদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের হালকা, সংক্ষিপ্ত শব্দ ও এক একটা করে রাইফেল দাগার আওয়াজ—দুটোই খুব সহজে বোঝা যাচ্ছিল। গেরিলারা কখনো একটা গুলিও বৃথা খরচ করা পছন্দ করে না। কার্তুজ তাদের কাছে খুবই মূল্যবান বস্তু।

বোমা ও কামানের গোলা বজ্রনির্ঘোষে নেমে আসছে। তার জবাব যাচ্ছে হালকা অস্ত্র মারফত। সাংঘাতিক অসম একটা লড়াই বলে মনে হলো। কিন্তু শত্রুর ইচ্ছা অনুসারে গেরিলারা লড়াই করে না। তারা শত্রুর গতি শ্লথ করে দেয়, কিছুটা ক্ষয়-ক্ষতি করে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। লড়াই তারা যখন করে, তখন নিজেদের সুবিধা অনুসারে, এবং তাও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার খুব কাছাকাছি নয়। বর্তমানে যা হচ্ছিল, তাও ছিল সেই একই ব্যাপার। এ

সামরিক তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নের জবাবে ফ্রন্টের আঞ্চলিক কমাণ্ডার বললেন :

"এটা আসলে হল পাইকারীহারে মানুষ শিকার, এবং খাদ্যশস্য ও গৃহপালিত পশু ধ্বংস করা। আসলে সেনাবাহিনীতে যোগদেবার মতো বয়সের সর্বাধিক সংখ্যক লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে বাধ্যতামূলক-ভাবে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই ওরা এগুলো করে। এর সংগে থাকে ধানের গোলা ও শুয়োর-মুরগির খোঁয়াড় ধ্বংস করার মতলব। কিন্তু আমাদের লোকেরাও ওই সমস্ত জিনিস লুকিয়ে রাখতে ওস্তাদ্। এ রকম পরিস্থিতিতে প্রতিটি নরনারীর কর্তব্য নির্দিষ্ট করা আছে। তা'ছাড়া, এই ধরনের আক্রমণ সম্বন্ধে সময় মতোই আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়। যুবকেরা নজর রাখে প্রতিরক্ষার দিকে। আর, যুদ্ধটা আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী হলে, মেয়ে গা ঢাকা দেয়। বালক-বালিকারা গৃহপালিত পশুগুলোকে নিয়ে যায় গুপ্তস্থানে। বৃদ্ধেরা অস্থায়ী ফাঁদগুলোকে পেতে রাখে, আর, স্থায়ী ফাঁদগুলো যাতে ঠিক থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখে। শত্রু গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করলেও, বৃদ্ধেরা পালায় না। ভিয়েতকংরা সব জায়গায় ফাঁদ পেতে রেখেছে—এই কথা বলে তারা শত্রুসৈন্যদের বাড়ি এবং বাগানগুলোর থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দেয়। কোনো মাতৃসমা বৃদ্ধা হয়ত বলে : 'সারা এলাকা জুড়ে ভিয়েতকংরা বর্শার মতো সাংঘাতিক সব খোঁটা পুঁতে ফাঁদ পেতে রেখেছে ওইগুলোতে তোমাদের মতো সুন্দর, স্বাস্থ্যবান যুবকদের হাত-পা এবং পেটগুলো যদি ফেঁসে যায় তবে বড়ই দুঃখের ব্যাপার হবে।' অথচ, সেই বৃদ্ধাই হয়তো সারা রাত বসে-বসে বাঁশের বাঁকারির ডগা তীক্ষ্ণ করেছে এবং নিজেও কিছু কিছু ফাঁদ পেতেছে। সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে বৃদ্ধেরা অফিসারদের সংগে তর্কও জুড়ে দেবে। ভয় দেখাবে, সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হলে তারা জেলা এবং প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানাবে এবং ক্ষতিপূরণ দাবী করবে।"

বর্তমান সামরিক তৎপরতায় ফ্রন্টের সশস্ত্র বাহিনী এবং স্থানীয়

গেরিলাদের ভূমিকার বিষয়ে প্রশ্ন করলে, তিনি আবার বললেন, "ওরা যদি আমাদের সুরক্ষিত গ্রামগুলোর উপর আক্রমণ চালায়, সে ক্ষেত্রে আমরা তাদের পাল্টা আঘাত করব। ব্যবস্থা সব কিছু করাই আছে। নইলে আমাদের কাজ হল শত্রুর প্রধান উদ্দেশ্যকেই বানচাল করে দেওয়া; অর্থাৎ শক্ত-সমর্থ পুরুষদের যাতে ধরে নিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা; এবং আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক মনে হলে, শত্রুর সংগে সংঘর্ষ একেবারে এড়িয়ে চলা। বর্তমানে শত্রুপক্ষ যে সমস্ত অঞ্চল থেকে পাঁচ ব্যাটালিয়ন সৈন্য সরিয়ে এনে এদিকে নিয়োগ করেছে, আমাদের নিয়মিত বাহিনী গিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চলে। এইভাবে 'তে-নিন' প্রদেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শত্রুঘাঁটি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, এবং পরবর্তী দিন-দুয়েকের ভেতর আরো বহু ঘাঁটি ধ্বংস করা হবে।"

"আর, ওই কামান এবং মর্টার দাগা? কোন্ লক্ষ্যবস্তুর উপর ওরা ওগুলো চালাচ্ছে?" আবার প্রশ্ন করলাম।

আঞ্চলিক কমাণ্ডার জবাব দিলেন, "মাঝে-মাঝে ওরা আমাদের কিছু-কিছু প্রতিরক্ষা ঘাঁটি আবিষ্কার করে ফেলে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বনের যে সমস্ত অংশে, বাঁশ বনে অথবা অন্য কোনো স্থানে লোকজন আশ্রয় নিয়েছে বলে ওদের সন্দেহ হয়, সেই সমস্ত অঞ্চলের ওপর ওরা অন্ধভাবে বোমা বর্ষণ করে এবং কামান দাগে। এবং আমার ধারণা, ওদের গোলা-গুলির অর্ধেকই ছোঁড়ে নিজেদের সৈন্যদের মধ্যে কিছুটা মনোবল যোগাবার উদ্দেশ্যে। ওই শব্দ যে আমাদের লোকদের ভীত করবে, এ আশা ওরা অনেক আগেই ত্যাগ করেছে, কারণ সেই আশার উল্টোটা প্রমাণ করবার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে ওদের।"

ঘণ্টা খানেকের তথা-কথিত শান্তির পর আবার যখন কামান দাগা শুরু হল, তখন রেডিও অস্ট্রেলিয়া প্রচারিত সকাল ১১টার সংবাদ শুনলাম। রয়টার কর্তৃক প্রেরিত এক সংবাদে বলা হল: "সিনিয়ার মার্কিন অফিসর এবং সায়গন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারি-

গণ দাবী করেছেন যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতকংদের চাপ ব্যর্থ করবার জন্য কমুনিস্ট-উত্তর ভিয়েতনামেও যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটাতে হবে।" প্রায় আধ মাইল দূরে আক্রমণরত দুটি বোমারু বিমানের প্রচণ্ড গর্জনে সংবাদের বাকী অংশটুকু চাপা পড়ে গেল। দুটি বিমানই ঝাঁপ দিল তিনবার করে। প্রতিবারই ফেললো আধ-টন ওজনের দুটি করে বোমা। চতুর্থ ঝাঁপে তারা রকেট নিক্ষেপ করল এবং মেশিনগান চালালো।

সেই দিনই খানিক পরে অবস্থা কিছুটা শান্ত হলে আমরা কয়েকজন বেরুলাম ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে। এই যুদ্ধের ট্যাক্স যে মার্কিন নাগরিকগণ যোগাচ্ছেন, তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল এসে এগুলো দেখলে চমৎকৃত হতেন। প্রায় তিন শ' গজ লম্বা ও এক শ' গজ চওড়া একখণ্ড জংগলের মাটিতে বারোটি বিরাট বিরাট গহ্বর এবং সেগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অনধিক তিন ইঞ্চি গভীর কিছু গর্ত এবং রকেটের অংশ। লক্ষ্যবস্তু ছিল, বনজংগলের ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান ছোট্ট একখানি পায়ে-চলা পথ। তারই উপরে একটি বোমা সরাসরি এসে পড়েছিল। ভাবলাম, হয়তো ওই পথ দিয়ে একদল সৈন্য চলাচল করছিল। কিন্তু খবর নিয়ে দেখা গেল ওই অঞ্চলে একটি মানুষও ছিল না এবং সেনাদল থাকলেও, চারিদিকে বিমান-তৎপরতা দেখে তারা নিশ্চয়ই গা ঢাকা দিত জংগলের মধ্যে। ছুরির সাহায্যে জংগল কেটে গর্তগুলোর পাশ দিয়ে নতুন একটা পায়ে-চলা পথ তৈরী করে নিতে গেরিলাদের লাগতো মাত্র মিনিট-পাঁচেক সময়।

আমরা ফিরে এলে আঞ্চলিক কমাণ্ডার বললেন, "এই তো হল নমুনা। ছোট্ট একটুকরো পথের রেখা দেখলেই ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বোমা বর্ষণ করে সেটাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে। কামানের গোলা ও বোমার এই অকল্পনীয় অপচয় চলছে দিনের পর দিন ধরে।"

আক্রমণটা আমাদের গুপ্ত আশ্রয়ের কাছাকাছি কোনো সময়েই আসে নি। এবং তৃতীয় দিনের প্রভাতে গুলির শব্দ বেশ দূরে চলে

গেল। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় শেষ হল শত্রুর সামরিক তৎপরতা। পরের দিন দুপুর নাগাদ এসে পড়ল বহুসংখ্যক খাম। নিশ্চিতভাবে জানা গেল শত্রুপক্ষ নিজেদের ব্যারাকে ফিরে গেছে। অতএব আমরাও উত্তর-পূর্ব দিকের 'বিন-হুয়োঙ' প্রদেশ অভিমুখে রওনা হলাম।

ইতিমধ্যে আমার একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়েছিল। একবার এক কাঁকড়াবিছার দংশন ছাড়া সারাটা ভ্রমণ-পথে সেই আমার একমাত্র অসুস্থ হওয়া। এর মধ্যে ঘটল একটা ঘটনা। বহু উন্মুক্ত স্থান অতিক্রম করে যেতে হচ্ছিল আমাদের। কখনো কখনো আবার ঘন বালির ভিতর দিয়ে। তার উপর আবার শত্রুর বিমান ও হেলিকপ্টারের জন্য চলতেও হচ্ছিল খুব দ্রুত। সেই সংগে ছিল দিনের বেলার প্রচণ্ড গরম; প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো। এই ধরনের স্থানগুলোর মধ্যে সবচাইতে বড় একটা জায়গা অতিক্রম করবার সময়, গভীর বালির জন্য আমাদের সাইকেল থেকে নেমে পড়তে হল। ঠিক সেই মুহূর্তেই কানে এল আমাদের দিকে এগিয়ে আসা 'ডাইভ বম্বারে'র শব্দ। সংগে সংগে সাইকেল ঘাড়ে নিয়ে সবাই যথাসম্ভব দ্রুতবেগে ছুটলাম। বিমানের শব্দ মনে হল বিপজ্জনকভাবে কাছে এসে গেছে। তখনও জংগলের সীমানা কয়েক শ' গজ দূরে। সেই সীমানার ধারে ধারে ঐ অঞ্চলের কিছু গেরিলা সৈনিক গুলি চালাবার জন্য তৈরী হয়ে বসল। আমরা লাগালাম দৌড়। আমার সারা শরীর দিয়ে জলস্রোতের মতো ঘাম ঝরতে লাগল। মনে হল কেউ বুঝি এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছে। একটা ঘন ঝোপের মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে না করতেই বিমানগুলো এসে পড়ল এবং লক্ষ্যবস্তুর সন্ধানে চক্কর দিতে শুরু করল। সৈনিকদের প্রতি আদেশ ছিল, বিমানগুলো আক্রমণ না করা অবধি তারা যেন গুলি না চালায়। কয়েকটা চক্কর দিয়ে বিমানগুলো সগর্জনে উড়ে গেল।

এই ভ্রমণের মধ্যে, এই প্রথম এবং এই শেষবার আমি ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়লাম। 'ফ্লু' আমাকে আগেই দুর্বল করে দিয়েছিল। এই অত্যধিক পরিশ্রমে পেড়ে ফেলল একেবারে। কিন্তু এগিয়ে

যেতেই হবে। বিমানগুলো হয়তো হেলিকপ্টার আক্রমণের মুখবন্ধ ; এবং তার জন্য উন্মুক্ত স্থানটি হল সবচাইতে উপযুক্ত। কারণ সেখানে বর্শার মতো কোন খোঁটা ছিল না। তাই দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই মনে হল পা দুটো যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। সহসা গাছপালা আকাশ সব কিছু ওই বালুকাময় পথের সংগে একাকার হয়ে গেল।

দুজন শক্ত সমর্থ সৈনিক আমার দুরবস্থা লক্ষ্য করেছিল। তারা সংগে সংগে এগিয়ে এল ; পরামর্শ করল নিজেদের মধ্যে। তারপর ছোট একটা গাছ কেটে তার সংগে বেঁধে ফেলল আমার দোলনা বিছানাটা। এবার আর পালকিতে চড়তে আপত্তি করতে পারলাম না। কারণ সেখানে থাকলে সম্পূর্ণ দলটাই বিপদে পড়তে পারে। সেই মুহূর্তে আমাদের 'অতীব বিস্ময়কর' পাচক হাতে একটা 'সায়গান লা-রু' বিয়ারের শুভ্র ফেনোচ্ছল বিরাট বোতল নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আস্তে আস্তে সেটা পান করলাম। সংগে সংগে অনুভব করলাম লুপ্ত-শক্তি ফিরে আসছে। ডাক্তার মন্তব্য করলেন, শরীর থেকে খুব বেশী পরিমাণে জলীয় পদার্থ বেরিয়ে যাবার দরুণ এই রকম দুর্বলতা দেখা দিয়েছে এবং বিয়ার সেই জলাভাবকে পূরণ করতে সাহায্য করছে। আধঘণ্টার মধ্যেই আবার চেপে বসলাম নিজের সাইকেলে। পালকিতে চড়বার অসম্মান থেকে দ্বিতীয়বার রেহাই পাওয়া গেল। রাত্রিবাসের জন্য এগিয়ে চললাম 'নিরাপদ' অঞ্চলের দিকে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, বিয়ার পান করে এত তৃপ্তি এর আগে আর কখনো পাই নি। কিন্তু ওই বিয়ারের বোতলটি সেখানে এল কি করে? তাও আবার শীতল বিয়ার? মুক্তিফ্রন্ট সংগঠনের একাধিক রহস্যময় ব্যাপারের মতো এটাও ছিল রহস্যময়, যা কোনো দিন সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয় নি।

পরে, এই ভ্রমণের সর্বপেক্ষা বিপদসংকুল অংশ অতিক্রম করে একটা নিরাপদ মূলঘাঁটিতে পৌঁছে, বিদায়ের পূর্বে আমার নিরাপত্তার জন্য সরাসরি দায়ী দলের অধিনায়ক আমার মতামত জানতে

চাইলেন। জবাবে বললাম, চারিপাশের এতগুলো শত্রু ঘাঁটি পার করে তিনি যে আমাকে একেবারে সায়গনের দ্বারদেশে নিয়ে গিয়ে তারপর সেখান থেকে আবার ফেরত নিয়ে এসেছেন, এবং আমি যে নিরাপদ এবং সুস্থ রয়েছি, এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে সমালোচনার কিছুই নেই। তিনি উত্তর দিলেন, "আঃ, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আপনার উচিত আমার তীব্র সমালোচনা করা। একটা ভয়াবহ মুহূর্তের কথা এখন আমি আপনাকে বলতে পারি। সেই দিনটির কথা আপনার মনে আছে, যখন…?"

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদের দলটিকে যে দিন সন্ধ্যার সময় সেই অসাধারণ দক্ষ সায়গন জিয়াদিন অঞ্চলের সামরিক কমাণ্ডারের হাতে অর্পণ করা হয়, ঘটনাটি ঘটেছিল সেই দিন। অপরাহ্নে দলপতিকে দেখেছিলাম ভয়ানক উত্তেজিত অবস্থায়। অথচ কদাচিত তাঁকে সেই অবস্থায় দেখেছি। মনে হয়েছিল, কোনো কারণে তিনি সেই দিনকার পথপ্রদর্শকের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

তিনি বলে চললেন, "ব্যাপারটা সে সময় আপনাকে বলি নি। কিন্তু আমাদের গন্তব্যপথের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক এলাকায় পথ-প্রদর্শক সেদিন ভুল পথ ধরেছিল। জায়গাটা ছিল সায়গন থেকে দশ মাইলেরও কম দূরে। ভুল পথটি আমাদের নিয়ে গিয়েছিল একটি শত্রু-ঘাঁটির কয়েক শ' গজের মধ্যে। তাও আবার এমন একটি অঞ্চলে, যেখানে ছেয়ে রয়েছে শত্রুর চর। মনে পড়ে কি, ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরা তিনজন সৈনিককে রাস্তার ধারের ছোট্ট একটা দোকান থেকে কোকাকোলা কিনতে দেখে আপনি জিজ্ঞাসা করে ছিলেন ওরা কে?"

মনে পড়ে গেল। উত্তর শুনে সেদিন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ফ্রন্ট-সৈনিকদের ওই ধরনের সবুজ ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরতে কখনো দেখি নি। অথচ জবাব পেয়েছিলাম, ফ্রন্ট এবং সায়গনে সৈনিকদের পোষাকে পার্থক্য নির্ণয় করা নাকি কঠিন।

দল-নেতা আবার বললেন, "হ্যাঁ, সেই তিনজন ছিল শত্রু পক্ষের ছত্রী সৈনিক। মনে হয়েছিল আমরা আপনাকে সরাসরি শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছি। আশ্চর্যের বিষয়, তারা আমাদের দেখতে পায় নি, এবং কেউ আমাদের জিজ্ঞাসাবাদও করে নি। কোনো গতিকে সেদিন আবাব সঠিক পথে চলে যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমাদের সবার পক্ষেই সেটা ছিল অতি সংকটজনক মুহূর্ত। সেই রাতেই আমাদের দলেব একটা সভা হয় এবং সেই সভায় আমরা নিজেদের তীব্র সমালোচনা করি, এবং এরকমটা যাতে আবার না ঘটে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করি। আরো স্থির হয় যে, আপনাকে নিবাপদ স্থানে প্রত্যর্পণ না করা অবধি ব্যাপারটা জানানো হবে না।"

এই পরিচ্ছেদের শুরুতে আমি ফ্রন্ট সংগঠনের যে প্রশংসা করেছি, উপরের ঘটনাটি যদি তার বিরুদ্ধে বলে মনে হয়, তবে সেটাকে এমন একটি ব্যতিক্রম বলে ধবে নিতে হবে যা নিয়মকেই প্রমাণিত করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শত্রুর সংগে সম্বন্ধ। মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে

ভ্রমণের পরবর্তী পর্যায়ে রসিকতা করে প্রায়ই জানতে চেয়েছি, আমি 'মুক্ত অঞ্চলে' রয়েছি, না 'নিয়ন্ত্রিত এলাকায়'। আশেপাশে সৈন্য দেখলেই জিজ্ঞাসা করতাম ওরা 'ওদের', না 'তোমাদের' সৈন্য। বস্তুতঃ এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার একটা সাধারণ রসিকতা। অনেকবার আমাকে এমন কুটিরে বাস করতে হয়েছে, যেটা হল 'মুক্ত'। পক্ষান্তরে পার্শ্ববর্তী নদী অথবা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কটির অপর পারে অবস্থিত সেই গ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত অন্য একটি কুটির হল 'শত্রু নিয়ন্ত্রিত।' এই প্রসঙ্গে একবার স্থানীয় এক গ্রাম কমিটির মোড়লকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শত্রু কখনো খোঁজ-খবর নেবার জন্য আসে কি না।

উদার গ্রাম্য হাসির সংগে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, আসে। ওদের টহলদারী দলকে এই অঞ্চলে আমরা মাঝে মাঝে আসতে দিই। জেলার কর্তাও আসতে পারেন ; কারণ সরকারীভাবে এটাকে তারা 'নিজেদের' কুটির বলে ভাণ করে। আমরাও সেই রকম ভাণ করি। আসলে তারা জানে এটা হল 'আমাদের'। কখনো কখনো গ্রামের কিছু মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওরা শাসায় : 'আমরা জানি এখানে তোমরা সবাই ভিয়েতকং। সাবধান করে দিচ্ছি ; নইলে একদিন আচ্ছা করে শায়েস্তা করে দেবো।' জবাবে লোকগুলো অনুযোগ করে : "আপনারা আমাদের ত্যাগ করলে আমরা কি করতে পারি ? ভিয়েতকংরা যদি আসে তা'হলেই বা কি করতে পারি ? আপনারা আবার এখানে ফিরে এসে একটি গ্যারিসন বসান না কেন ?" একথা শুনে জেলা অধিকর্তার পক্ষে কেবলমাত্র রেগে লাল

হওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার থাকে না। ভাল করেই তাঁর জানা আছে যে, আবার একটা গ্যারিসন এখানে বসালে, যে লোক-গুলোর সংগে তিনি কথা বলছেন, তারাই ক্রমাগত প্রচারকার্য চালিয়ে গ্যারিসনের সৈনিকদের নিজেদের দলে ভেড়াবে, অথবা এক রাতে ঘাঁটিটাকেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু খুব কঠোর হতেও সাহস হয় না। কারণ পূর্ববর্তী জেলা অধিকর্তার কপালে কি ঘটেছিল, তা সংগে সংগেই মনে পড়ে যায় তাঁর। লোকটি ছিল ভয়ানক অত্যাচারী। বহু স্বদেশপ্রেমিককে সে হত্যা করে। অবশেষে একদিন নিজেই সে খতম হয়ে যায়। বর্তমান জেলা অধিকর্তা ভাল করেই জানেন যে, তাঁর সৈনিকেরা যদি গ্রামবাসীদের সংগে খারাপ ব্যবহার করতে আরম্ভ করে, তা'হলে তাদের অধিকাংশই আর প্রাণ নিয়ে এই গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এবং সে ক্ষেত্রেও কিছুই করতে পারবেন না তিনি।"

সুতরাং, 'শত্রুর সংগে সংবদ্ধ হয়ে বাস করা' কথাটি যে আমি প্রায়ই শুনতাম, সেটা শুধুমাত্র কথার কথা নয়। বরং আমিও তাতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সায়গন এলাকার চারিপাশের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল তো ছিলই, কিন্তু মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলের তুলনায় তা কিছুই নয়। ব্যাপারটা আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়েছিল সায়গনের আইনজীবী 'ন্গুয়েন হু থো'র সংগে কথাবার্তা বলে। তিনি আবার হলেন জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট। পাশ্চাত্য কাগজগুলো তাঁকে ১নং ভিয়েতকং,-রূপে চিহ্নিত করেছিল। এই মধুর স্বভাবের ব্যক্তিটির অধ্যাপকজনোচিত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সংগে মিশেছে শহুরে উদার বুদ্ধিবৃত্তি। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এক গভীর জংগলের মধ্যে। বেশ কয়েক মাস ধরে অশ্বপৃষ্ঠে, পদব্রজে এবং সামপানে কষ্টকর ভ্রমণের পর সেখানে পৌঁচেছিলাম। সাক্ষাৎ হলে দেখা গেল তাঁর পরণে রয়েছে ইওরোপীয় আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত সায়গনের কোনো গৃহস্বামীর পোশাক—শিল্কের জামা এবং শিল্কের ঢিলে পাজামা, আর আমার পরণে রয়েছে ভিয়েতকংদের

কালো সুতীর পোশাক এবং পায়ে রবার টায়ারের চপ্পল।

সংগে সংগে আমার মানসনেত্রে ভেসে উঠল আরেকটি ঘটনা। ঠিক প্রায় দশ বছর পূর্বের। সেদিনও আরেকজন ভিয়েতনামী নেতা জংগলের ছায়া থেকে এই ভাবেই দু-হাত বাড়িয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সরু কাঁধের উপর ঝুলছিল একটা হাতা-বিহীন কোট; পরনে ছিল উত্তর ভিয়েতনামী কৃষকদের মতো লাল সুতীর পোশাক; শুষ্ক, কঠোর মুখ থেকে এলোমেলোভাবে নেমে এসেছিল শুষ্ক খড়ের আঁটির মতো তাঁর বিখ্যাত এক গুচ্ছ শ্মশ্রু। তিনি ছিলেন হো চি মিন। স্থানটি ছিল উত্তর ভিয়েতনামের তে-মুয়েন্ জংগল; এবং সময় ছিল, দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধের প্রারম্ভ সেই সাক্ষাতকারের ছয় মাস পরে, বিজয়ী ভিয়েতনামী গণ-ফৌজের প্রথম দলটির সংগে আমি হ্যানয়ে প্রবেশ কবি। মনে মনে স্থির করলাম, বর্তমান সাক্ষাৎকারের ছয় মাস পরে বিজয়ী মুক্তি-ফৌজের প্রথম দলের সংগে আমি সায়গনে প্রবেশ করব কি না, সে কথা প্রেসিডেণ্ট মুয়েন হু থো-কে কোন মতেই জিজ্ঞাসা করব না।

মেকং ব-দ্বীপ সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের উত্তরে মুয়েন হু থো দেখালেন, সামরিক এবং প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে কি ভাবে মুক্তিফ্রণ্ট মেকং ব দ্বীপ এলাকাকে ১নং এবং ২নং এই দুটি অঞ্চলে ভাগ করেছে। এই ভাগাভাগিটি সায়গনের 'ফোর্থ ট্যাকটিকাল জোন' অর্থাৎ চতুর্থ সামরিক ব্যূহ এলাকার সংগে মোটামুটিভাবে মিলে যায়। মেকং নদীর প্রধান জলধারাকে বিভাজক রেখা ধরে, তার পশ্চিম অংশটি হল ১নং অঞ্চল, এবং পূর্ব অংশটি হল ২নং। ১নং অঞ্চলে রয়েছে ৩২০০ কুঠির নিয়ে গঠিত ৩৬৮টি গ্রাম; তার মধ্যে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের শেষনাগাদ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা হয়েছিল মাত্র ৩৩টিকে। কিন্তু ওই ৩২০০ কুটিরের মধ্যে ২৫০০টিই রয়েছে ফ্রণ্টের দখলে। ১নং অঞ্চলে মোট ৩,১০০,০০০ জন সংখ্যার ভিতরে ২,০০০,০০০ লোকই বাস করে মুক্ত কুঠিরগুলোতে। মুয়েন হু থো বললেন, "মুক্ত গ্রামগুলো থেকে আমরা কর আদায় এবং আমাদের

প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য সৈনিক জোগাড়ও করতে পারি। শত্রুর সাধ্য নেই আমাদের জনগণের গায়ে হাত দেয়। তাদের নামমাত্র অধিকারে যে ৭০০ কুটির রয়েছে, সেগুলো থেকে কর আদায় এবং সেনাবাহিনীর জন্য লোক জোগাড় করতে ক্রমশই ওদের অধিকতর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।"

একটু থেমে আবার বললেন, "২নং অঞ্চলের অবস্থা'ও একই ধরনের। সেখানকার মোট ৪৯৪টি গ্রামের মধ্যে একশ'র কিছু বেশী গ্রাম সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; ৯১টি হল সায়গনের নিয়ন্ত্রণে, এবং বাকী-গুলো 'অর্ধেক থেকে তুয়ের-তিন ভাগ মুক্ত।' মোট ২,৭০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১,৮০০,০০০ বাস করে মুক্ত কুটিরগুলোতে। আরো ৪০০,০০০ বাস করে শহরতলীর কেন্দ্রগুলোতে ও প্রাদেশিক রাজধানী ও জেলা সদরে, এবং অবশিষ্ট ৫০০,০০০ বাস করে 'গেরিলা এলাকায়,' যা 'অন্তুতপক্ষে রাতের বেলায়' নিয়ন্ত্রণ করে মুক্তি ফ্রন্ট।"

এই ধরনের পরিস্থিতি একমাত্র সম্ভব 'বিশেষ যুদ্ধে'র অবস্থাতেই। পুরনো ঔপনিবেশিক ধরনের যুদ্ধের থেকে এ যুদ্ধকে আলাদা করে দেখাতেই হবে। কারণ এই যুদ্ধকে চালাতে হচ্ছে 'জাতীয়' সরকার ও সেনাবাহিনীর অধীনে। 'আপ-বাক'-এর চূড়ান্ত লড়াইয়ে আপ-বাক গ্রামের অধিবাসীরা স্থানীয় প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে দল বেঁধে গিয়ে 'তাদেরই' সরকার তাদের গ্রাম আক্রমণ করেছে বলে প্রতিবাদ জানাতে পেরেছিল। এই ঘটনাই হল আমেরিকার উদ্ভাবিত 'বিশেষ যুদ্ধে'র 'অপর দিকে'র ছবি।

ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামের* প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে এভাবে দলবেঁধে গিয়ে প্রতিবাদ জানানো ছিল অসম্ভব। কারণ, তিনি ছিলেন ফরাসী; উভয় পক্ষই নৈতিকভাবে উভয় পক্ষকে শত্রু বলে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং ব্যাপারটা ছিল

---

* ফরাসীদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা' ১৯৫৪ সালের দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজয়ের সংগে সংগেই শেষ হয়।

পরিকার। কিন্তু আপ-বাকের গ্রামবাসীরা গভর্নরের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে পেরেছিল। তারা বলতে পেরেছিল: "আপনি হলেন সরকারের প্রতিভূ। আমাদের রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। কেন আপনি আমাদের গ্রাম ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে কামান আর বোমারু বিমান পাঠিয়েছেন? ধ্বংস প্রাপ্ত প্রতিটি বাড়ি এবং গাছের জন্য আমরা ক্ষতিপূরণ চাই।" আপ-বাক গ্রামবাসীদের এই প্রতিবাদের ফলাফল আমার জানা নেই। কিন্তু এটা জানি যে, বহু ক্ষেত্রে মুক্ত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা 'শত্রু নির্মূল অভিযান' এবং বিমান হানায় ক্ষয়-ক্ষতির বাবদ ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছেড়েছে। এবং সেই মিছিলগুলোতে প্রায়শই 'মুক্ত' এবং 'নিয়ন্ত্রিত' গ্রামের অধিবাসীরা উভয়েই অংশ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকারী কর্তাদের পক্ষে তাদের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। হুয়েন হু থো আবার বললেন, "সায়গন শাসনতন্ত্রকে জাতীয় সরকার বলে এই যে মিথ্যা প্রচার, তা সামরিক সংগ্রামের সংগে রাজনৈতিক সংগ্রামকে সমন্বিত করবার অবাধ সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।"

সামরিক মানচিত্রগুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, মুক্তি ফ্রন্ট ইচ্ছা করলে সায়গনের দখলে অবস্থিত বহু সড়কই বিনষ্ট করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, বহু প্রাদেশিক ও জেলা সদর, বিশেষ করে যেগুলো সমৃদ্ধ মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত, সেগুলোকেও তারা দখল করে নিতে পারে। কেন যে তারা এটা করে নি, তা ভেবে প্রথমে আমারও আশ্চর্য লাগত। কিন্তু পরে বুঝলাম, ওই সড়কগুলোই হল ফ্রন্টের নিজেদেরও সরবরাহের পথ; বিশেষ করে ফ্রন্ট নিয়ন্ত্রিত গ্রামের অধিবাসীদের জন্য। এবং শহরাঞ্চলের কেন্দ্রগুলোই হ'ল ফ্রন্টের দখলে অবস্থিত চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামাঞ্চলের বণ্টন কেন্দ্র। সুতরাং পথগুলো বিনষ্ট করলে এবং শহরগুলো দখল করে নিলে, সরবরাহ ব্যবস্থা হয়ে পড়বে অচল। সায়গন সেটা জানে। কিন্তু করণীয় কি? সড়ক এবং শহরগুলো পরিত্যাগ করা? সে ক্ষেত্রে বিস্তৃত এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হয়। এবং সেটা

হবে বিরাট সম্মানহানিকর ব্যাপার। মেকং ব-দ্বীপ এলাকার ক্ষেত্রে এর আরেকটি অর্থ হবে। সায়গন তথা দেশের বাকী অংশের বেশির ভাগ এলাকা যে চাল খেয়ে বাঁচছে, সেই চালের সরবরাহই পরিত্যাগ করা। এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ হলেই, গ্রামাঞ্চলের ক্রেতাদের কাছ থেকে উঠবে প্রতিবাদের ঝড়। তারা দাবী করবে, সরকার তাদের ‘পরিত্যাগ’ করলেও, তারা সবাই হল সরকারের অনুগত নাগরিক। বাজার নষ্ট হবার কারণে প্রতিবাদ উঠবে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পণ্য উৎপাদনকারীদের তরফ থেকেও। পুরাতন সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনে এই ধরনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা যেত। কিন্তু ‘বিশেষ যুদ্ধে’র অবস্থায় সে প্রতিবাদের যথোচিত গুরুত্ব দিতেই হবে।

সায়গন কর্তৃপক্ষ যদি ভিয়েতকংদের সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে প্রধাণতঃ ভিয়েতকং অঞ্চল থেকে সরে আসেন, তা'হলে তার অর্থ হবে গ্রামাঞ্চল থেকে প্রকৃতপক্ষে একেবারেই চলে আসা। সে ক্ষেত্রে সায়গন সরকারকে কেন্দ্রীভূত হতে হবে সামান্য গুটিকয়েক বড় বড় শহরে; ও সরকার যে সামান্যতমও ‘জাতীয়ত্বে’র প্রতিনিধিত্ব করছে, সে ভাণও তাকে ত্যাগ করতে হবে এবং সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে জনগণের বিরুদ্ধে। মার্কিন সরকারের পক্ষেও তা'হলে এখানে [illegible] গ্রহণের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের প্রচেষ্টা হবে আরো কঠিন। সুতরাং, কা-মাও উপদ্বীপে অবস্থিত কয়েক শত ঘাঁটি ছেড়ে চলে আসা সত্ত্বেও, মার্কিন কমাণ্ডকে অগত্যা বাধ্য হয়ে ‘স্বচ্ছন্দভাবে বসবাস করা’র অবস্থাটিকে সহ্য করতেই হচ্ছে। কোনো নদী অথবা সড়কের ‘অপর পারে’ অবস্থিত কোনো গ্রামকে পুনর্দখল করবার প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে ‘নিজেদের দিকে’ অবস্থিত আরো অধিক সংখ্যক গ্রাম হারানো। সুতরাং সায়গনের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রামের সংখ্যাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মিথ্যাপ্রচার করতে হচ্ছে। এবং এটি করতে হচ্ছে সম্মান রক্ষার জন্য।

শহরের বিক্ষোভ মিছিল

হুয়েন হু থো বর্ণিত 'রাজনৈতিক সংগ্রামের সংগে সামরিক সংগ্রামের সমন্বয় সাধন'-এর অন্যতম রূপ হল, শত্রুর সামরিক তৎপরতাকে ব্যাহত করা অথবা ফ্রন্টের সামরিক তৎপরতাকে সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে গণ-বিক্ষোভ প্রদর্শন। প্রথম দিকের স্বতঃস্ফূর্ত একটি নজীর থেকেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তে-নিন প্রদেশের ত্রাণ-বান জেলার গ্রামবাসীরা একদিন শুনল, 'শত্রু-নির্মূল' তৎপরতার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী তাদের গ্রামের দিকে আসছে। সংগে সংগে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বহনযোগ্য মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আগে আগে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তাদের শুয়োর আর মোষের পাল। এইভাবে ৮০০ মোষ নিয়ে তারা ঢুকে পড়ল জেলা কেন্দ্রে, এবং সম্পূর্ণ শহরটিকে অধিকার করে বসল। যান-বাহন চলাচল হয়ে গেল বন্ধ। তারপর জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে তারা বলল: "শুনলাম আমাদের গ্রাম ধ্বংস করবার জন্য সৈন্যরা আসছে। গ্রামে থাকতে তাই আমাদের সাহস হল না। আপনি হলেন সরকার, আপনিই আমাদের রক্ষা করবেন। ঘুমোবার জন্য আমাদের একটা জায়গা ঠিক করে দিন। শিশুদের জন্য আমাদের চাল এবং খাদ্য চাই।" যিনি জেলা শাসক, তিনিই আবার জেলার সামরিক কমাণ্ডারের কাজও করেন। সুতরাং সামরিক তৎপরতা বন্ধ করতে তিনি বাধ্য হলেন। পরবর্তী কয়েকটি দিন ধরে শুয়োর ও মোষের মল-মূত্র থেকে শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাতে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হল।

এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। আরো বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুরূপ কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল অন্যান্য স্থানে।

সায়গনের দক্ষিণ-পশ্চিমে হল বেন ত্রে প্রদেশ। সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে সেখানকার নারীদের; এবং সে খ্যাতি অহেতুক নয়। সেই বেন ত্রে প্রদেশের সুন্দরী তরুণী লে থি থিয়েন। পিচফলের মতো

তাঁর গায়ের রং ; হাসলে গালে টোল পড়ে। বিক্ষোভ মিছিলের সুযোগ্য সংগঠক হিসাবে সারা ব-দ্বীপ অঞ্চলে তিনি সুপরিচিতা। আমার সংগে সাক্ষাৎ হতে বললেন :

"ত্রান বান'এর সাফল্যের পর, বেন-ত্রে প্রদেশে আমরাও স্থির করলাম, সবগুলো জেলা সদর, এমন কি প্রাদেশিক রাজধানীরও সমস্ত রাস্তা-ঘাট ও স্কোয়ারগুলোর আয়তনের নিখুঁত হিসাব জেনে নিতে হবে। এতে অবশ্য সময় লাগল। কিন্তু পুরো জায়গাটা ভরে ফেলতে হলে কত লোকের প্রয়োজন, তা'জানা খুবই দরকার। তবেই গ্রামাঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক যোগাড় করা যেতে পারে। এ কাজে সাবধানতার প্রয়োজনও ছিল সর্বাধিক। কৌশলটি হল, যে শহরটিকে আন্দোলনের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করা হবে, বিকেল পাঁচটার মধ্যেই বিভিন্ন দিক থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক ঢুকে পড়বে সেই শহরে। কোন্ কোন্ রাস্তা এবং স্কোয়ার কোন্ কোন্ দল দখল করবে তা' জানা থাকবে প্রতিটি দল-নেতার। ব্যবস্থাটা হবে এমন যে, আমাদের 'জনসমুদ্র' দ্বারা শহরের প্রতি বর্গগজ স্থান ভরে যাবে, এবং ভোরের সংগে সংগে শহরটি হয়ে পড়বে অচল। সেনাবাহিনী এবং পুলিশের পক্ষে চলাচল করা সম্ভব হবে না। ফলে আমাদের দমন করাও হবে অসম্ভব। শুধু তাই নয়, একমাত্র আমরা ছাড়া, অন্য কোন কিছুই চলাচল করতে পারবে না। এই পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের এবং পার্শ্ববর্তী মাঈ থো প্রদেশের ২০,০০০ লোকের একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছিলাম। তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল স্ত্রীলোক। কর্তৃপক্ষ কোনো রকমে যদি সেনাবাহিনী আনতে সমর্থ হয় এবং সৈনিকেরা গুলি চালাবার হুমকি দেয়, তা'হলে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের উচ্চ রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন বিশেষ মুখপাত্রও স্থির করা ছিল। তাঁদের সাধারণতঃ নেওয়া হত, প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় সংগঠিত 'সৈনিকদের জননী' নামক সংগঠন থেকে উভয়পক্ষে কথাবার্তা হত সাধারণতঃ এই রকম :

"ছেলেরা, তোমরা সবাই আমার ছেলের মত। আমার দুটি ছেলেও তোমাদের সেনাবাহিনীতে রয়েছে।" বলতে বলতেই সেই মুখপাত্র দিয়েমী সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত দু'জন সৈনিকের ছবি বার করে মেলে ধরবেন তাদের সামনে, "এরা ঠিক তোমাদের মতোই দেখতে। তোমরা আমাদের গুলি করলে, তা'হবে তোমাদের নিজের মাকেই গুলি করার মতো। আমার পিছনের ওই যুবতীদের তোমরা গুলি করলে, তা হবে তোমাদের নিজেদের স্ত্রীদেরই গুলি করার সামিল। ওদের স্বামীরাও তোমাদের সেনা বাহিনীতে রয়েছে। আমরা এখানে এসেছি কেন জানো? এসেছি নর-হত্যা বন্ধ করতে। হয়তো এই মুহূর্তে যে গ্রামের উপর বোমা বর্ষিত হচ্ছে, সেখানে রয়েছে তোমারই মা। অথবা তোমারই স্ত্রীকে হয়ত ধর্ষণ কবছে দিয়েমী সৈন্যেরা। এ সব কথা বিশ্বাস না হলে, এসো আমাদের গ্রামের দু'জন সৈনিকের স্ত্রীদের সংগে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। কয়েক সপ্তাহ আগে দিয়েমী সৈন্যেরা এদের ধর্ষণ করেছিল।"

বেন ত্রে প্রদেশের রাজধানীতে এই ধরনের একটি বিক্ষোভ মিছিলের কথা বললেন লি থি থিয়েন! সেটি ছিল শস্যক্ষেত এবং গৃহপালিত পশুগুলোর উপরে বিমান থেকে রাসায়নিক বিষ ছড়ানোর প্রতিবাদে। "গ্রামবাসীরা সংগে নিয়ে গিয়েছিল রাসায়নিক বিষের প্রভাবে শুকিয়ে যাওয়া ফলগাছের ডাল, কলাগাছের পাতা, মৃত শুয়োর, হাঁস এবং মুরগি—ধ্বংসের প্রকৃত একটি প্রদর্শনী। সেগুলোকে তারা সৈনিকদের সামনে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে চীৎকার করে বলতে লাগল:

'এই দেখো। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমরা এখানে এসেছি। আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে অথবা হাংগামা বাধাতে আমরা আসিনি। জনগণের যারা শত্রু, যারা তোমাদের নিজেদের মা এবং বধূদের হত্যা করেছে, তাদেরই জন্য তুলে রাখো তোমাদের ওই বুলেট। অবশ্য আমাদের গুলি করে যদি কোন গৌরব বোধ কর তাহলে গুলি করতে পারো। কিন্তু

আমাদের গুলি করলে, নিজেদের মা এবং বধূকেই তোমরা অসম্মান করবে।'

"যারা এই সমস্ত কথাবার্তা চালায়," লি থি থিয়েন বলে চললেন, এবং আমার ধারণা তিনি নিজেই একাধিকবার এধরনের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেছেন, "তারা হল প্রকৃত 'শান্তি শিল্পবিৎ'। তারা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব পরিস্থিতির ভিতর থেকেও শান্তি ছিনিয়ে নিয়ে আসে। কারণ, বিক্ষোভ মিছিল দমন করতে সর্বাধিক শক্তি প্রয়োগের ঢালাও হুকুম দেওয়া আছে কর্তৃপক্ষের। যে একমাত্র উপায়ে পাইকারি হত্যাকাণ্ড এড়ান হয়, তা'হল সৈনিকদের সংগে কথাবার্তা বলে তাদের অস্ত্র ব্যবহার করা থেকে নিবৃত্ত করা। মুখপাত্রস্বরূপ এই সমস্ত মহিলাদের রয়েছে দৃঢ় সাহস, এবং কর্তব্য নির্ণয়ের স্বাভাবিক ক্ষমতা। তারা অধিকাংশই হল কৃষকের ঘরের বধূ অথবা মাতা, এবং সৈন্যেরা যে ভাষায় কথা বলে, তাদের ভাষাও হল তাই। এর মধ্যে কোন রকম ছল-চাতুরি নেই। কথাগুলো বেরিয়ে আসে তাদের হৃদয়ের অন্তস্থল তথা দেশের মাটি থেকে। একজন হয়তো বলবে, 'আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তা'হলে এসে দেখে যাও। আমাকে পরেও গুলি করতে পারবে। সেটি খুব জরুরী কিছু নয়। কিন্তু আগে নিজের চোখে দেখো, মার্কিন-দিয়েমী সৈন্যেরা কি করেছে। হয়তো তোমার ইউনিট এই ধরনের কাজ ক[illegible] না। কিন্তু আগে দেখো অন্যেরা কি করেছে। তারপর ইচ্ছা হয় আমাকে গুলি করো'।"

সৈনিকেরা সবাই কৃষক। অনেকেরই মা অথবা স্ত্রী হয়তো সেই ভীড়ের ভিতরে রয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত কথাবার্তার প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে তাদের মনোবলের ওপর। জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর যখন মার্কিন কমাণ্ডের অধীনে কেবলমাত্র স্থানীয় সৈন্য ব্যবহারের নীতি প্রবর্তন করেছিলেন, তখন বোধ হয় 'বিশেষ যুদ্ধে'র এই দিকটি সম্বন্ধে একেবারেই চিন্তা করেন নি। তাই যুদ্ধের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে শুরু করতেই এই 'স্থানীয় সৈনিকে'রা হয়ে উঠল অতীব

বিরক্তির পাত্র ; এবং ফ্রন্টের 'গুচ্ছকেশী বাহিনী' পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল সেই পরিস্থিতির। দক্ষিণের মেয়েরা গুছি করে চুল বাঁধার রীতি পছন্দ করে বলে এদের 'গুচ্ছকেশী বাহিনী' বলা হত। শোনা যায়, সায়গন অফিসাররা প্রকৃত ভিয়েতকংদের কার্যকলাপের চাইতে, এই 'গুচ্ছকেশী বাহিনী' ও তাদের কার্যকলাপকে অনেক বেশী ভয় করত। বস্তুতঃ, সেনাদল ছেড়ে পলায়নের ঘটনা সায়গনের মাসিক ক্ষয়-ক্ষতির অনুপাতকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং এর একটা খুব বড় কারণ হল সুদক্ষ মহিলা প্রচারকদের কার্যকলাপ।

সব বিক্ষোভ মিছিলই যে উপরে বর্ণিত ঘটনাটির মতো শান্তিপূর্ণ হত তা নয়। প্রথম দিকের বিক্ষোভগুলোতে মাঝে মাঝে প্রচুর রক্তপাতও হয়েছে। ফ্রন্টের সর্বাত্মক সামরিক তৎপরতা তখনো শুরু হয় নি এবং দিয়েমীরাও প্রয়োজনমতো প্রচুর সামরিক শক্তি একত্রিত করতে পারত সে সময়। এই রকম একটি ঘটনার কথা সারা ভিয়েতনামে—উত্তরে এবং দক্ষিণে—সবাই জানে। ঘটনাটি ঘটেছিল মাঙ্গ থো প্রদেশে, ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে। প্রাদেশিক রাজধানীতে হাজারে হাজারে স্ত্রীলোকেরা মার্চ করে গিয়েছিল চূড়ান্ত বর্বর একটি 'শত্রু নির্মূল' অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। সেই অভিযানে ছ'টি গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল দিয়েমী সৈন্যেরা। শহরের একটি স্থানের নাম ছিল 'বার্ডস ক্রস রোড'। জায়গাটা ছিল একটা পাঁচ মাথার মোড়; দেখতে ঠিক একটা পাখির পায়ের ছাপের মতো। বিক্ষোভকারীরা সেখানে উপস্থিত হতেই তাদের বাধা দিল দিয়েমী সেনা বাহিনীর বিরাট একটি দল। প্রথম পতাকাটি বহন করছিল একজন গর্ভবতী তরুণী ; এবং প্রথম গুলি গিয়ে লাগল তারই দেহে। সংগে সংগে সে চীৎকার করে উঠল, "স্বদেশবাসীরা, এগিয়ে যাও।" পরক্ষণেই পথের উপর লুটিয়ে পড়ল তার মৃতদেহ। দ্বিতীয় একজন তরুণী আঁকড়ে ধরল পতাকাটিকে। তাকেও গুলি করে মারা হ'ল। তারপর তৃতীয়জন। প্রত্যেকেরই বয়স কুড়ি বছরের নিচে। অগ্রসরমাণ মহিলারা

কেবলমাত্র থামল মৃতদেহগুলোকে তুলে নেবার জন্য। তারপর মিছিলের অগ্রভাগে সেই মৃতদেহগুলো নিয়ে তারা অগ্রসর হল। চতুর্থ একজন তরুণী এসে পতাকটি ধরেছিল। এই সাহস এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার সামনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল সৈন্যরা। তারপর ক্রোধোন্মত্ত অগ্রসরমাণ জনতাকে দেখে অভিভূত হয়ে পিছু হটল। মিছিল এগিয়ে চলল প্রাদেশিক গভর্নরের অফিস পর্যন্ত। সেখানে তারা নিহত তরুণী তিনজনের মৃতদেহ প্রদর্শণ করে, ভস্মীভূত গ্রামগুলো এবং নিহত তিন শহীদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করল। দেখতে দেখতে তাদের ঘিরে জমায়েত হয়ে গেল শহরবাসীদের বিরাট একটি জনতা। তারা সমর্থন জানাল বিক্ষোভকারীদের। গভর্নর অবশেষে তাদের দাবি মেনে নিলেন।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি-সংগ্রামে 'বার্ডস্ ক্রেস রোডস্'-এর ঘটনা একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, এবং নারী দেশপ্রেমিকদের অন্যান্য অসংখ্য বীরত্বের কাহিনীগুলোকে নিশ্চিতভাবেই উদ্বুদ্ধ করেছে।

অসাধারণ বিক্ষোভ মিছিলগুলোর মধ্যে একটি হয়েছিল সায়গন শহরেই; ১৯৬০ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে। একদিন সকাল সাতটার সময় দিয়েম তাঁর প্রাসাদের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরেই দেখলেন, শতছিন্ন পোশাক পরিহিত হাজার হাজার গেঁয়ো মানুষের ভীড়ে নিচের স্কোয়ারটি ভরে গেছে। শান বাঁধানোর জন্য রাখা প্রস্তর ফলকগুলোকে দখল করে বসে লোকগুলো খাচ্ছে নিকৃষ্টতম খাবার। বাস এবং নৌকা যোগে শহরের চারিদিক থেকে তাদের ওখানে আনা হয়েছিল; এবং নিখুঁত সংগঠনের ফলে একই সময়ে ৭০ হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছিল প্রাসাদের স্কোয়ারে। অনতিবিলম্বেই দেখা গেল গ্রাম পোড়ানো এবং নির্বিচারে গ্রামবাসী তথা গৃহপালিত পশুহত্যা বন্ধের দাবি সম্বলিত হাজার হাজার মুখর পতাকা উড়ছে চারিদিকে।

অফিস যাত্রী, ছাত্র সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল তাদের সংগে কথা বলবার জন্য। সীমাহীন অত্যাচারের বীভৎস কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই। দোকানীরা তাদের এনে দিল চা আর খাবার। পুলিশের

সমস্ত আইন অমান্য করে সায়গন বাসিন্দাদের বিশাল এক জনতা তাদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্রামবাসীরা দাবি করল স্বয়ং দিয়েমকে তাদের প্রতিনিধি দলের সংগে দেখা করতে হবে। সে দাবি নাকচ করে দেওয়া হল। উচ্চপদস্থ একজন পুলিশ অফিসার এসে তাদের বক্তব্য শুনতে চাইলেন। গ্রামবাসীরা রাজী হল না। তারা দাবি করল অন্ততঃপক্ষে একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীকে আসতে হবে। তাদের তাড়াবার জন্য দ্রুত সেনাবাহিনী পাঠানো হল সেখানে। কিন্তু গ্রামবাসী তথা সায়গন বাসিন্দাদের আপত্তিতে তারা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে মানুষের ভীড় প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী এলেন এবং গ্রামবাসীরা বাড়ি ফিরে যাবে এই শর্তে তাদের লিখিত দরখাস্ত ও মৌখিক প্রতিবাদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী না সরানো পর্যন্ত সেই জনতা নড়তে রাজি নয়। অবশেষে সেনাবাহিনী সরাবার পর তারা স্থান ত্যাগ করতে সম্মত হল। গ্রামবাসী এবং শহরবাসীদের মধ্যে এই ভয়ংকর ভ্রাতৃত্ব-বোধকে যতশীঘ্র সম্ভব শেষ করবার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হল পুলিশ। ট্রাকে করে গ্রামবাসীদের আপন আপন গ্রামে পৌঁছে দিতে চাইল। গ্রামবাসীরা প্রত্যাখ্যাণ করল সেই প্রস্তাব। তারা পায়ে হেঁটেই যাবে। তারপর তারা শহর এবং গ্রামের পথে পথে অলসভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অনেকে তাদের চা খেতে দিল। চা খেতে খেতে তারা নিজেদের গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল। তারপর তারা ফিরে গেল নিজের নিজের গ্রামে। সেখানে চা এবং মিষ্টান্ন নিয়ে অপেক্ষা করছিল অভ্যর্থনা সমিতির লোকেরা। শহরের মানুষ তাদের কি ভাবে গ্রহণ করেছে সে কথা শুনতে ভেঙে পড়ল সারা গ্রামের লোক।

সায়গন এবং অন্যান্য জেলা শহরে এমন বহু বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে প্রথম দিনে মিছিলকারীরা বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। জংগলে পালিয়ে

যাবার প্রশ্ন ওঠে নি। তাই তারা রাত কাটিয়েছে নির্জন গলি অথবা বাজারের ভিতরে ; এবং পরদিন ভোরেই গিয়ে আবার জড়ো হয়েছে শহরের প্রধান স্কোয়ারে। এবং নিদেন পক্ষে কোনো রকম নৈতিক বিজয় লাভ না করা অবধি এই ধরনের বিক্ষোভ চালিয়েই গেছে।

বিক্ষোভকারীদের ওপর খুব বেশী কঠোর হওয়া, পুলিশ এবং স্থানীয় শাসকবর্গের পক্ষে হয়ে পড়ত মুশকিলের ব্যাপার। কারণ মিছিলকারীরা সবাই নিজেদের সরকারের অনুগত প্রজা বলে দাবি করত। বলত, সরকারের নামে গ্রামাঞ্চলে কি ধরনের অত্যাচার করা হচ্ছে, শুধু সেইটা সরকারকে জানাবার জন্যই তারা এসেছে। অত্যাচার করবার আদেশ যে সরকারীভাবে দেওয়া হয়েছে, এমন কথা উচ্চপদস্থ সরকারী ব্যক্তিরা স্বীকার করতে পারত না। সুতরাং, স্থানীয় প্রশাসকদের সংগে বাদানুবাদের ব্যাপারে বিক্ষোভকারীদের হাতে বেশ কার্যকরী অস্ত্র মজুদ থাকতো। কিন্তু পরবর্তী কালের বিক্ষোভ মিছিলগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের ওপর রঙ ঢেলে দেওয়া হয়েছে কিংবা কাঁচি দিয়ে মহিলাদের চুল ছেঁটে ছোট করে দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল, ওই চিহ্ন দেখে যাতে গ্রাম্য পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে। কারণ, সায়গন কিংবা অন্যান্য শহরে, শহরবাসীদের সামনে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করা কেন্দ্রীয় পুলিশের পক্ষে হয়ে পড়ত বেশ ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার।

'কামান অক্ষমকারী'

প্রাদেশিক এবং জেলা কেন্দ্রগুলোতে আন্দোলন সংগঠনকারী অথবা তাতে যোগদানকারী মহিলারা ছাড়াও, প্রতিটি গ্রামে 'কামান অক্ষমকারী দল' নামে মহিলাদের একটি করে দল রয়েছে।

কোনো গ্রামকে ভিয়েতকং সন্দেহ করে সৈন্যরা হয়ত গোলা দাগার উদ্দেশ্যে কামান অথবা মর্টার ঠিক-ঠাক করতে শুরু করল। ঠিক সেই সময় মহিলাদের একটি দল গিয়ে হাজির হবে সেখানে।

সব চাইতে অভিজ্ঞ মহিলাটি, কোলে একটি শিশু নিয়ে, ভারপ্রাপ্ত অফিসারটির কাছে গিয়ে বলবে, "আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। আসুন, এক কাপ চা অথবা একটা ঠাণ্ডা ডাব খাবেন।" দলের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা ততক্ষণ সৈনিকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে করতে, কী হতে যাচ্ছে তা' জানতে চাইবে। অফিসারটি সম্ভবতঃ জবাব দেবে, "যদি ভেবে থাকো যে, তোমাদের ওই চালাকিতে ভুলে আমরা গ্রামের উপর কামান দাগবো না, তা'হলে ভুল করেছো।

"কিন্তু কামান দাগবেন কি কারণে?"

"যে সমস্ত ভিয়েৎকংকে তোমরা গ্রামে লুকিয়ে রেখেছো, তাদের শেষ করতে।"

"কিন্তু আমাদের গ্রামে তো এখন আর কোন ভিয়েতকং নেই। কয়েকজন ছিল। আপনারা আসছেন শুনেই তারা পালিয়ে গেছে। গ্রামের উপর কামান দাগলে, আমাদের মতন স্ত্রীলোক আর শিশুদেরই শুধু হত্যা করবেন। আমি সত্যি বলছি, গ্রামের মধ্যে আর কোনো ভিয়েতকং নেই। যদি চান, প্রতিটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আপনাকে দেখাতে পারি।"

ততক্ষণে দলের অন্যান্য মেয়েরা যথারীতি সৈনিকদের ভিতরে গিয়ে কাজ শুরু করে দেবে। দিয়েমী সেনা বাহিনীতে কর্মরত তাদের স্বামী এবং আত্মীয়-স্বজনদের ছবি দেখিয়ে হয়তো বলবে, "আমরাও ঠিক তোমাদেরই পরিবারের মতো। তোমরা কি নিজেদের আপনজনের উপরে গুলি চালাতে চাও?" এর পরও যদি অফিসারটি মত পরিবর্তন না করে, তখন তারা অস্ত্রগুলোর সামনে গিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে বলবে, "বেশ, আগে আমাদের হত্যা কর। গ্রামে ফিরে গেলেও তো তোমাদের কামানের গোলায় মরতেই হবে।"

সাধারণতঃ এই ধরনের কথাগুলোতে কাজ হয়। সৈনিকদের পক্ষে কয়েক হাজার গজ দূর থেকে অজ্ঞাত কোনো লক্ষ্যবস্তুর উপর গুলি চালানো এক কথা। কারণ সে ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু খানিকটা

ধোঁয়া আর আগুন। কিন্তু যারা তাদেরও মাতা, স্ত্রী অথবা সন্তান হতে পারে এমন সমস্ত মানুষের জীবন্ত শরীরে সামনা সামনি গুলি করা অন্য কথা। পক্ষান্তরে, বিদেশী সেনাবাহিনী কিংবা 'ফ্রেঞ্চ এক্সপিডিশনারি কোর' হলে এ ধরনের কার্যকলাপ হত অসম্ভব। ভাষা এবং জাতির বাধা ছাড়াও, বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে করুণা ভিক্ষার মতো হীনতার পর্যায়ে কোনো ভিয়েতনামীই নিজেকে নামিয়ে আনত না।

'কামান অক্ষম' করবার একটি ঘটনা প্রসংগে শুনেছিলাম, গোলন্দাজ বাহিনী তোড়জোড় শুরু করতেই গ্রামের স্ত্রীলোক ও শিশুরা আগে আগে শুয়োর ও মোষের পাল এবং হাতে মুরগি নিয়ে তাদের দিকে ছুটে যায়। মুহূর্তের মধ্যে কামান ও গোলাগুলোর উপরে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দেয় মুরগিগুলো। শুয়োর এবং মোষের পাল স্বচ্ছন্দভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে। কামান এবং গোলার গাদার উপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে করতে স্ত্রীলোক এবং শিশুরা আর্তনাদ ও বিলাপ শুরু করে দেয়, "গ্রামের উপর কামান দাগালে, আমাদের পক্ষে নিরাপদে থাকবার একমাত্র জায়গা হল এখানেই।" ফলে কামানগুলো হয়ে পড়ে 'অক্ষম'। পরিপূর্ণ সাহস এবং দক্ষতা সহকারে পরিচালিত এই ধরনের ঘটনা হাজারে হাজারে ঘটতে থাকলে তা' যে একটা সাংঘাতিক ফলপ্রসূ রাজনৈতিক-সামরিক অস্ত্র পরিণত হয় একথা অনস্বীকার্য্য।

'সংবদ্ধভাবে বাস করা'-র কথা আগেই বলেছি। সে হ'লো এক অর্থে। এরই আরেক ধরনের উদাহরণ হলো বিচ্ছিন্ন ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ সায়গন গ্যারিসনগুলো। চারিদিক দিয়ে এদের ঘিরে রেখেছে ফ্রন্ট-নিয়ন্ত্রিত এলাকার অধিবাসীরা। যুদ্ধে আজ অবধি যত রকমের প্রচার-অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে, সম্ভবতঃ তার মধ্যে সব চাইতে অধিক ফলপ্রসূ প্রচারকার্য এদের দিবারাত্র শুনতে হয়। কোনো অঞ্চল দখল করে নিয়ে ফ্রন্ট প্রথমেই যে কাজগুলোতে হাত দেয় তার মধ্যে ভূমি সংস্কার হলো অন্যতম। যে সমস্ত ক্ষেত্রে জমির মালিকরা বিশ্বাস-

ঘাতকরূপে চিহ্নিত হয়েছে, তাদের ছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রে অবশ্য সম্পত্তির ওপর বর্তমান অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় না। ভূমি বণ্টন করা হয় দরিদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। বর্গাদারদেরও খানিকটা সুবিধা করে দেওয়া হয়। ভূমি বণ্টনের সময়, যারা ফ্রণ্ট অথবা সায়গন সেনা বাহিনীতে কাজ করছে তাদের জন্যও ভূমির একটি অংশ পৃথক করে রাখা হয়। কারণ এটা সবারই জানা যে সায়গন সেনাবাহিনীর অধিকাংশই হলো এমন ধরনের কৃষক সম্প্রদায় যাদের বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামেই হোক, কি অন্যত্র হোক, যেখানেই সায়গন বাহিনীর ঘাঁটি রয়েছে, সেখানেই কোনো না কোনো ঘাঁটিতে প্রতি রাত্রে হাতে মেগাফোন নিয়ে হাজার হাজার স্ত্রীলোক আশপাশের ঘাসের জংগলে অথবা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ঘোরাফেরা করে। সম্ভব হলে এমন ঘাঁটি বাছা হয় যার ভিতরে ওই স্ত্রীলোকদের কারও না কারও কোনো আত্মীয় রয়েছে। গ্রাম্যজীবন এবং গৃহের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এমন কোনো কবিতার আবৃত্তি দিয়ে শুরু হয় 'সান্ধ্য আসর।' প্রথমে হয়ত তাদের দিক লক্ষ্য করে ছুটে আসে দু-একটি গুলি। মেয়েদের মধ্যে একজন হয়ত তখন তার আত্মীয়ের নাম ধরে ডাকতে শুরু করে। .

"ছান্ ছান্! আমি তোমার ভ'ইঝি থি-লান্। তুমি গুলি চালাচ্ছো কেন? আমি সামান্য একজন গেঁয়ো মেয়ে। আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই। ভাবলাম, তুমি আর তোমার বন্ধুরা এখানে নিশ্চয় খুব একলা আর একঘেয়ে বোধ করছো। তাই কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করতে এলাম।" মধুর কণ্ঠে কবিতার আবৃত্তি ও গান চলতে থাকে। খুব যত্ন করে এমন সব কবিতা বাছা হয়, যা' শুনলেই চোখে জল এসে যায়। তারপর আবার শুরু হয়: "ছান্, ছান্; শুনছো কি? তোমার গ্রামের খুব ভাল খবর আছে। ছোট্ট 'ছি' স্কুলে খুব ভাল ফল করেছে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা। তোমার গ্রামকে মুক্ত করা হয়েছে। নদীর ধারে চমৎকার একখণ্ড ধানিজমি আলাদা

করে রাখা হয়েছে তোমার জন্যে। শুধু তোমারই নয়, সেনাবাহিনীতে তোমার বন্ধুদের কয়েকজনের জন্যও।" এরপর আরো কয়েকটি কবিতা ও গান। "ছান্, এমন অসম্মানজনক জীবন তুমি কেন ছেড়ে এসো না? ওই মন্দ পথ ছেড়ে তোমার গ্রামে ফিরে এসো না কেন? এখনো সময় রয়েছে; জনগণের পাশে এসে দাঁড়াও। ইয়াংকিদের জন্য কেন নিজের জীবন দেবে?" এ কথার পর হয়তো আরো কয়েকটি গুলি ছুটবে। কিন্তু ততক্ষণে শুধু ছান্ই নয়, গ্যারিসনের অন্যান্যদের মনেও কথাগুলো জায়গামতো পৌঁছে গেছে। পরবর্তী সামরিক অভিযানের জন্য ছান্কে যখন যেতে হবে, তার মনের মধ্যে তখন ঘুরতে থাকবে নদীর ধারের সেই ছোট্ট একখণ্ড ধানি-জমি। সেই জমিতে লাঙল চালাবার জন্য মন তখন তার মগ্ন হয় হয়ে আছে। এবং, ১৯৬৩ সালের পঁয়তাল্লিশ হাজার ছান্ এবং হুয়েনদের মতো, খুব সম্ভব এক রাতে সেও সরে পড়বে ফ্রন্ট বাহিনীর সংগে যোগাযোগ করতে। হয় তাদের সংগে সে যোগ দেবে, অথবা নদীর ধারের সেই ধানক্ষেতটিতে ফিরে যাবার জন্য একটা অনুমতিপত্র যোগাড় করবে। ঘাঁটির বাইরে থেকে আবৃত্তি করা কবিতাগুলো এইভাবে সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু পলাতক সৃষ্টি করেই। একথা আমি শুনেছি আবৃত্তিকারী এবং পলাতক, উভয়ের মুখ থেকে। 'বিশেষ প্রতি-যুদ্ধের' অবিশ্বাস্য রকমের ফলপ্রসূ একটি কৌশল।

এই ধরনের কার্যকলাপের সবচাইতে চমৎকার ফল.ফলের কথা আমি শুনলাম সুন্দরী এবং সুবক্তা লি থি থিয়েন্-এর কাছে। আমার সন্দেহ, অভিযানটি পরিচালিত করেছিলেন তিনি নিজেই। কিন্তু ভিয়েৎনামী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ বিনয় সহকারে তিনি কেবল স্বীকার করলেন যে, "অন্যান্যদের সংগে তিনিও অংশ গ্রহণ করে ছিলেন।"

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, বেন-ত্রে প্রদেশের একটি গ্রামে। মেয়েদের একটি দল একটি গ্যারিসনের সংগে কথাবার্তা বলবার পর সম্পূর্ণ গ্যারিসনটিই আত্মসমর্পণ করে।

অভ্যন্ত বিনয়ের সংগে লি থি খিয়েন বললেন, "ঘাঁটিটি ছিল অত্যন্ত বদ। ওদের অধিনায়ক ছিল দক্ষিণের এক জমিদার পুত্র; এবং সৈনিকগুলো ছিল বাস্তুত্যাগী ক্যাথলিক। খুব বেছে বেছে লোকগুলোকে সেনাদলে নিয়েছিল জমিদার নন্দন। নিষ্ঠুরতায় তাদের জুড়ি ছিল না। মানুষের পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বার করে হত্যা করতে তাদের আরো উৎসাহ দিত সে। ওই সৈনিকদের পরিবারেরা বাস করত ঘাঁটিটির কাছাকাছি একটি গ্রামে। আমাদের একটি দল একদিন তাদের সংগে কথাবার্তা বলতে গেল। স্পষ্ট বলা হলো, ওদের স্বামীরা অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে; অফিসারটি হলো একটি সাক্ষাৎ শয়তান; বহু লোককে সে হত্যা করেছে; বহু লোকের উপর অত্যাচার করেছে, এবং আমরা, জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট এই ঘাঁটিটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে মনস্থ করেছি। আরো বলা হলো, ওদের কারো-কারো স্বামী হলো সত্যিকারের জনগণের শত্রু। জেলার মধ্যে এই ঘাঁটিটিই হলো সব চাইতে বদ। কিন্তু তবু আমরা মানুষ। নিষ্প্রয়োজনে রক্তপাত ঘটাতে অথবা ভালো ভালো সৈনিকদের হত্যা করতে চাই না। কিন্তু তারা যদি আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে ওই ঘাঁটি সহ ওদের সবাইকে আমরা নিশ্চিহ্ন করে দেব। যদি তারা চায় যে তাদের স্বামীরা বেঁচে থাকুক তবে আমাদের সংগে তাদের আসতে হবে এবং সৈন্যেরা যাতে আত্মসমর্পণ করে সেই চেষ্টা করতে হবে। নইলে আজ রাতেই ধ্বংস করা হবে ওদের।

"ওই জেলাতেই খুব সম্প্রতি তিনটি ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছিল। সুতরাং আমাদের কথা তারা অবিশ্বাস করতে পারল না। সৈনিকেরা সবাই যাতে আত্মসমর্পণ করে সেই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে উদগ্রীব হয়ে উঠল সবাই। আমরা যে তাদের একটা সুযোগ দিয়েছি সেজন্য কৃতজ্ঞও হল। বলল, ওরা যদি ব্যর্থ হয় তা হলে আমরা যা ভালো মনে করি তা করতে পারি।

"সুতরাং তাদের নিয়ে রওনা হলাম। এরা কেউই কিন্তু

জনগণের পক্ষে ছিল না। এরা উৎকণ্ঠিত ছিল নিজের নিজের স্বামী এবং সন্তানদের বাঁচাতে। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন স্ত্রীলোক এল আমাদের সংগে। কেউ কেউ বাচ্চা সংগে নিয়ে। আপন-আপন আত্মীয়ের নাম ধরে ডেকে তারা বলতে লাগল: 'জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের লোকেরা বলছে তোমরা অনেক অপরাধ করেছো; কিন্তু বেরিয়ে এসে যদি আত্মসমর্পণ কর, তাহলে তারা তোমাদের ক্ষমা করবে। আমাদের কথা ভেবে নিজেদের জীবন বাঁচাও।' স্ত্রী এবং মাতাদের পারিবারিক আবেগপূর্ণ সজল অনুনয়ের সংগে যুক্ত হলো আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য, 'আমাদের অভিমত হলো, মৃত্যু নয়, জীবনের রাস্তা বেছে নাও; বেছে নাও ন্যায়ের পথ, অন্যায়ের নয়।' সন্তানেরা ডাকছে তাদের পিতাদের, মায়েরা ডাকছে নিজেদের সন্তানদের, স্ত্রীরা ডাকছে তাদের স্বামীদের। সৈনিকেরা বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু বাধা আসে সেই অত্যাচারী অফিসারটির কাছ থেকে। অবশেষে তারা তাকে গুলি করে হত্যা করলো। তারপর বাইরে বেরিয়ে এলো আত্মসমর্পণ করবার উদ্দেশ্যে।" কাহিনী শেষ করে লি থি থিয়েন বললেন, "বস্তুতঃ, ওরা আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে না দেওয়া অবধি, আমাদেব কাছে কোন অস্ত্রই ছিল না। কিন্তু আমরা এমন ভাণ করলাম যেন ঘাঁটিটিকে গেরিলারা ঘিরে ফেলেছে। জোরে জোরে বলতে লাগলাম: '...শান ওয়ান', পাশের দিকে সরে যাও; সেকশান টু সড়কটাতে পাহারা দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওরা ভাবল, ওদের বুঝি ঘিরে ফেলা হয়েছে।"

'সংবদ্ধভাবে বাস করা' থেকে নিয়ে 'কামান অক্ষম' করা এবং সৈনিকদের সংগে পৃথকভাবে ও গ্যারিসনের সংগে কথাবার্তা বলে তাদের দলত্যাগ কবানো, উপরে বর্ণিত সমস্ত ব্যাপারগুলোই সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র জনসমর্থনহীন 'বিশেষ যুদ্ধে'র সুনিহিত মূলগত দুর্বলতার কারণে; কারণ, এই 'বিশেষ যুদ্ধ' আরম্ভ করা হয়েছিল এমন সমস্ত নীতি চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে যে-গুলো জনসাধারণের অধিকাংশের কাছেই ছিল ঘৃণার বস্তু। তাই জমিদারগিরির উচ্চ

প্রশংসা করে এবং জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য জীবনপাত করতে মিনতি করে কোন থি-লান নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও তার সহকর্মী কমরেডদের উদ্দেশ্যে কবিতা পাঠ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও কোনই ফল হতো না। আবার গ্যারিসনের সৈনিকদের অত্যাচার এবং সায়গন সরকার ও তার কর্মচারীদের প্রতি সাধারণ মানুষের সর্বাত্মক ঘৃণার কথা ওই পরিবারবর্গের অজানা থাকলে, লি থি থিয়েন ও তাঁর বান্ধবীরা তাদের সংগে সারা রাত ধরে তর্ক করেও সফলকাম হতেন না।

বাইরে থেকে মনে হয় সায়গন সরকার বুঝি অজেয়। তাদের একচেটিয়া দখলে রয়েছে ট্যাংক, বিমান, কামান, গানবোট এবং মোটর পরিবহণ। গড়ে দৈনিক পনের লক্ষ ডলারের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। সৈন্য ঘাঁটি ও দুর্গ দিয়ে সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চলকে হামের গুটিকার মতো ভরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু জনগণের হৃদয়ে তার কোন স্থান নেই। সে স্থান রয়েছে ফ্রন্টের।

১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসের যে বিদ্রোহে দিয়েমের পতন ঘটে, ঠিক তার পূর্বেকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রসংগে মুক্তিফ্রন্ট প্রেসিডিয়ামে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি, ত্রান নাম ত্রাঙ বলেছিলেন :

"শত্রুপক্ষ সারা দেশে সেনা ঘাঁটি বসিয়েছিল, কিন্তু সেই ঘাঁটিগুলো দিয়ে তারা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। বস্তুতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে আমাদের বাহিনী দ্বারা। গণফৌজ দিয়ে ঘিরে ওদের এমন সমস্ত ঘাঁটি আমরা অকর্মণ্য করে দিয়েছি যেগুলোতে ছোট ছোট সৈন্যদল, প্লেটুন, এমন কি কোম্পানি পর্যন্ত ছিল। কারণ, গণ-ফৌজের হাতে ছিল শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার সামর্থযুক্ত রাজনৈতিক তথা সামরিক হাতিয়ার। মোবাইল ফোর্সের সাহায্য ছাড়া ঘাঁটির বাইরে ওরা কেউ বেরুতে পারত না। বিরাট সামরিক অভিযান চালাতে গেলেও মোবাইল ফোর্সের সাহায্য ছাড়া উপায় ছিল না তাদের। কিন্তু 'সাধারণ প্রতি আক্রমণের' ক্ষেত্রেও প্রয়োজন মতো মোবাইল ফোর্স যোগাড় করতে

পারত না তারা। কারণ বিরাট সংখ্যক আটকা পড়ে থাকত ঘাঁটিগুলোতেই। প্রদেশ এবং জেলার শাসক, পুলিশের প্রধান এবং অন্যান্যেরা, এককথায়, অসামরিক প্রশাসনও অকর্মণ্য হয়ে থাকত ঘাঁটিগুলোতে। কর আদায়ের জন্যও চলাফেরা করতে পারত না কেউ।

"আসলে ঘাঁটিগুলোকেই নিয়ন্ত্রণ করত জনসাধারণ; জনসাধারণকে ঘাঁটিগুলো নিয়ন্ত্রণ করত না। বাজারে যেতে হলে, স্নান করতে হলে অথবা জল আনতে হলে গ্যারিসনকে অনুমতি নিতে হত গেরিলাদের কাছ থেকে। গেরিলারা সম্মত হলে তবেই তারা জল আনবার জন্য বাইরে কয়েক গজ মাত্র দূর অবধি চলাফেরা করতে পারত। কিন্তু সে অনুমতিও দেওয়া হত সীমিত সংখ্যক লোককে, এবং বিশেষ একটি সময়ের জন্য। সামরিক মানচিত্রের দিকে তাকালে চারিদিকেই সেনা ঘাঁটি নজরে পড়বে আপনার; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চারিপাশের অঞ্চল হল মুক্ত, এবং তা রয়েছে জনগণের হাতে। আসলে ঘাঁটিগুলোই রয়েছে পরিবেষ্টিত হয়ে—জনসাধারণ নয়। বহু এলাকায় শত্রুপক্ষ গ্রামাঞ্চল আঁকড়ে থেকেছে। কিন্তু সেখানেও তাদের বাধ্য করা হয়েছে আমাদের শর্তে, আমাদের সংগে সংবদ্ধ অবস্থায় থাকতে।"

এবং আমার পরিভ্রমণকালেও পরিস্থিতি ছিল এই ধরনের; বরং সায়গণের পক্ষে আরো খারাপ। নইলে সায়গনের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিশাল তথা জটিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একেবারে ভিতর দিয়ে কখনই এভাবে আমি ভ্রমণ করতে পারতাম না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অস্ত্রাগার ও হাসপাতাল

জংগলের একটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা

"আমরা শুরু করেছিলাম ১৯৬০ সালে এবং একমাত্র কাঁচামাল বলতে আমাদের ছিল কিছু পুরনো অকেজো লোহার টুকরো আর না-ফাটা বোমার কিছু বারুদ। সে সময় আমাদের একটি মাত্র বিভাগ ছিল; আর আজ আছে দশটি বিভাগ। তখন আমরা পনেরটি হাত-বোমা তৈরী করেই ভাবতাম অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। আর আজ আমরা তৈরী করছি পাঁচ হাজার হাত-বোমা।" কথাগুলো বলছিলেন অস্ত্রাগারের অধিকর্তা জনৈক লম্বা, রোগা, টাকমাথা ভিয়েতনামী ভদ্রলোক। আমার চারপাশে কাজ করছিল এপ্রন পরিহিত ও মুখে সাদা রংয়ের মুখোশ পরা শ্রমিকেরা। কেউ-বা এন্‌টি পারসোনেল মাইনে ঠেসে-ঠেসে বারুদ ভরতি করছে; কেউ-বা সুদক্ষ হাতে মোচাকৃতি চাপ-যন্ত্র চালিয়ে কাঠের হাতলগুলোকে দৃঢ়ভাবে ঠেসে-ঠেসে ভরছে হাত-বোমার ভিতরে; কেউ-বা বিচিত্র, শালতি আকারের পাত্রে হাত-বোমাতে ব্যবহারের জন্য বোমার জমাট-বাঁধা বারুদগুলো মিহি করে গুঁড়ো করছে; কেউ-বা চালনি দিয়ে বারুদ চালছে; কেউ-বা ব্যস্ত রয়েছে বারুদ মেশানোর কাজে। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি জংগলের মধ্যে অবস্থিত কোনো অস্ত্রনির্মাণ কারখানার বদলে এসে পড়েছি কোনো রুটির কারখানায়। স্থানটি ছিল গভীর জংগলের মধ্যে অবস্থিত একটি অস্ত্রাগার তথা অস্ত্রনির্মাণ কারখানা। মাথার উপর সগর্জনে চক্কর দিচ্ছিল একটি স্কাই্‌মোরাজেল। যে কর্মকাণ্ডের দিকে আমি তাকিয়ে রয়েছি সেটা

যদি সে একবারের জন্যও দেখতে পারত! কিন্তু বন্ধুদের প্রতি জংগলের করুণা অপরিসীম।

অস্ত্রাগারের অধিকর্তা আবার বললেন, "প্রথমে আমাদের কোনো দক্ষ শ্রমিক ছিল না। কিন্তু আমরা কৃষকদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে নিলাম তাদের মধ্যে অনেককেই এখন দক্ষ শ্রমিক বলা চলে। ক্রমে ক্রমে আমরা উন্নতি লাভ করলাম; কারখানা সম্প্রসারিত হল। বর্তমানে এই অঞ্চলে ফ্রণ্টের প্রয়োজনের বেশ কিছুটা অংশ আমরা মেটাতে পারি। উৎপাদনের সংগে সংগে কর্মীদেরও হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছি। তারাই এখন বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করে। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিক তথা কর্মীদের মনোবল প্রতিদিন দৃঢ়তর হয়ে চলেছে। বিশেষ-বিশেষ কাজে দক্ষ কিছু শ্রমিকও সায়গন থেকে এসেছে আমাদের সাহায্য করতে।"

এলুমিনিয়মের তৈরী দুটো বিয়ার মগ তিনি আমাকে দিলেন। মগদুটিতে আমার এবং আমাকে আমন্ত্রণকারী সংস্থা, মুক্তি ফৌজের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের বিভাগের নাম উৎকীর্ণ করা ছিল। বললেন, "এগুলো রকেটের সিলিণ্ডার থেকে তৈরী। প্রাথমিক কোনো কাঁচামাল আমাদের নেই। সুতরাং শত্রুর কাছ থেকে যা অকেজো মাল পাওয়া যায় তাই আমরা যোগাড় করি। যেমন বিমানের অংশ, বোমা এবং রকেটের টুকরো, ভাঙা ট্রাক, ব্রিজের রেলিং, রেললাইনের ভাঙা টুকরো সব কিছু। কোন ধাতুই আমরা পেলে ছাড়ি না। আপনার হাতের ওই মগদুটোর হাতল তৈরী করা হয়েছে নাপাম বোমার কেনেস্তারা থেকে। জনসাধারণও আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করে। পেতলের এই ধূপদানিগুলো দেখুন। একজন বৃদ্ধা সেদিন এগুলো আমাদের এনে দিয়েছে।"

ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ ও মুখোসপরা একজন ঝালাইকরের কাজ দেখবার জন্য আমি একটু দাঁড়ালাম। . . রাইফেল গ্রেনেডে ডানা ঝালাই করছিল। যে যন্ত্রটি থেকে এসিটিলিন গ্যাস নিয়ে সে কাজ করছিল, সেই যন্ত্রটির দিকে এগিয়ে গেলাম। যন্ত্রটিতে দেখলাম উৎকীর্ণ

করা রয়েছে : 'পোরটাওয়েল্ড-ওমান, মিননেপোলিস' এবং যথারীতি মার্কিন-ভিয়েতনামী 'বন্ধুত্ব'র নিদর্শন সেই করবদ্ধ হাতের ছাপ। অধিকর্তা আবার বললেন, "হ্যাঁ, মার্কিন যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। ওরা যদি প্লেন আর ট্যাংকের বদলে শুধু এই যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আমাদের দেশে আসতো, তা' হলে সেটা আমাদের সকলের পক্ষেই খুব ভাল হতো।"

মাইন নির্মাণের একটি বিভাগে যুদ্ধে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের মাইনের রকমারি দেখে বিস্মিত হলাম। ছোট বেলনাকার এবং চ্যাপটা এন্টি-পারসোনেল মাইন, কাঁটা তারের জালের মোকাবিলা করবার জন্য লম্বা বেলনাকার মাইন, এম-১১৩ ট্যাংকের জন্য বিভিন্ন মাপের হাতলযুক্ত পাত্রের আকারের মাইন, বিশেষ ধরনের কাজের জন্য বড় মাইন, রেল লাইন অথবা জলযান ধ্বংস করবার মাইন ইত্যাদি। শেষোক্ত ধরনের একটি খালি মাইন আমার হাতে দিয়ে অধিকর্তা বললেন, "সপ্তাহ ছয়েক আগে এই ধরনের মাইন দিয়ে সায়গন নদীতে আমরা ছটি জলযান ডুবিয়ে দিয়েছি।"

সমস্ত কারখানাগুলোই দেখলাম বেশ প্রশস্ত খড়ের চালাঘরের মধ্যে অবস্থিত। মাথার উপরে ঘন জংগলের আচ্ছাদনের সামান্যমাত্র ফাঁক থাকলে, সেটাকে প্রতিদিন তাজা ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ঘরগুলো বেশ দূরে-দূরে, যাতে একটা বোমা একটার বেশী ঘরের ক্ষতি করতে না পারে। লেদ যন্ত্র, বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র, ছিদ্র করবার তথা পালিশের যন্ত্র সবগুলোই রাখা হয়েছে মাটির নিচে গর্ত করে; এবং সবগুলোই হল আমেরিকান। জরুরী অবস্থার সময় সব-কিছু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী রয়েছে।

মাইন ও তীক্ষ্ণ বাঁশের ফলা দিয়ে নির্মিত অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত ফাঁদের জন্য অস্ত্রাগারের নিকট পৌঁছান এক জটিল ব্যাপার। এ ধরনের ফাঁদ আগে কখনো দেখি নি। ওদের নিজেদের কারখানাতেই আবিষ্কৃত পন্থা অনুযায়ী নির্মিত নতুন ধরণের সমস্ত গোপন অস্ত্রও

দেখলাম। এরা যে ধরনের যুদ্ধ চালাচ্ছে, তাতে মোটর-বাহিত কামান প্রভৃতির পরিবর্তে অধিকতর প্রয়োজনীয় হল মানুষের পিঠে বহনযোগ্য হালকা অস্ত্র-শস্ত্র। কর্মস্থলে প্রতিটি কর্মীর বেঞ্চির পাশে রয়েছে তার নিজের অস্ত্র-শস্ত্র। কর্মীরা সবাই হাসিমুখের আগ্রহী যুবক। নিজেদের তৈরী অস্ত্র সম্বন্ধে তাদের গর্ব করা সত্যিই পোষায়। যন্ত্রের গুঞ্জন এবং শত্রু-বিমান অথবা গান-বোট থেকে আসছে না এমন যান্ত্রিক আওয়াজ আবার শুনতে পেয়ে সত্যিই আনন্দ লাগছিল। এক জায়গায় দেখলাম অপূর্ব একটা দৃশ্য। সায়গনের ঘড়ি সারাই-ওয়ালাদের বিরাট একটা সারি। চোখে তাদের আঁটা রয়েছে লেন্স। মাথাগুলো ঝুঁকে রয়েছে সূক্ষ্ম স্প্রীং এবং তামা ও চুম্বকশক্তিসম্পন্ন সরু তারের কুণ্ডলীর উপর। ওগুলো দিয়ে তৈরী হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের বিলম্বিত-ক্রিয়াসম্পন্ন বোমা ফাটানোর নল। পরে 'ভয়েস অফ আমেরিকা' থেকে প্রচারিত ম্যাকনামারা সাংবাদিক বৈঠকের এক প্রতিলিপিতে শুনলাম 'সামুদ্রিক মাইন এবং বিলম্বিত ক্রিয়া-সম্পন্ন বোমা ফাটানোর নলযুক্ত অন্যান্য মাইনসহ আরো উন্নত ধরনের মাইনের আবির্ভাব'কে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব উত্তর ভিয়েতনামের হস্তক্ষেপের 'নিশ্চিত প্রমাণ'-রূপে উল্লেখ করেছেন। অথচ 'আরো উন্নত ধরনের' এই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র আমি সেই জংগলের অস্ত্র নির্মাণ কারখানায় সারবন্দীভাবে নির্মিত হতে দেখেছি।

বিস্ফোরক দ্রব্য নির্মাণের রাসায়নিক কাজকর্ম যে বাড়ি ও গবেষণাগারগুলোতে চলছে, সেগুলোকে দেখলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে; ঘরের বাঁশের বেড়াগুলো মার্কিন প্যারাস্যুটের নাইলনে মোড়া। একটি ঘরে মেয়েরা সূক্ষ্ম দাঁড়ি-পাল্লার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরকের ঢাকনার জন্য প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক পদার্থের অণুপরিমাণ ওজন করছিল; এবং বিস্ফোরকের ঢাকনাগুলো কার্তুজে লাগানোর জন্য ঘরোয়াভাবে প্রস্তুত যন্ত্রটির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি ছিল পনের বছরের একটি বালক। অধিকর্তা জানালেন, যন্ত্রটিতে আজ অবধি একটিও দুর্ঘটনা ঘটেনি।

বিদায়ের প্রাক্কালে অধিকর্তা আবার জানালেন, "১৯৬০ সাল থেকে প্রতি মাসে ১৫ থেকে ৫০০০ হাতবোমা উৎপাদন বৃদ্ধির হার হল প্রতি বৎসরে প্রতিটি বিভাগের অতি দ্রুত সম্প্রসারণের একটি বিশেষ নিদর্শন, এবং এই গতিতেই আমরা আমাদের সম্প্রসারণ বজায় রাখবো।"

রণাঙ্গণের অস্থায়ী হাসপাতাল

অস্ত্রোৎপাদনের দ্রুত সম্প্রসারণ হল প্রতিটি ক্ষেত্রে ফ্রন্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টার দ্রুত সম্প্রসারণের প্রতীক-স্বরূপ। এর অন্যতম লক্ষ্যণীয় ফল লাভ হয়েছিল চিকিৎসাক্ষেত্রে।

অগ্রবর্তী রণাঙ্গণের একটি পুরোদস্তুর হাসপাতাল দেখে প্রথমে কিন্তু সাধারণ একটি কুটির থেকে সেটিকে খুব বেশী পৃথক বলে আমার মনে হয় নি। সেই একই ধরনের বাঁশের কুটির; ওপরে খাড়া, ঝোলানো তালপাতার ছাউনি খুঁটির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঁকারির বোনা কোমর অবধি উঁচু বাইরের দেওয়াল। পরিকল্পনাটি এমনভাবে করা, যাতে সর্বাধিক ছায়াএবং বাতাস পাওয়া যায়। আসলে কিন্তু প্রতিটি কুটির হল হাসপাতালের এক একটি 'বিভাগ'; এবং তাদের মধ্যে যেটা সামান্য বড় এবং আরো বেশী করে ঘেরা সেটা হল অস্ত্রোপচার গৃহ। বিভাগগুলোর ছাদ এবং দেওয়ালগুলো সাদা রংয়ের প্যারাস্যুট নাইলন দিয়ে ঢাকা।

প্রথমে যে বিভাগটিতে গেলাম, সেখানে ছিল তিনজন রুগী। একজন হল রবার বাগিচার শ্রমিক। প্রতিদিনের মতো সেদিনও যখন সে নিয়মমাফিক রবার গাছের রস সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে, সেই সময় সায়গন সৈন্যেরা তার গলায় গুলি করে। বুলেটটি বার করে ফেলা হয় এবং শ্রমিকটি তখন দ্রুত আরোগ্যের পথে। অন্য রুগিটি ছিল একজন মধ্য বয়সী স্ত্রীলোক। একটি হাতবোমার বিস্ফোরণে তার পেটে আঘাত লাগে। অস্ত্রের কিছুটা অংশ এবং লিভারের

খানিকটা তার কেটে বাদ দিতে হয় এবং তখনও সে খুব দুর্বল। তৃতীয়টি ছিল একজন গেরিলা তরুণ। মাত্র দু-দিন পূর্বে হাত বোমার এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় একটি হাত পুরো এবং অন্যটির খানিকটা তাকে হারাতে হয়। রাত্রে এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে সে দেখে যে তার কুটিরটি আক্রান্ত হয়েছে। সংগে সংগে হাতবোমা নিয়ে সেটার পিনটাকে টেনে ফেলে যে মুহূর্তে সে সেটাকে ছুড়তে যাবে, সেই মুহূর্তেই তার ঘুম ভেঙে যায়। বোমা ছুঁড়লে তার কমরেডরা মারা পড়বে। কথাটা মনে হতেই সে বোমাসুদ্ধ তার হাত দুটোকে বিছানার পাশে রাখা কতগুলো চালের বস্তার নিচে ঢুকিয়ে দেয়। আশ্চর্যের বিষয়, শুধু তার হাত দুটোই জখম হল। ফলে একটি হাতের পুরোটা এবং অন্যটির খানিকটা কেটে বাদ দিতে হয়। আঘাতটাকে তখনো সে সামলে উঠতে পারে নি।

স্থানটি ছিল প্রকৃত একটি অগ্রবর্তী রণাঙ্গণ এলাকা। প্রতিটি ঘরের পাশেই দেখলাম বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থল। তার মধ্যে কতগুলো আবার স্ট্রেচারসহ আহতদের নিয়ে যাবার মত যথেষ্ট বড়। অঞ্চলটিতে প্রায় প্রতিদিনই বিমান থেকে বোমাবর্ষণ, রাত্রিকালে কামান দাগা এবং ঘন ঘন 'শত্রুনির্মূল' অভিযান চলে।

হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত শল্য চিকিৎসক ডাঃ ত্রান একজন ছোট-খাটো উৎসাহী মানুষ; মাথাভরতি একরাশ খাটো করে ছাঁটা চুল; হাতের সংবেদনশীল আঙুলগুলোর ডগা চোকো। প্রসংগক্রমে বললেন, "১৯৬৩ সালে আমরা ২৪৭টি শল্যচিকিৎসার রোগী পাই। তাদের মধ্যে পেট, মাথা, বুক এবং অন্যান্য অংগ প্রত্যংগের শল্যচিকিৎসার রোগী ছিল। শতকরা ৯৮টি রোগী আরোগ্যলাভ করে।" ডাঃ ত্রান ছাড়া, হাসপাতালটিতে ছিলেন চিকিৎসকের সহকারী চারজন এবং নয় জন নারসিং সিস্টার। সহকারী চারজন মেডিকেল কলেজে দু' বছর শিক্ষালাভ করেছিলেন। হাসপাতালটি স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালের শেষের দিকে। অতীতের স্মৃতিচারণ করতে করতে ডাঃ ত্রাণ আবার বললেন, "সে সময় সারা জেলায় ছিল মাত্র ৩ জন নারসিং

সিস্টার। চিকিৎসার কাজ জানা আর কোনো কর্মী ছিল না। আর আজ আমাদের রয়েছে ১৩ জন চিকিৎসা-সহকারী, ১০৫ জন নারসিং সিস্টার, ১২০ জন নার্স, ১৩ জন ধাত্রী এবং ৫২ জন ধাত্রী-সহকারী। প্রতিটি কুটিরের জন্য যাতে অন্ততঃ একজন করে সিস্টার পাওয়া যায় ফ্রন্ট সেই চেষ্টা করছে।"

ডাঃ ত্রানের হাসপাতালের সংগে যুক্ত একটি মেডিকেল স্কুলও পরিদর্শন করলাম। সেখানে ৩৬ জন নার্স এবং ১৫ জন ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষার্থীকে ছয় মাসের দ্রুততর প্রশিক্ষণ-কার্যক্রমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

পরে, বেশ বড় একটি হাসপাতালও দেখলাম। ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ কি জানালেন সেটি একটি 'রেজিমেন্টাল হসপিটাল।' বাড়িগুলো দেখলাম অনেক বড়, কিন্তু সেই একই ধরনের বুনন করা বাঁকারির দেওয়াল ও উপরে তালপাতার ছাউনি। হাসপাতালটি স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালে; এবং ১৯৬১ সালে ডাঃ কি ভার নেবার পর সেটিকে সম্প্রসারিত এবং আধুনিক করা হয়। সাজসরঞ্জাম ও ওষুধ সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ কি বললেন, "হ্যাঁ, কোনো কোনো জিনিসের অভাব সত্যিই রয়েছে। কিন্তু আমাদের বালকেরা একটি বহনযোগ্য এক্স-রে যন্ত্র দখল করে নেবার পর থেকে শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে।" (পরে সেটিকে আমি দেখি। যন্ত্রটির নির্মাতা হল পিকার অফ ক্লেভল্যাণ্ড, ওহিও।) আমেরিকায় প্রস্তুত এই একটিমাত্র যন্ত্রই যে সেখানে ছিল, তা নয়। অন্যান্য আরো অনেক যন্ত্রের মধ্যে ছিল একটি বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র। ইউনিটটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত সেই যন্ত্রটি দিয়েই। ছোট ছোট চিমটা এবং অন্যান্য কিছু সাধারণ শল্য চিকিৎসার সরঞ্জাম প্রস্তুত করা হয়েছে রকেট ও নাপাম বোমার খোল দিয়ে। সেলাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের নাইলনের সুতো। জেলা হাসপাতালের মতো, সমস্ত, বাড়িগুলোই বরফের মতো সাদা প্যারাস্যুট নাইলন দিয়ে ঢাকা।

ডাঃ কি বললেন, "ঔষধ-পত্র সরবরাহ ব্যবস্থায় শত্রুরা বাধার

সৃষ্টি করা সত্ত্বেও, যথেষ্ট পরিমাণে পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটো-মাইসিন আমরা ব্যবহার করে থাকি। সেই সংগে দেশজ জিনিস থেকে প্রস্তুত বহু ঔষধও ব্যবহৃত হয়। যেমন ধরুন, সর্পদংশনের প্রতিষেধক যে ঔষধ আমাদের রয়েছে, তা পশ্চিমের যে কোনো ঔষধের চাইতে বেশী কার্যকরী।" (দক্ষিণ ভিয়েতনামের বহু অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ার 'ডেথ অ্যাডার' সাপের মতো এক ধরনের মারাত্মক বিষধর সাপ দেখা যায়। লম্বায় একফুটের বেশী নয়। লক্ষ্যবস্তুর উপর এরা লাফিয়ে পড়ে। আক্রান্ত ব্যক্তি তিন মিনিটের মধ্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দু-ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। মুক্তিফ্রন্টের রাসায়নিকেরা বড়ির আকারে এক ধরনের প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করেছেন। প্রতিটি গেরিলাকেই নিজের নিজের আবশ্যকীয় সরঞ্জামের সংগে সেই বড়ির দুটি করে রাখতে হয়। প্রয়োজনের সময় যাতে তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে একটি বড়ি সর্বদা হাতের কাছে রেখে তবে আমি ঘুমোতে যেতাম। রাত্রিকালে দোলনা বিছানা ছেড়ে দূরে ঘোরাফেরা করতে আমাকে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সর্বদা বাতি ব্যবহার করতে বলা হয়েছিল।) পাশ্চাত্য ঔষধের বিকল্প হিসাবে ডাঃ কি উল্লেখ করলেন মহিষ এবং শুয়োরের শরীর থেকে নেওয়া ইনজেকশনের আকারে হেমোগ্লোবিন সিরাম; বাঘের হাড় থেকে তৈরী করা একটি ওষুধ, যা পুরাতন দুর্বলতার ক্ষেত্রে শক্তিশালী উদ্দীপকরূপে কাজ করে; নবজাত মহিষের গর্ভফুলের নির্যাস থেকে প্রস্তুত ম্যালেরিয়া এবং বাতরোগের একটি ভাল ঔষধ।

সামরিক তৎপরতার সময় তাঁর অঞ্চলে চিকিৎসার জন্য গড়পড়তা কতখানি সময় দেওয়া হয় এই প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ কি বললেন, "যে-কোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেই ৩০ মিনিটের মধ্যে কম্পানি চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়; এক ঘণ্টার ভিতরে ব্যাটেলিয়ন পর্যায়ের কোনো চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রথম শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়; এবং দু-ঘণ্টার মধ্যে রেজিমেণ্টাল হাসপাতালে মূল শল্য চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। অতি গুরুতররূপে আহতদেরই শুধু প্রধান

হাসপাতালে পাঠান হয়। নইলে, সাধারণতঃ অগ্রবর্তী রণাঙ্গনের হাসপাতালগুলোই সমস্ত রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। সামরিক অভিযানের স্থানটি আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষমতা অনুযায়ী মূল হাসপাতাল থেকে এক কিংবা দুই দিনের বেশী পথ না হলে, গুরুতররূপে আহতদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেখানেই। আর দূরত্ব.বেশী হলে, ফিল্ড হাসপাতাল বসাই। এই ফিল্ড হাসপালগুলো গুরুতর আহতদের শল্য চিকিৎসা করতে পারে, এবং প্রয়োজন হলে রোগীদের সেখানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরেও রাখা যায়।" ডাঃ কি'র হিসাব অনুসারে আহত ব্যক্তিরা একবার চিকিৎকদের হাতে পড়লে 'শতকরা ৯০ জনই বেঁচে যায়।' মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের দুটি ঘটনার কথা তিনি সগর্বে উল্লেখ করলেন; আমাকে বারংবার অনুরোধ করলেন রোগী দু'জনকে দেখতে। উভয় ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচার করে মস্তিষ্কের ভিতর থেকে বুলেট বার করা হয়; আহত দু-জনেরই অর্ধেক শরীর সম্পূর্ণরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে, একজন চলাফেরা করতে এবং স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে পারে। অপরজন নড়াচড়া করতে পারে, এবং ডাঃ কি নিশ্চিত যে সেও তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারবে।

স্পষ্টতই অতি উন্নত পর্যায়ের শল্য চিকিৎসা তথা অস্ত্রোপচারের পরবর্তী অবস্থায় সেবা-যত্নের কারণেই এই ধরনের সফলতা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু হাসপাতালের বাড়িগুলোর আদিম আকৃতি দেখে তাদের এই সমস্ত ব্যবস্থার কথা অনুমান করা অসম্ভব। শুধু তাই নয়, তরল এবং বড়ি তথা ইনজেকশনের আকারে ঔষধাদি প্রস্তুত করবার জন্য হাসপাতালটির নিজস্ব একটি বিভাগও রয়েছে। ডাঃ কি জানালেন, ঔষধাদির কিছু অংশ জনস্বাস্থ্য কমিটি কর্তৃক পরিচালিত একটি কেন্দ্রীয় ঔষধ সংরক্ষণ বিভাগ থেকে আসে।

পরে, ফরাসী শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ক রাসায়নিক ডাঃ হো থুর সংগে আমার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়। বিনয়ী পক্ককেশ এই বিজ্ঞানী হলেন মুক্তিফ্রণ্টের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন

সদস্য। প্রেসিডিয়ামের অন্যান্য সদস্যদের ভাষায়, ঔষধাদি সরবরাহের ব্যাপারে ইনি 'ভেলকি দেখিয়েছেন।' ডাঃ হো থু যখন আমাকে জানালেন যে, প্রয়োজনীয় ঔষধের শতকরা ৭০ ভাগ ফ্রন্ট নিজেই উৎপাদন করে, তখন বিস্মিত না হয়ে পারি নি। বললেন, "এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ, ঐতিহ্যগত প্রাচ্য ঔষধগুলো নিয়ে আমরা সযত্নে চর্চা করেছিলাম এবং আমাদের জংগলের উপজাত দ্রব্যাদির বিশাল ভাণ্ডারেব উপব ভিত্তি করে কাজ শুরু করেছিলাম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা নিজেবাই অবাক হয়ে গেছি ফলাফল দেখে। যেমন ধরুন, মাংস ও হাড়ের পচনশীল ক্ষতের প্রশ্নটা আমরা সমাধান কবে ফেলেছি।" কিভাবে সমাধান করা হয়েছে সে কথা জিজ্ঞাসা কবলে তিনি হেসে বললেন, "সেটা আমরা গোপন রেখেছি। কারণ ভবিষ্যতে এটা আমাদেব জাতীয সম্পদেব অন্যতম উৎস হবে বলে আমবা মনে করি। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, ঔষধটি একটি জংলী গাছ থেকে প্রস্তুত কবা হযেছে। স্থানীয় গাছ-গাছড়া, পশু এবং জংগলের উপজাত দ্রব্যাদিব একটি যথাযথ বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুত করে সেটিকে প্রাচ্যেব চিকিৎসা বিষয়ক প্রচীন গ্রন্থগুলোর সংগে মেলাবার পরই উপলব্ধি কবলাম, এ বিষযে আমবা কত উন্নত।" পচনশীল ক্ষত সম্বন্ধে এই সাফল্যেব ব্যাপাবে তখনো আমাকে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখে ডাঃ হো থু আবার বললেন, "জীব-জ... দেহের অংশবিশেষকে ইনজেকশনের উপযোগী জলীয় পদার্থে রূপান্তরিত করে প্রস্তুত করবার ব্যাপারে আমরা আরো বেশী সাফল্য অর্জন করেছি। ফ্রান্সে এটা তৈরী করতে হলে, যে কোনো ঔষধ প্রস্তুতকারক বাসায়নিককে বিশেষ সরকারী হুকুম নিতে হয়। কারণ এটা একটা অতীব জটিল প্রণালী, এবং এতে অতি জটিল সমস্ত সাজ-সরঞ্জামেব প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমরা আদিম পন্থাতেই এ ব্যাপারটির সমাধান করতে সমর্থ হয়েছি; এবং ফলও হয়েছে অতি উচ্চ মানের। ফরাসী ঔষধের চাইতে কোন অংশে হীন নয। এ ছাড়া প্লাজমার যথাযথ পরিপূরক স্বরূপ এক ধরণের সিরাম প্রোটিনও আমরা

আবিষ্কার করেছি।"

ডাঃ থু আরো জানালেন যে, সিরাম এবং টিকার বেশ বড় ভাণ্ডার তাঁদের রয়েছে, এবং টাইফাস, বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি রোগের যে কোনো 'সাধারণ' আকারের মহামারী আটকাবার মতো যথেষ্ট পরিমাণে এই সমস্ত টিকা সর্বদা হাতের কাছে মজুদ রাখা হয়। সায়গনে সম্প্রতি মহামারী আকারে কলেরা দেখা দেয় এবং সায়গন কর্তৃপক্ষ খুব আশা করেছিলেন যে মুক্ত অঞ্চলেও মহামারী ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ওই মজুদ ভাণ্ডার এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মুক্তিফ্রণ্ট সেই মহামারীকে থামিয়ে দেয়। ডাঃ থু আবার বললেন, "ম্যালেরিয়া হল চিরদিনই দক্ষিণ-ভিয়েতনামের গ্রামাঞ্চলের এক বিবাট সমস্যা। কিন্তু এই রোগের বিরুদ্ধে আমরা বিরাটাকারে অভিযান আরম্ভ করেছি। রোগের হারও অনেক কমে গেছে। আগে যে সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপক হারে ম্যালেরিয়া হত, বর্তমানে সেখানে তা কমে হয়েছে পাঁচ-শতাংশ। আশা করছি, এই হার আরো কমিয়ে আনতে পারবো। বস্তুতঃ স্থানীয় সংগতির ব্যবহার করে এবং জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতায় এ রোগটাকে একেবারে নির্মূল করে দিতে পারবো বলেই আশা রাখি আমরা।"

মুক্তাঞ্চলে বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এবং মজার কথা হল, সায়গন-নিয়ন্ত্রিত এলাকা তথা খোদ সায়গন থেকেও বহু লোক চিকিৎসার জন্য মুক্তাঞ্চলে আসে। একাধিকবার এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল ১৯৬৪ সালে সায়গনে কলেরা মহামারীর সময়ে। সেই সময়ে হাজারে হাজারে লোক কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকসন নিতে মুক্তাঞ্চলে এসেছিল। ডাঃ থু বললেন, "শুধু যে আমাদের বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসার জন্যই তারা আসে তা নয়। চিকিৎসাবৃত্তির প্রতি আমাদের দায়িত্বশীল মনোভাব এবং সেবাব্রতের প্রতি আমাদের কর্মীদের গভীর অনুরাগও এর অন্যতম কারণ। জনসাধারণের সেবাব্রতে কর্মীদের আমরা বিশেষ-ভাবে শিক্ষা দিয়েছি। মুক্তাঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে যে সমস্ত

জিনিসের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হল সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, রোগ প্রতিষেধক ঔষধ, জীবন ধারণের উন্নত মান এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মনে স্বাস্থ্য বিষয়ে আধুনিক মনোভাবের প্রসার। বস্তুতঃ অতি অল্প সময় এবং অতীব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ঔষধ প্রস্তুত শিল্পের সম্প্রসারণ. চিকিৎসার ব্যাপারে নিযুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং হাসপাতাল তথা জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে অতি দ্রুত উন্নতি সাধন করা হয়েছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অস্ত্র-শস্ত্র এবং সেনাবাহিনীর আনুপাতিক হার ও রণকৌশল

দ্রুত সংপ্রসারণের ক্ষেত্রে মুক্তিফ্রণ্টের সশস্ত্র বাহিনী অন্যান্য বিভাগগুলোর চাইতে স্বভাবতই পিছিয়ে থাকে নি। ফ্রণ্টের সৈন্য সংখ্যা বাস্তবিক কত তা'হল গোপনীয় বিষয়। কিন্তু আমেরিকার হিসাব অনুযায়ী যে সর্বাধিক সংখ্যার কথা কাগজে প্রকাশিত হতে দেখেছি, প্রকৃত সংখ্যা যে তার চাইতে বেশি, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। লিবারেশন ইয়ুথ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি দাঙ থান ছন্ আমাকে বলেছিলেন যে ষোল থেকে পঁচিশ বছর বয়সের ৫০০০,০০০ যুবক হল ফেডারেশনের সদস্য। এদের মধ্যে ১০০০,০০০ যুবক 'ফ্রণ্টের সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য সংস্থায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আপন-আপন গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিল।' স্থানীয় স্বয়ং-প্রতিরক্ষী দলগুলোকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। এবং ছন্ বলেছিলেন, গ্রামে বসবাসকারী ফেডারেশনের অন্ততঃপক্ষে অর্ধেক সদস্য হল ওই স্বয়ং-প্রতিরক্ষী দলগুলোর তালিকাভুক্ত। চোখে পুরু কাচের চশমা, ধীর এবং আন্তরিকতাপূর্ণ যুবক ছন্, তাঁর সংস্থার প্রধান প্রধান যে আশু কর্তব্যগুলোর কথা বলেছিলেন, তা হল :

মুক্ত অঞ্চলে সর্বাধিক সংখ্যক যুবকদের ফ্রণ্টের নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী এবং গেরিলাদলে ভর্তি করা।

সায়গন-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যুবকদের যে বলপূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি করবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার বিরুদ্ধে জোরদার সংগ্রাম চালানো।

সায়গন-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের যুবশক্তির কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা,

যাতে তারা মুক্ত অঞ্চলে চলে আসে এবং ফ্রণ্টের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করে।

সায়গন-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'গুলোকে ভেঙে ফেলার কাজ জোরদার ভাবে চালিয়ে যাওয়া।

মুক্ত অঞ্চলের 'প্রতিরোধ' অথবা 'সংগ্রামী' গ্রামগুলোকে পুনর্বিন্যাস দ্বারা শক্তিশালী তথা উন্নত করা।

হুয়েন হু থো'র হিসাব অনুসারে, সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে ১৯৬১ সালে সায়গন বাহিনীর মোট সৈন্য সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৭০,০০০ সেখানে ১৯৬৩ সালের শেষ নাগাদ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৭৭,০০০। এই প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন, "ওদের সেনাবাহিনী খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে সে কথা ঠিক; কিন্তু আমাদের বাহিনী বৃদ্ধি পেয়েছে তার চাইতেও তাড়াতাড়ি। শত্রু সৈন্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুপাত দ্রুত কমে আসছে; এবং প্রতিদিন সেই কমতির অনুপাত পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের অনুকূলে। এই প্রক্রিয়াকে বিপরীতমুখী করা অসম্ভব। ওদের সৈন্য সংগ্রহের এলাকাগুলো প্রতিদিন সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এবং, মনোবলের ক্ষেত্রে আমরা ওদের সম্পূর্ণরূপে পিছনে ফেলে এসেছি।"

ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী যে কত দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে আমি যে রেজিমেণ্টটি দেখেছিলাম তাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। মাত্র ৩০০ জন লোক এবং ১২০টি রাইফেল নিয়ে, ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে এই রেজিমেণ্টটি গঠিত হয়েছিল। তাও আবার রাইফেলগুলো ছিল হয় স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত, অথবা পূর্বতন সশস্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক সাহায্য হিসাবে প্রদত্ত পুরোনো ফরাসী 'ধাঁচের'। রেজিমেণ্টটি গঠিত হবার এক মাসের মধ্যেই তাদের প্রথম সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। সে লড়াইয়ে তারা তিনটি মেশিনগান ও পঁচিশটি রাইফেল কেড়ে নেয়, একজন জেলা কমাণ্ডারকে নিহত করে এবং তার সহকারীকে বন্দী করে। এক বছর ধরে তারা প্রতি মাসে অন্ততঃপক্ষে একটি করে অভিযান

চালিয়ে যায়। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসী অভিযান ছিল সায়গনের নিকটস্থ ত্রাঙ হোয়া ছত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপর ১৯৬২ সালের জুন মাসের আক্রমণ। এতে তারা প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র হস্তগত করে। তারপর, নিজেদের সাফল্য-অসাফল্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে, ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে তারা চার মাসের জন্য একটি রাজনৈতিক তথা প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে চলে যায়।

উপরে যে রেজিমেণ্টটির কথা বলেছি, তার অধিনায়ক হলেন ৩৮ বৎসর বয়স্ক, ঋজু, সৈনিকোচিত চেহারার একজন প্রাক্তন গেরিলা নায়ক। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "একটিমাত্র সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে আমরা অসফল হয়েছি বলে মনে করি। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কম্বোডিয়া সীমান্তের নিকটস্থ তে-নিন প্রদেশের বা-টুক্'এর দুর্গ আমরা আক্রমণ করি। সেখানে তিনটি ঘাঁটি ছিল। দু'টিকে ধ্বংস করে ফেলি, পঁচিশটি কামান অধিকার করি, ও কুড়ি জনকে বন্দী করি। কিন্তু এই অভিযানকে সফল বলতে আমরা নারাজ; কারণ সবগুলো ঘাঁটি ধ্বংস করা হয় নি এবং আমাদেরও কিছু হতাহত হয়েছিল। যদিও আমাদের মনোবল ছিল অক্ষুণ্ণ, এবং এই শিক্ষাটিকে আমরা ভবিষ্যতের ব্যর্থতা এড়াবার কাজে ব্যবহার করি। আসলে আমাদের প্রস্তুতি যেমন নিখুঁত হওয়া উচিত ছিল তেমন হয় নি।"

রেজিমেণ্টটির অন্যান্য সামরিক অভিযানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের অভিযান। মার্কিন উপদেষ্টাদের কার্যালয় আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে ওই দিন তারা তে-নিন শহরে প্রবেশ করে। ৫ জন আমেরিকান নিহত ও ৩ জন আহত হয়। সেই প্রসঙ্গে অধিনায়ক বলেন, "আমেরিকানদের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত প্লেটুনটির বহু হতাহত হয়েছিল। অবশিষ্ট লোকগুলোকে কর্তব্যে ব্যর্থতার অপরাধে তারা বন্দী করে এবং প্লেটুনটি ভেঙে দেয়।"

রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে

রেজিমেণ্টটির চার মাসের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবার সিদ্ধান্তটি হল ফ্রন্ট সেনাবাহিনীর চরিত্র তথা এই যুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্যমূলক দৃষ্টান্ত। এর অর্থ হল, যে অঞ্চলে তৎপরতা চালাতে হবে, সেই অঞ্চল সম্বন্ধে ১৯৬২ সালের শেষভাগে তারা নিজেদের 'সম্যকরূপে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল।' অর্থাৎ, কখন এবং কোথায় সংঘর্ষ হবে সেটা স্থির করবে তারাই, সায়গন নয়।

অধিনায়ক আবার বলেছিলেন, "প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হবার পর, কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠল। সমগ্র সংগ্রামের পটভূমিকায় নিজেদের উদ্দেশ্যকে আরো ভালো-ভাবে দেখতে পেলাম। আমাদের লোকজনদের রাজনৈতিক চেতনা দৃঢ়তর হল এবং তাদের মনোবল আরো বর্ধিত হল। পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের প্রথম অভিযান হল ১৯৬৩ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে। কে-সাম-জো দুর্গটি আক্রমণ করা হল। সেখানকার গ্যারিসনটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম। আরো তিনটি ঘাঁটি থেকে শত্রুপক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হল "

পরবর্তী এক বৎসরে উক্ত রেজিমেণ্ট চৌদ্দটি সামরিক অভিযান চালায়। শেষটি ছিল দুই দিনব্যাপী এক সামরিক তৎপরতা। উক্ত অভিযানে, একটি ব্যাটেলিয়ানের সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যাওয়া হয়। এই আক্রমণের ফলে তিনটি শত্রুঘাঁটি নিশ্চিহ্ন হয় এবং শত্রুনিয়ন্ত্রিত 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালের শেষ নাগাদ জনবল এবং অস্ত্র-শস্ত্রে রেজিমেণ্টটি পরিপূর্ণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদের বর্তমান অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে প্রায় ছয় শ'টি হল অধিকৃত মার্কিন অস্ত্র। তার মধ্যে রয়েছে ৩৭ মি. মি. মেশিনগান। এই অস্ত্র, হেলিকপ্টার ও বিমানের বিরুদ্ধে সার্থক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর রয়েছে ৫৭ মি. মি. রিকয়েললেস কামান। ট্যাংক এবং সশস্ত্র ঘাঁটিগুলোর বিরুদ্ধে এদের কার্যকারীতা অপরিসীম। অবশিষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র নির্মিত হয়েছে স্থানীয় অস্ত্র নির্মান কারখানায়। মার্কিন অস্ত্রগুলোর অধিকাংশই অধিকার করা হয় প্রথম বারো মাসে।

১৯৬৩ সালে ইউনিটির কাছে অধিকৃত অস্ত্রের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মজুত ছিল। 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'গুলো ভেঙ্গে দেবার পর যে স্বয়ং প্রতিরক্ষী ইউনিটগুলো গঠিত হয়েছিল, বাকী অস্ত্র-শস্ত্র সমস্ত তাদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালের শুরু থেকে, একমাত্র ভারী অস্ত্র-শস্ত্র এবং বিশেষ কাজে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ছাড়া, সমস্ত অধিকৃত অস্ত্রই ভাগ করে দেওয়া হয় স্বয়ং প্রতিরক্ষী ইউনিট-গুলোর মধ্যে। পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী এই ধরণের রেজিমেণ্ট-গুলোকে বেশ ছোটই বলতে হবে। তিন ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত মোট সৈন্য সংখ্যা সম্ভবতঃ এক হাজারের খুব বেশী হবে না। কিন্তু প্রতিটি সৈনিক প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা হবার দরুণ, এই ধরণের রেজিমেণ্টের লড়াই করবার ক্ষমতা অনেক বেশী।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে আলোচ্য রেজিমেণ্টটির কর্ম-ক্ষমতা তিন গুণ বৃদ্ধি পায়; এবং শুরুতে যে অস্ত্র-শস্ত্র ছিল তাদের প্রতিটির পরিবর্তে পাঁচটি করে আধুনিক অস্ত্র এরা অধিকার করে। সমস্ত ফ্রণ্ট ইউনিটগুলোতে যা ঘটেছে, তাতে এই আনুপাতিক হিসাব আমার মনে হয় যথার্থ। সায়গনের মার্কিন হাইকমাণ্ডের সমস্যা যে কত বিরাট, তা এ থেকেই বোঝা যায়। জেনারেল ম্যাকসওয়েল টেলর তথা পেণ্টাগনের সর্বোচ্চ সামরিক পণ্ডিতদের আদিতে ধারণা ছিল যে, গেরিলা যুদ্ধে, প্রতি-গেরিলা সামরিক তৎপরতার শুরুতে প্রতি একজনের জন্য দশ অথবা এগারো জনের সংখ্যা গরিষ্ঠতার প্রয়োজন।

১৯৬১ সালের শেষ দিকে, জেনারেল পল ডি হারকিন্স-এর অধীনে সায়গণে একটি মার্কিন কমাণ্ড স্থাপিত করে আমেরিকা যখন বিরাটাকারে দক্ষিণ ভিয়েতনামে নাক গলায়, দিয়েমী সেনাবাহিনীর সংখ্যা গরিষ্ঠতার হার তাদের হিসেব মত তখন ছিল প্রতি একজন পিছু দশ জনের মত। মনে হয় এই হিসেবে খুব একটা ভুল ছিল না। জেনারেল হারকিন্সের পরিকল্পনা ছিল এই অনুপাতিক হারকে ১৯৬২ সালের শেষ নাগাদ ১ : ২০ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পৌঁছে দেওয়া। মালয়ে

ব্রিটিশ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ওই পণ্ডিতদের দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে, অবশিষ্ট প্রতিরোধ শক্তিকে ছয় মাসের মধ্যে নির্মূল করে দেওয়া যাবে। তাঁদের আরো আশা ছিল, সায়গন-বাহিনীর দ্রুত সম্প্রসারণ করে, সংখ্যা গরিষ্ঠতার এই অনুপাত আরো বৃদ্ধি করবেন এবং সেই সংগে গেরিলাদের অধিকাংশকেই ধ্বংস করা হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কোন দিনই তাঁরা পৌঁছুতে পারেন নি। বরং পলাতকের হার আরো দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এবং গেরিলা বাহিনী হ্রাস হবার পরিবর্তে আরো সম্প্রসারিত হয়। মার্কিন কমাণ্ডের ওই প্রথম বৎসরের প্রচেষ্টার মোট ফল হয়েছিল এই যে, ১ : ১০ সংখ্যা গরিষ্ঠতার অনুপাত কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১ : ৬ কি ৭ জনে।

১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে অনুপাতের হার যে কি দাঁড়িয়েছে, তা হল ফ্রণ্টের অন্যতম গোপনীয় বিষয়। কিন্তু তা যদি জনপ্রতি চার [illegible] পাঁচ [illegible] বেশী হয় তাহলে [illegible] আশ্চর্য হব। এব এ হিসাব [illegible] [illegible] সৈনিক বাহিনীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। স্থানীয় [illegible] [illegible] গেরিলা দলগুলো যে সমস্ত সাফল্য [illegible] [illegible] [illegible], তাদের কথা ধরলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, [illegible] [illegible] মোবাইল [illegible] বাহিনী মোটামুটি ভাবে সমসংখ্যার [illegible] প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে ক্রমশঃ বেশী করে বাধ্য হচ্ছে। আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি [illegible] পার্থক্য অকেজো হয়ে গেছে মনোবলের শক্তির উৎকর্ষতার কাছে। গতি-শীলতার উৎকর্ষতা বাতিল হয়ে গেছে গোয়েন্দাগিরির উৎকর্ষের সামনে। ফ্রণ্ট বাহিনী যদি সত্যসত্যই যুদ্ধ করতে চায়, তা হলে তাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হবার জন্য দিন [illegible]—এমন কি [illegible] ঘণ্টার অগ্রিম বিজ্ঞপ্তিই যথেষ্ট।

এর আগে একাধিকবার আমি ফ্রণ্টের সংবাদ আদান-প্রদানের সূত্র সেই ছোট ছোট খামগুলোর ভিতরের চিরকুটের কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, ফ্রণ্টের

যোগাযোগ তথা তথ্য আদন-প্রদানের ব্যবস্থা কেবলমাত্র উক্ত থাম-গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ ফ্রণ্টের নিয়মিত বাহিনীগুলোতে রয়েছে মার্কিন যোগাযোগের সরঞ্জাম, ফিল্ড টেলিফোন এবং বেতার ব্যবস্থা। প্রথম দিকের লড়াইগুলোতে প্রায়ই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হত যে, কমাণ্ড পোস্ট ও আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন রকম যোগাযোগ থাকত না। কিন্তু সে অবস্থা বর্তমানে আর নেই।

রণকৌশলের ক্রম বিবর্তন

রণকৌশল তথা প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও ফ্রণ্টের সুদৃঢ় ক্রমবিবর্তন কম আকর্ষনীয় নয়। প্রথম দিকের রণ-কৌশল ছিল বাঁশের সূচালো খোঁটা দিয়ে প্রতিরোধাত্মক তৎপরতা। অর্থাৎ শত্রুকে গৃহ অথবা বাগিচায় প্রবেশ করতে না দেওয়া। কিন্তু তাকে গ্রাম কিংবা ছোট-ছোট বসতি এলাকায় প্রবেশে বাধা দেবার কোন প্রচেষ্টা অথবা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল না। তারপর এল, গ্রামের প্রবেশ-পথগুলোতে সূচাল খুঁটিযুক্ত ফাঁদ পাতা, এবং আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ছোট খাটো সংঘর্ষ। কিন্তু তাও কেবলমাত্র শত্রুকে গ্রাম থেকে দূরে রাখা এবং নেহাৎ গ্রামে এসে পড়লে তাকে সার্থকভাবে আঘাত হানা, এই কৌশলের মধ্যেই সীমিত ছিল। তারপর শুরু হল, শত্রু যাতে কোন বিশেষ গ্রাম কিংবা জেলায় শক্তি সমাবেশ করতে না পারে তার জন্য বিভিন্ন দিকে সামরিক তৎপরতা শুরু করে তাকে অন্য দিকে টেনে নিয়ে যাবার কৌশল। এবং যুদ্ধ যেমন যেমন বিস্তারলাভ করতে লাগল ও 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' তৈরী করে সেগুলোকে কেবলমাত্র সেনাবাহিনী দিয়ে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে চারিপাশে সৈন্যঘাঁটি বসানো হল, তখনই আরম্ভ হল অগ্রগতির দিকে আর একটি বিরাট পদক্ষেপ—সৈন্য ঘাঁটিগুলোরে উপর নৈশ আক্রমণ। প্রথম প্রথম এ আক্রমণ চালাত কেবলমাত্র ছোট ছোট বসতি ও গ্রামপর্যায়ের স্বয়ং-প্রতিরক্ষী বাহিনী। কিন্তু বসতি অথবা

গ্রামে আসবার আগেই যখন শত্রুকে আঘাত হানবার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন স্থানীয় সৈন্য ঘাঁটিগুলোর রক্ষার্থে আগত প্রতিপক্ষের আঞ্চলিক বাহিনীর মোকাবিলা করবার জন্য ফ্রণ্টের ও দরকার পড়ল আঞ্চলিক বাহিনীর। এবং বিরাটাকারে সর্বাত্মক আক্রমণের উদ্দেশ্যে যখন পাঠান হত সায়গনের মোবাইল রিজার্ভ বাহিনীকে, তখন তাদের মোকাবিলার জন্য ফ্রণ্টেরও প্রয়োজন হত নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর।

দ্রুত নৈশ আক্রমণের কৌশল ততটা কার্যকরী ছিল না। কারণ, আক্রমণকারীদের খুঁজে বার করবার জন্য পরের দিন সকালেই পাঠানো হত বিরাট বিরাট হেলিকপ্টার বাহিনী। সে সময়টা ছিল ফ্রণ্টের পক্ষে সত্যই সংকটকাল। সেই সংকটের সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল আপ-বাক-এর লড়াইয়ে। বর্তমান যুদ্ধের গতিপরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে আপ-বাক-এর লড়াইয়ের। সুতরাং, বিস্তারিতভাবে এর উল্লেখ করা দরকার।

১৯৬৩ সালের নববর্ষের দিনে মার্কিন টহলদারী বিমানগুলো সায়গনের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত মাই-থো প্রদেশের আপ-বাক গ্রামের কাছাকাছি প্রায় ১০০ ভিয়েতকং গেরিলাদের দেখতে পায়। জানুয়ারী মাসের ৩ তারিখে ছিল নো দিন দিয়েমের জন্মদিন। স্থির হল, ভিয়েতকংদের যে দলটিকে দেখা গেছে, সেটিকে নিশ্চিহ্ন করে এবং উক্ত অঞ্চলের সমস্ত গেরিলাঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েমকে তাঁর জন্মদিনে একটি বিশেষ উপহার প্রদান করা হবে। ২রা জানুয়ারী রাত ২টায়, আপ-বাক গ্রামের ঠিক উত্তর দিকে অবস্থিত ছোট ছোট বসতিগুলোতে একটি সাঁজোয়া জলযান থেকে সপ্তম ক্র্যাক ডিভিশনের সৈন্যদের নামানো শুরু হল। তারপর ট্রাকের একটি কনভয় থেকে আর একদল সৈন্য নামিয়ে দেওয়া হল দক্ষিণ দিকে এক চৌরাস্তায়। ভোর ৫ টা নাগাদ সাঁজোয়া গাড়ি ও এম-১১৩ উভচর ট্যাংকগুলো উক্ত বসতি ঘিরে অবস্থিত সৈন্যঘাঁটিতে সৈন্য নিয়ে যেতে শুরু করে। সকাল ৫-৩০ মিনিটে হেলিকপ্টারগুলো উত্তর দিকে নামিয়ে দিল

আরো সৈন্য ; এবং সকাল ৬ টায় আর একটি দল স্থলপথে গ্রামের পূর্বদিকে উপস্থিত হয়ে গ্রামটিকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য দলের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করতে শুরু করে।

উক্তস্থানের মুক্তি ফৌজের ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডার ছিলেন হুয়েন। ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশ বৎসরের চাইতে সামান্য বেশী ; সুন্দর চেহারা ; মাথা ভরতি এক রাশ কালো চুল। তাঁর অধীনে ছিল দুটি কম্পানি আর একটি প্লেটুন ; সব মিলিয়ে প্রায় দু'শ সৈন্য। তাঁর বক্তব্য অনুসারে দিয়েমীরা এনেছিল ৭নং ডিভিশন থেকে তিনটি ব্যাটেলিয়ন, রেঞ্জার্সদের দুটি কম্পানি, সিভিল গার্ডস-এর চারটি কম্পানি, সেলফ্ ডিফেন্স কোর-এর চারটি কম্পানি, তেরোটি এম-১১৩ ট্যাংকের একটি স্কোয়াড্রন, ছয়টি ১০৫ এম. এম. কামান এবং ১০৬ এম. এম. মর্টারের একটি কম্পানি। ঠিক ভোর ছ'টার সময় বিমানবহর এবং কামানগুলো মুক্তি ফৌজের ঘাঁটি লক্ষ্য করে ভয়ংকর বোমাবাজি শুরু করে দিল। ফ্রণ্টের ঘাঁটিগুলো ছিল এক মাইলের উপর লম্বা ও ৩৫০ গজ চওড়া একটি স্থানে মাটির নীচে। পরস্পরের সংগে যুক্ত বহু পরিখা চলে গিয়েছিল নারকেল বাগান ও বাঁশ বনের মধ্যে অবস্থিত বন্দুক দাগার জায়গাগুলো পর্যন্ত। দিয়েমী বাহিনীর দায়ীত্বে ছিলেন ৭নং ডিভিশনের কমাণ্ডার, কর্নেল বুই দিন দাম। সকাল ৬-৩০ মিনিটে বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীর বোমা-বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং সিভিলগার্ড'এর দুটি কম্পানি ধান ক্ষেতের হাঁটু পর্যন্ত কাদা ভেঙে আক্রমণ শুরু করল।

হুয়েন বললেন, "যতক্ষণ না শত্রুর প্রথম লাইনটি মাত্র কয়েক গজের মধ্যে এবং শেষ লাইনটি গুলির আওতায় আসল, ততক্ষণ আমাদের সৈন্যরা গুলি চালায় নি। তারপর তাদের অস্ত্রগুলো সক্রিয় হয়ে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরেই প্রায় চল্লিশ জন শত্রুসৈন্য হতাহত হল ; পিছু হটল তারা। সেই সময় থেকে ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত আক্রমণ হল আরো তিন বার। প্রতিটি আক্রমণের পূর্বেই হল যথারীতি বিমান ও কামান থেকে প্রচণ্ড বোমাবাজি। চতুর্থ বারের

আক্রমণে দিয়েমীরা দুই প্লেটুন সৈন্য পাঠাল পার্শ্বদেশ আক্রমণের উদ্দেশ্যে ; এবং সেই সংগে প্রধান বাহিনী আবার আক্রমণ চালালো মধ্যভাগে। প্রতিটি আক্রমণকেই প্রতিহত করলাম আমরা। ততক্ষণে শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় এক শ' জন। এই ভাবে শেষ হল লড়াইয়ের প্রথম পর্ব।

"দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল সকাল ৮টা থেকে ৮-৩০ এর মধ্যে ; এবং মোট তিন বার আক্রমণে শত্রুপক্ষ নিযুক্ত করল দুটি কোম্পানিকে। প্রতি-আক্রমণে আমরা ব্যবহার করলাম দুটি প্লেটুন। ফল হল, অগ্রবর্তী লাইন থেকে দিয়েমীরা হটে গেল প্রায় আধ মাইল পিছনে। এই বারের আক্রমণে ওরা ব্যবহার করে ১৫টি হেলিকপ্টার এবং রণক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে সৈন্য নামাবার চেষ্টা করে। প্রথম থেকেই এই রকম একটা-কিছু আমরা আন্দাজ করেছিলাম। আমাদের ৩৭ এম. এম. ভারী মেশিনগানগুলো তৎপর হয়ে উঠল এবং সংগে সংগে তিনটি হেলিকপ্টারকে গুলি করে নামাল। বাকীগুলো উঁচুতে উঠে চেষ্টা করতে লাগল সরে পড়বার। কিন্তু ঠিক উত্তরে অবস্থিত ভ্যান্ নামক বসতির উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় আবো দুটিকে গুলি করে নামানো হল। আধ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর দিক থেকে শুরু হল আমাদের আক্রমণ ; এবং দিয়েমীদেব লোকক্ষয় হল ৬০ থেকে ৮০ জন। সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না ; কারণ মৃতদেহগুলো পড়েছিল ধান ক্ষেতের মধ্যে, এবং ঠিক তার পরেই শুরু হয়েছিল বিমান এবং কামান থেকে বোমাবাজি। ফলে আমাদেব সৈন্যদের মাথা নীচু করে থাকতে হয়।

"দ্বিতীয় পর্যায়ে আক্রমণকারীরা পিছু হটবার সংগে সংগে শুরু হল আরো কামানদাগা এবং বোমাবর্ষণ। তারপর চারটি নতুন কোম্পানি নিয়ে ওরা আরম্ভ করল তৃতীয় পর্যায়ের আক্রমণ। আমরা নিযুক্ত করলাম একটি কোম্পানিকে। এই পর্যায়ে ওরা আক্রমণ করল চার বার। শেষ বারে ওদের একটি কোম্পানি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এই বারকার লড়াইয়ে হল আমাদের প্রথম ক্ষয়-ক্ষতি ;

নিহত এক এবং আহত দুই। তা ছাড়া, ভয়ংকরভাবে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ ও কামান দাগার ফলে, পরিখা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে শত্রুর অস্ত্র-শস্ত্রগুলো সংগ্রহ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

"তৃতীয় পর্যায়ের আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর, থার্ড আর্মি কোর-এর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হুইন ভ্যান কাও নিজে ক্যান-থো থেকে এসে লড়াইয়ের ভার নিলেন। প্রচণ্ড কামান দাগা হল। কুড়ি মিনিটে দাগা হল দুই শয়ের উপরে গোলা। তারপর আটটি পদাতিক কোম্পানিকে রণাঙ্গনের মধ্যভাগে নামিয়ে দেওয়া হল। প্রথম ঢেউটি আমাদের অবস্থানের এক শ' গজের মধ্যে এলো, গুলি চালালো, তারপর পিছু হটে গেল। দ্বিতীয় বারের বল্লমাকার আক্রমণে, আগে আগে এলো এম-১১৩ ট্যাংকগুলো। তাদের পিছনে পিছনে এলো পদাতিক বাহিনী। ত্রিশ কিংবা চল্লিশ গজের ভিতরে না আসা অবধি আমরা চুপ করে রইলাম। তারপর শুরু করলাম গুলি বর্ষণ। আমাদের 'ইস্পাতধারী দল' ট্যাংক-বিধ্বংসী বোমা চালাবার অস্ত্র নিয়ে পরিখার বাইরে বেরিয়ে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখা গেল চারটি এম-১১৩ ট্যাংক দাউ দাউ করে জ্বলছে। আরো চারটি গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হল। আমাদের 'ইস্পাতধারী দলে'র মাত্র দুটি ছেলে এই অসমসাহসিক সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দিল। চতুর্থ পর্যায়ের আক্রমণ যখন দুপুর নাগাদ শেষ হল, তখন শত্রুপক্ষ এক মাইল পিছনে হটে গেছে।

"দাম এর চাইতে ভ্যান কাও এমন কিছু বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। মোট কুড়িটি হেলিকপ্টারের মধ্যে দাম হারিয়েছিলেন পাঁচটি, এবং জখম হয়েছিল আরো আটটি। কিন্তু কাও তেরটি উভচর ট্যাংকের মধ্যে আটটিকে অকেজো করাতে সফল হলেন। সুতরাং এবার নিজে যুদ্ধ পরিচালনার ভার নিতে সায়গন থেকে এলেন দিয়েমী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল লি ভ্যান তাই। সঙ্গে নিয়ে এলেন ফার্স্ট এয়ারবোর্ন ব্যাটেলিয়ন এবং অবশিষ্ট সৈন্যদের সংগঠিত করলেন নতুন করে। মধ্য এবং

উত্তর দিক থেকে দুটি বিরাট আক্রমণের মধ্যে প্রথমটি তিনি শুরু করলেন বেলা ৩টায়। কিন্তু দুটিই ব্যর্থ হল। বিকাল ৫টায় লড়াই হল শেষ।

"চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্যায়ের আক্রমণের মধ্যে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত এম-১১৩ ট্যাংকগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য আমেরিকানরা যন্ত্রবিদ্‌দের পাঠায়। আমরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতেই, ওদের নিজেদের গোলন্দাজেরাও কামান দাগতে শুরু করে দেয়। হয় আমাদের, নয় তাদের নিজেদের গুলিতেই আহত হল বহু আমেরিকান। মার্কিন 'উপদেষ্টা' অফিসাররা আহত আমেরিকানদের সেখান থেকে নিয়ে আসবার জন্য ভিয়েতনামী সৈন্যদের আদেশ করে। কিন্তু কেউ সে আদেশ মানে নি। অবশেষে ট্যাংক-সারাই দলটিকে উদ্ধার করবাব জন্য আমেরিকানরা নিজেদের পাচক, মিস্ত্রি এবং অন্যান্য লোকজন পাঠাতে বাধ্য হয়! এই ব্যাপারে পরে কয়েকজন দিয়েমী অফিসারের সামরিক আদালতে বিচারও হয়েছিল।"

সেই রাতেই বারোটা নাগাদ ফ্রন্টবাহিনী পিছু হটল। এবং পরদিন খুব ভোর থেকে আরো বিমান আক্রমণ চালিযে ও কামান দেগে, বেলা দশটায় দিয়েমী সৈন্যরা প্রতিরক্ষা পরিধির মধ্যে ঢুকে দেখলো স্থানটি আগেই পরিত্যক্ত হযেছে। ফ্রন্ট বাহিনী তখন বিশ্রাম নিচ্ছে প্রায় দু-মাইল দূরে একটি স্থানে। তাদের মোট ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে নিহত হয়েছিল তেরো জন। এর মধ্যে আট জন ছিল এম-১১৩ ট্যাংকের বিরুদ্ধে আক্রমণে অংশগ্রহণকারী 'ইস্পাতধারী' দলের। এবং আহত হয়েছিল পনের জন। পক্ষান্তরে, দুয়েন-এর বক্তব্য অনুসারে, দিয়েমীদের হতাহত হয়েছিল চার শ' জন। মার্কিন সংবাদপত্রগুলো এই পরাজবের ব্যাপকতা গোপন করবার কোনো চেষ্টা করে নি। তারা স্বীকার করে যে, প্রতি একজন ভিয়েতকং-এর বিরুদ্ধে অন্ততঃ পক্ষে দশ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিযে এবং তাদের সুবিধাজনক স্থানে এই অভিযান চালাবার জন্য তিন হাজারের উপর

সৈন্য নিয়োগ করা হয়। আপ-বাক'এর এই লড়াইকে তারা আখ্যা দিয়েছিল 'বিপর্যয়কারী পরাজয়' বলে'। হুয়েন বললেন, পয়লা জানুয়ারি তারিখে সন্ধ্যা সাতটার সময় তাঁকে এই আক্রমণের সংবাদ দেওয়া হয়। সেই অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে দ্রুত প্রেরণ করা হয় নিয়মিত বাহিনীকে; এবং সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয় রাত দুটোর ভিতরে।

একটু দম নিয়ে আবার বললেন, "এই লড়াইয়ের ফলাফল আমাদের কাছে ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমরা যে হেলিকপ্টার কৌশলকে বিপর্যস্ত করতে পারি, তা প্রমাণিত হল। আরো দেখা গেল, স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েও আমরা বিরাট সংখ্যক শত্রু বাহিনীর সার্থক মোকাবিলা করতে পারি।"

আপ-বাক'এর লড়াই এই যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করে দেয়। এই লড়াইতেই দেখা যায়, ফ্রন্ট সেনাবাহিনী 'উপযুক্ত' হয়ে উঠেছে। এর পরেই সায়গন বাহিনীর কতগুলো বিপর্যয়কর পরাজয় ঘটে। ফলে, তাদের মনোবল ভয়ানকভাবে ভেঙে পড়ে; এবং শেষ পর্যন্ত দিয়েমী শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে। আপ-বাক'এর পরই মার্কিন ভাষ্যকারগণ, দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধ কখনো জেতা যাবে কিনা, সে বিষয়ে সর্বপ্রথম চিন্তা করতে শুরু করেন।

আপ-বাক'এর লড়াইয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পর, নতুন একটা কৌশল আবিষ্কার করা হয়েছিল। সেই কৌশলের মোকাবিলা করতে সায়গন কমাণ্ডকে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলের চুঅং থিয়েন প্রদেশের লক-নিন-এর যুদ্ধে এই কৌশলকে সর্বপ্রথম পরীক্ষা করে দেখা হয়। আমেরিকার সরকারী ভাষ্য অনুসারে, গোয়েন্দা বিভাগের নিখুঁত সংবাদের উপর নির্ভর করে তারা তিন শ' জনের একটি ভিয়েতকং ব্যাটেলিয়নকে ফাঁদে ফেলে। কিন্তু তাদের শেষ করতে গিয়ে নিজেরাই প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করে পরাস্ত হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, ফ্রন্ট ফৌজ ইচ্ছাকৃত ভাবেই লড়াইটা বাধিয়ে ছিল। বস্তুতঃ, এটা ছিল 'শত্রু ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন তথা

শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করা'র একটি কৌশল। এই কৌশলকে পরে বারংবার কাজে লাগানো হয়।

১৯৬৩ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে গেরিলারা লক-নিন গ্রামকে পরিবেষ্টন করে স্থাপিত ছয়টি শত্রু ঘাঁটির মধ্যে একটির ওপর আক্রমণ চালায়। গ্যারিসনটি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করলে, তারা ঘাঁটিটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পরের দিন হেলিকপ্টারে করে সেনাবাহিনী আসে, কিন্তু গেরিলাদের দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত দেখে সরে পড়ে। সেই রাতেই আরো দুটি ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালান হয় এবং একটি সেতু ধ্বংস করা হয়।

লক-নিন-এর অভিযানে অংশ গ্রহণকারী জনৈক ছিপছিপে, তোবড়ানো-গাল, অভিজ্ঞ কোম্পানি কমাণ্ডার পরে আমাকে বলেছিলেন, "এতগুলো ঘাঁটি ধ্বংস করায় শত্রুপক্ষে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে, তা আমরা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে অনুমান করেছিলাম। আরো শক্তি সংগ্রহ করে তারা আসবেই। এবং আমরাও তাই চাই। ঠিক করলাম, লক-নিন গ্রামের কাছে পরিত্যক্ত বা-আই বসতিতে আমরা তাদের অভ্যর্থনা করব। এবং এ কথাটা আমরা গোপন রাখলাম না। প্রায় এক মাইল লম্বা এবং একশ' গজ চওড়া একটি স্থানে পরিখা খনন করে, তার মধ্যে মুক্তফ্রণ্টের নিয়মিত বাহিনীর কিছু সৈন্য দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করে, মোতায়েন করা হল স্থানীয় গেরিলাদের। সৈন্য সংখ্যা ছিল সব মিলিয়ে তিন শ'র কম। কিন্তু তারা পাহাড়ের খাঁজে ও বাঁশ ঝোপের ভিতরে মাটিতে গর্ত করে খুব ভালভাবে ক্যামোফ্লাজ করা স্থানে ঘাঁটি করে। ঘাঁটিগুলোর পরস্পরের সংগে পরিখা পথে যোগাযোগ রাখা হয়। পরের দিন খুব ভোরে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের পর ১৭টি হেলিকপ্টার সৈন্য নামাতে শুরু করে। তারপর সেই আপ-বাক'এর ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। বোমাবাজি শেষ হতেই ফ্রণ্ট সৈন্যরা বেরিয়ে এসে মোতায়েন হলো নিজের নিজের স্থানে। আক্রমণকারী সৈন্যদের এগিয়ে আসতে দেওয়া হলো পনের থেকে কুড়ি গজের মধ্যে। সংগে সংগে স্বয়ংক্রিয়

আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি খেয়ে তাদের ধরাশায়ী করল ধান ক্ষেতের কাদার মধ্যে। আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ এবং বিক্ষিপ্ত-ভাবে বোমা ও গুলি বর্ষণ চলল সারাদিন ধরে। যে মুহূর্তে আমরা গুলি চালাতে শুরু করলাম এবং তারা হতাহত হতে লাগল, সেই মুহূর্ত থেকেই দিয়েমী সৈন্যেরা অস্বীকার করল অগ্রসর হতে। আমেরিকানদের কোনো হুকুমই কোনো কাজে লাগল না।"

লক-নিন যুদ্ধের ফলাফল ছিল মার্কিন-সায়গন কমাণ্ডের আরেকটি শোচনীয় পরাজয়। মার্কিন-দিয়েমী সৈন্যসংখ্যা যে প্রতিপক্ষের চাইতে ছিল অন্তত পক্ষে সাতগুণ বেশী, সে কথা স্বীকৃত হয়েছিল মার্কিন রিপোর্টেই। নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব তারা দিয়েছিল ৪২ জন দিয়েমী সৈন্য নিহত ও ৮৫ জন আহত। এ ছাড়া আমেরিকান আহত ১৫ জন। কিন্তু মুক্তি ফ্রণ্ট বাহিনীর অধিনায়কের মতে শত্রুর হতাহতের সংখ্যা ছিল আরো অনেক বেশী; এবং নিহতদের মধ্যে ছিল অন্ততঃ পক্ষে ১ জন আমেরিকান ও ৭ জন দিয়েমী অফিসার। মার্কিন সংবাদপত্রগুলো লিখেছিল, লড়াইয়ের দিন সন্ধ্যার সময় আলোর স্বল্পতার দরুণ হেলিকপ্টারগুলো আহতদের উদ্ধার করতে পারে নি; এবং তাদের সেই ধান ক্ষেতের কাদার মধ্যে সারারাত ফেলে রাখা হয়। এই পরাজয়ের শোচনীয়তা ঢেকে রাখবার কোনো চেষ্টাও করে নি তারা।

কোম্পানি কমাণ্ডার আবার বললেন, "পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন গেরিলাকে সেখানে রেখে আমাদের বাহিনীর বাকী লোকেরা সেই রাতের মধ্যেই সরে পড়ে। আমেরিকানরা জানত না যে আমরা চলে গেছি। খুব ভোরেই তারা আমাদের পরিত্যক্ত ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে যথারীতি প্রচণ্ড কামান দাগা শুরু করে। কিন্তু আক্রমণ করবার কোনো চেষ্টা আর করে নি। আসলে কামান দাগার আড়ালে আহতদের উদ্ধার করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

পরবর্তী কালে উপর্যুক্ত কৌশল বারংবার ব্যবহার করা হয়েছে।

আমেরিকান কমাণ্ডের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা ছিল: হয় সামরিক ঘাঁটিগুলোকে একেবারেই ছেড়ে চলে আসা, অথবা 'অচল মুদ্রার পিছন পিছন সচল মুদ্রা প্রেরণ করা' ও অন্তহীন পরাজয় বরণ করা। কারণ, অতিরিক্ত সাহায্য যা কিছু তারা পাঠাচ্ছিল, সব গিয়ে পড়ছিল আপ-বাক ও লক-নিন-এর মত পাতা ফাঁদগুলোতে।

গতিশীলতার যুদ্ধ

১৬ই মার্চের সন্ধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত রেজিমেণ্টটির একটি ব্যাটেলিয়নের সংগে ন্‌ে-নিন-এর চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি স্থান অভিমুখে রওনা হলাম। রেজিমেণ্টের অধিনায়কও সংগে ছিলেন। আমরা চলেছিলাম সারিবদ্ধ হয়ে। সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সৈনিকদের পোশাকের সংগে ছিল কিছু কিছু সবুজ ডালপালা। তারপরই সেগুলো ফেলে দেওয়া হলো। কারণ সন্ধ্যার পর আর বিমানের বিপদ নেই। সবাইয়ের মুখে হাসি, অন্তরে বিশ্বাস পরিস্ফুট। কেউ কেউ কাঁধের মাঝ বরাবর বাজুকা ঝুলিয়ে নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় পা ফেলে হাঁটছে। কেউ কেউ আবার মর্টারের তলাকার প্লেট ও নল ভাগাভাগি করে হাতে নিয়ে চলেছে। যে পরিমাণ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা চলেছিল, তাতে আশ্চর্য হতে হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ সব বিচিত্র। যে রঙের কাপড় যোগার করা গেছে, তাই দিয়ে তৈরী হয়েছে পোশাকগুলো। সৈনিকদের সবাইকে একই ধরনের পোশাক যে পরতেই হবে এমন কথা ফ্রন্টের সামরিক নেতৃবৃন্দ মানেন না। তাঁদের মতে, আসল কথা হলো শত্রু সম্বন্ধে সৈনিকদের উদ্দেশ্য এবং ধারণা একই রকম হওয়া দরকার। যাই হোক, রাত ১০ টা নাগাদ একজন দোভাষী ও জন দু' রক্ষী সংগে দিয়ে একটি নিরাপদ স্থানে দোলনা বিছানায় আমাকে ছেড়ে, সৈনিকরা ও কমাণ্ড পোস্ট আলো এবং সিগারেট নিভিয়ে এগিয়ে গেল। তাদের লক্ষ্যস্থল হলো তাই নিন শহর থেকে তিন মাইল

দূরে অবস্থিত কাই জুয়েন-এর 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট'টির রক্ষণাবেক্ষণকারী একটি শত্রু ঘাঁটি। আমার নিজের নিরাপত্তার খাতিরেই ঘটনাস্থলের আরো নিকটে আমাকে যেতে দেওয়া হল না।

আক্রমণের নির্দিষ্ট সময় ছিল রাত ১১-৩০। তার কয়েক মিনিট পরেই রাইফেল এবং স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের কয়েকটা শব্দ কানে এল। এত তাড়াতাড়ি সেটা শেষ হল যে আশ্চর্য হলাম। যাই হোক মধ্যরাত্রি নাগাদ চারিদিকে এমন সাংঘাতিক বিস্ফোরণ এবং আগুনের ঝলক মুহুর্মুহু হতে লাগল যে আমরা স্লিট ট্রেঞ্চের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। কামান এবং মর্টারের গোলা ফাটতে লাগল চারিদিকে। মনে হলো ব্যাটেলিয়ানটি অপ্রত্যাশিত কোনো সাংঘাতিক বাধার সম্মুখীন হয়েছে। ঘাঁটিটা আক্রমণ করতে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। গ্যারিসনের সাহায্যার্থে শত্রু যদি অতিরিক্ত বাহিনী নিয়োগ করে তবে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল ফ্রণ্ট বাহিনীর বৃহৎ অংশকে।

আওয়াজে মনে হল পুরাদস্তুর লড়াই চলছে। ব্যাপারটা চলল প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। তারপর সব শান্ত হয়ে গেল। ভোর রাত্রিতে অধিনায়ক ফিরে এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "কোনো লড়াই হলো না। কাঁচি দিয়ে কাঁটাতার কাটতে শুরু করেছিলাম; কিন্তু কোনো রকম সাড়া শব্দ না পেয়ে কাঠের খুঁটিগুলো কেটে বেড়া টপকে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ঘাঁটি লক্ষ্য করে কয়েকবার গুলি চালিয়ে আক্রমণ শুরু করতেই গ্যারিসনের যে যেদিকে পারল পালাল। কেউ পালাল ঘরের মধ্যে। কেউ আবার গিয়ে আত্মগোপন করল কুয়োর ভিতরে। খুঁজে খুঁজে ওদের ৩১ জনকে বন্দী করতে প্রায় দু-ঘণ্টা সময় লেগেছে। ওরা কেউ একটা গুলিও চালায় নি।"

—"কিন্তু ওই কামান আর মর্টারের আওয়াজগুলো?"

—"আঃ, ওটা সব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। একটি ঘাঁটি আক্রান্ত হয়েছে জানতে পারলেই, সেই স্থানের সব কটি ঘাঁটিই কামান দাগতে শুরু করে দেয়। বিশেষ কোনো বস্তুর প্রতি ওদের লক্ষ্য

থাকে না। ওদের ধারণা, ক্রমাগত গুলি-গোলা চালিয়ে গেলে সেই রাত্রিতে অন্ততঃ ওদের ঘাঁটিগুলো আর আক্রান্ত হবে না।"

পরের দিন সকালে শত্রুর পাল্টা আক্রমণের জন্য আমরা তৈরী হয়ে রইলাম। আশা করা গিয়েছিল, অধিকতর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করবে; দিনের বেলায় মোটামুটিভাবে বেশ বড় রকমের একটা লড়াই হবে এবং ব্যাটেলিয়নটি রাতের বেলায় সেখান থেকে সরে পড়বে। কিন্তু কিছুই হল না। গুটি কয়েক মাদ্ মোয়াজেল ছাড়া দেখা গেল না আর কিছুই। সুতরাং, কর্মসূচির মধ্যে না থাকলেও, দ্বিতীয় রাত্রে আর একটি ঘাঁটি আক্রমণ করতে অধিনায়ক মনস্থ করলেন। অপরাহ্নের পর ভে-নিন-এর দক্ষিণ অভিমুখে আমরা আবার রওনা হলাম। কাম কো লং নদীর ধারে একটি পরিখার মধ্যে আমাকে রাখা হল। এবারকার লক্ষ্যস্থল হল শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিন মাইলেরও কম দূরে অবস্থিত থান দঙ। অধিনায়ক বললেন, "নদীর ভাটির দিকে শত্রুদের কয়েকখানা গানবোট রয়েছে। এবার তারা লড়াই করবেই।" মধ্যরাত্রি নাগাদ আবার সেই গত-রাত্রির মতোই কিছু আওয়াজ শোনা গেল। সকাল ৮টা নাগাদ বিরক্তমুখে অধিনায়ক ফিরে এলেন, "কিচ্ছু হল না। একটাও গুলি না চালিয়ে গ্যারিসনটি স্রেফ পালিয়ে গেল। এবং এতক্ষণের মধ্যে যদি আরো অস্ত্র-শস্ত্র এবং সৈন্য ওরা না পাঠিয়ে থাকে, বে আর ওরা ফিরে আসবে না।" এবার তিনি সত্যি-সত্যিই একটি দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন—শহরের মাত্র দেড় মাইল দূরে অবস্থিত থান ক্রঙ ঘাঁটিটিকে প্রকাশ্য দিবালোকে আক্রমণ করবেন। বললেন, "এবার ভে-নিন থেকে ওদের অতিরিক্ত সাহায্য পাঠাতে হবে।" তারপর কয়েক বাটি ভাত গলধঃকরণ করেই, লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন।

এবং, অসম্ভব মনে হলেও, প্রকাশ্য দিবালোকে ভিয়েৎকংদের আসতে দেখেই, থান ক্রঙ গ্যারিসনটি সোজা পালাল গিয়ে ভে-নিন শহরে। এবারও কোনো রকম কিছু হল না। এই অভিযানে, নৈশ-

কালীন কামানদাগা সত্ত্বেও ব্যাটেলিয়নটির একটিও ক্ষয়-ক্ষতি হল না। তিনটি ঘাঁটিই এক একটি 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট' রক্ষণাবেক্ষণ করত। গ্যারিসনগুলো শেষ হবার অথবা পালিয়ে যাবার সংগে সংগেই, কাঁটাতারের বেড়া আর ঘাঁটিগুলোকে ভেঙে ফেলতে সৈন্যদের সাহায্য করবার জন্য অধিবাসীরা সব বেরিয়ে এল দলে দলে। সেইখানেই গঠিত হল স্বয়ংরক্ষী দল। কাই জুয়েনে অধিকৃত কুড়িটিরও বেশী অস্ত্র-শস্ত্র তুলে দেওয়া হল সেই স্বয়ংরক্ষী দলের হাতে। এছাড়া গ্রামবাসীরা যাতে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঠিক মতো গড়ে তুলতে পারে তার জন্য ব্যাটেলিয়ন থেকে প্রতি বসতিতে কিছু-কিছু লোকও দেওয়া হল।

অধিনায়কের মতে অভিযানটি 'সাফল্যমণ্ডিত' হয় নি। বললেন, "আসল উদ্দেশ্য হল এই অঞ্চলের সমস্ত শত্রুসৈন্য নির্মূল করা। ওদের সেনাবাহিনীর প্রধান অংশের কাছে দ্রুত পৌঁছুবার মতো যান-বাহনাদি আমাদের নেই। সুতরাং এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ওদের হেলিকপ্টার আর ট্রাকগুলো নিজেদের সৈন্যদের নিয়ে আসে আমাদের কাছে; আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানে; যেখানে তাদের খতম করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। এইটাই হল ওদের খতম করবার সব চাইতে ভাল উপায়। কিন্তু বর্তমান অভিযানে আমাদের সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। ওরা আসে নি।"

যাই হোক, ঘটনাটি উদযাপনের জন্য একটি মূল ঘাঁটিতে ফেরবার পথে ব্যাটেলিয়নের শিকারী দলটি দুটি হাতি ও দুটি বন্যবরাহ শিকার করল। একটা হাতি মারতে পারলে পুরো ব্যাটেলিয়নটির বেশ কয়েক দিনের মতো প্রচুর ভালো মাংসের সংস্থান হয়ে যায়। তাই প্রত্যেকেই হয়ে উঠল আনন্দোচ্ছল। পরবর্তী বেশ কয়েকদিন ধরে বন্য বরাহের মাংসের স্যুপ এবং হস্তী মাংসের কালি দিয়ে ভোজপর্ব সারলাম। যে কোনো লোক সেগুলোকে জালে ধরা সুস্বাদু মাছ বলে ভুল করবে।

'শত্রুঘাঁটি নিশ্চিহ্ন তথা সমরবল্লাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করা'-র কৌশলটি

সায়গন বাহিনীর উন্নততর চলাচল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুক্তিফ্রন্টের প্রধান হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার ১৯৬৪ সালের ১৬।১৭ মে তারিখের আন্তর্জাতিক সংস্করণে প্রকাশিত একটি সংঘর্ষের সংবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে।. সংঘর্ষটি ঘটে সায়গনের ২৫ মাইল উত্তরে এবং তাতে সায়গন বাহিনীর ছুটি রেঞ্জার কোম্পানির অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নিহত হয় অন্ততঃপক্ষে ৫৪ জন। পত্রিকাটি লেখে: "বিশ্বস্তসূত্রে বলা হয়েছে যে, প্রায় ৩০০ ভিয়েতকং গেরিলার চার থেকে আটটি কোম্পানি এই লড়াই শুরু করে।* মধ্যরাত্রির পরেই তারা ফাঁদে টোপ ফেলে। সেই সংগে প্রধান প্রাদেশিক সড়কের উপরে পাশাপাশি অবস্থিত পাঁচটি ফাঁড়ির উপর আক্রমণ চালায়···প্রতিরোধকারীরা মার্কিন বিমান বহরের সি-১২৩ বিমানগুলো থেকে রণাঙ্গন আলোকিত করবার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত প্যারাস্যুট-শিখার ভুতুড়ে আলোর মধ্যে লড়াই চালিয়ে যায়।

"রেঞ্জার রিলিফ কোম্পানিগুলো খুব ভোরে পদব্রজে রওনা হয় এবং সোজা যেয়ে পড়ে ভিয়েকংদের ফাঁদে। সংগে সংগে সড়কের চারিধার থেকে ভিয়েতকংরা গুলি বর্ষণ শুরু করে···।

"একটি মার্কিন সূত্রে এই লড়াইকে বর্তমান বৎসরের সর্বাপেক্ষা অধিক রক্তক্ষয়কারী লড়াইগুলোর অন্যতম বলে অভিহিত করা হয়। জনৈক মার্কিন উপদেষ্টা মন্তব্য করেন, 'আমরা বারংবার একই ভুল করে যাচ্ছি।' গড়ে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ভিয়েকংদের গুরুতর অতর্কিত আক্রমণের ঘটনা ঘটছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের এই সংঘর্ষ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে আমেরিকান উপদেষ্টারা তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করছেন।"

তবু আশ্চর্য, এই হতাশা-ব্যঞ্জক পরিস্থিতিকে যথারীতি আকাশ-কুসুম কল্পনা দ্বারা ভিয়েতকং ক্ষয়-ক্ষতি বলে ঢাকা দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন, 'বিদ্রোহীদের মাত্র তিনটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে; কিন্তু জনৈক ভিয়েতনামী অফিসারের মতে, প্রধানতঃ কামানের

গোলায় নিহত হয়েছে এক শ' জন।'

সায়গন সেনাবাহিনীতে রেঞ্জার কোম্পানিগুলোকে 'সেরা' তথা 'সর্বাধিক জংগী' সেনাবাহিনী বলে গণ্য করা হয়। গেরিলা যুদ্ধ কৌশলে বিশেষভাবে শিক্ষণ-প্রাপ্ত এই সৈনিকদের মার্কিন শিক্ষকেরা নিজেদের গর্বের বস্তু বলে মনে করেন। হিয়েন হোয়া'র 'বিশেষ বাহিনী' প্রশিক্ষণ শিবিরে বন্দীকৃত চারজন মার্কিন * বন্দীর কাছে প্রাপ্ত 'বিশেষ ধরনের যুদ্ধ' সংক্রান্ত পুস্তকে, রেঞ্জার্সদের আগাগোড়া অতর্কিত আক্রমণকারী বলেই উল্লেখ করা হয়েছে; আক্রান্ত বলে নয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মুক্তিফৌজ তাদের বিরাট একটি অংশকে হয় তাদের বিছানায়, নতুবা নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত উপর্যুক্ত সংবাদটির মত, কৌশলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। বস্তুতঃ, রেঞ্জার্সরা অত্যন্ত যুদ্ধবাজ সেনাবাহিনী বলে, ১৯৬৪ সালের প্রথমার্ধ থেকেই ফ্রন্ট তাদের প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ দিতে আরম্ভ করে।

এই নতুন কৌশলের বিরুদ্ধে মার্কিন কমাণ্ড একমাত্র যে উপায় আবিষ্কার করেছে তা'হল, লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা না করে ঘাঁটিগুলো ছেড়ে চলে আসা। এই ভাবেই, নো দিন দিয়েমের পতনের পর, যে সমস্ত ঘাঁটির সৈন্য সংখ্যা ১৫০ জনের কম, সেগুলোকে পরিত্যাগ করবার আদেশ জারি করেন জেনারেল হারকিন্স। এই ধরনের মোট ৩০০ ঘাঁটির অধিকাংশই ছিল মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলের সমৃদ্ধিশালী কা মাউ উপদ্বীপে। এর ফলে যে শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয় সেগুলোকে সংগে সংগে পূর্ণ করে ফেলে মুক্তিফ্রন্টবাহিনী। যতই 'পরিকল্পিত পশ্চাদপসরণ'-এর কথা প্রচার করা হোক না কেন, আসলে এগুলো হল 'পলায়ন' এবং 'পরাজয়'।

মুক্তিফ্রন্টের রণ-কৌশলে আরো একটি লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হল, ১৯৬৩ সালের নববর্ষের রাত্রি থেকে শুরু করে চারদিনব্যাপী একটি যুদ্ধে, সায়গনের কুখ্যাত 'ব্ল্যাক টাইগার' ব্যাটেলিয়নটির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি। এই লড়াইয়ে সায়গন বাহিনীর দুটি রেজিমেন্ট এবং

* পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

'ব্ল্যাক টাইগার' ও নৌবাহিনীর দুটি ব্যাটেলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি-ফ্রন্ট নিয়োজিত করেছিল দুটি ব্যাটেলিয়ন এবং একটি কোম্পানি। সংঘর্ষটি ঘটেছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ; ফলে, উভয় পক্ষেরই অন্যান্য সামরিক অভিযানগুলোর পরিকল্পনা সব গোলমাল হয়ে যায়। এবং সেই প্রথম, মুক্তিফ্রন্ট সেনাবাহিনী যুদ্ধের গতিশীলতার অপরিহার্য অংগের সংগে জড়িয়ে পড়ে। নিজেদের কোম্পানিগুলোকে তারা নিপুণ কৌশলে কাজে লাগায়। আক্রমণকারীদের প্রধান বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করবার জন্য ফ্রন্টবাহিনীর মুখ্য অংশ দ্রুত অগ্রসর হয়; এবং সেই সংগে দুটি কোম্পানি সাঁড়াশি আক্রমণ করে 'ব্ল্যাক টাইগার' ব্যাটেলিয়নটিকে ঘিরে ফেলে। এই 'ব্ল্যাক টাইগার' ব্যাটেলিয়নটি উক্ত অঞ্চলে বর্বরতার জন্য ছিল কুখ্যাত। নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ এবং লুঠ ইত্যাদি কাজে কলংকিত ছিল তাদের ইতিহাস। যাই হোক, তাদের উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে সায়গন বাহিনীর দুটি রেজিমেণ্ট ও নৌ-ব্যাটেলিয়নটির সমস্ত প্রচেষ্টাকে আটকে রাখল অন্যান্য কোম্পানিগুলো ; এবং সেই অবসরে মুক্তিফৌজ শুরু করল 'ব্ল্যাক টাইগার'দের নির্মূল করার অভিযান। প্যারাস্যুটের সাহায্যে তাদের জন্য নিক্ষিপ্ত ১০ টন সাজসরঞ্জাম গিয়ে পড়ল ফ্রণ্ট বাহিনীর হাতে। হতাশ ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডারের বেতার মারফত আকুল সাহায্যের আবেদনের জবাবে জানান হলো, অতিরিক্ত সাহায্যাদি পাঠানো 'বৃথা' ; এবং 'যা করা সম্ভব তাই করুন।' শেষ অবধি ব্যাটেলিয়নটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং অধিনায়ককে বন্দী করা হল। একটি হেলিকপ্টারকে গুলি করে নামানো হয় এবং তিনটি জখম হয়।

আপ-বাক যেমন ১৯৬৩ সালের নববর্ষের প্রারম্ভে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, ঠিক তেমনি করল ১৯৬৪ সালের 'ব্ল্যাক টাইগার' যুদ্ধ। 'নির্মূল তথা ধ্বংস করা' কৌশলের সার কথা হলো কোনো বিশেষ স্থানে ঘাঁটি করে নৈশ আক্রমণ ও প্রকাশ্য দিবালোকে লড়াই চালানো। 'ব্ল্যাক টাইগার' লড়াই সেই রণ

কৌশলের আর এক ধাপ অগ্রগতি চিহ্নিত করল। লড়াইটি হয়ে ছিল লঙ আন প্রদেশে। কম্বোডিয়া সীমান্ত থেকে একেবারে সায়গনের কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত লঙ আন হল দক্ষিণ ভিয়েতনামের ৪৩টি প্রদেশের অন্যতম। এবং এই লড়াইকে ১২ মাসের মধ্যে 'শান্ত' করা হবে বলে জেনারেল হারকিন্স ঘোষণা করেছিলেন। ঘোষনাটি ছিল স্ট্যালে-টেলর মূল পরিকল্পনা অনুসারে সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামকে ১৮ মাসের মধ্যে 'শান্ত করবার' বিনয়াবনত ঘোষণারই অন্য আর এক রূপ।

৭ম পরিচ্ছেদ

দেশপ্রেমিক এবং ভাড়াটে সন্ত্রাসবাদী একটি দল

অত রাতে আমার ঘুম ভাঙাবার জন্য সাংবাদিক-দোভাষী বন্ধু ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, "তিনজন দেশপ্রেমিক কর্মী হঠাৎ এখানে এসে গেছেন। ইচ্ছা করলে তাঁদের কাছে কৌতূহল-উদ্দীপক একটি কাহিনী শুনতে পারেন।"

ঘড়িতে দেখলাম রাত ১০-৪৪ মিনিট। পুরো দুটি ঘণ্টা দোলনা বিছানায় মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। জিজ্ঞাসা করলাম, "কাল সকালে হলে হয় না?"

"না, কারণ ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়েই ওঁরা চলে যাবেন। তা ছাড়া ঘটনাটি সত্যিই অসাধারণ।"

অগত্যা দোলনা বিছানা থেকে নেমে পড়তে হল। বন্ধুকে অনুসরণ করে উপস্থিত হলাম ছোট্ট একটি খোলা-মেলা জায়গায়। গাছের গুঁড়ির উপর রাখা কয়েকটি ছোট ছোট বোতল বাতির কম্পিত শিখায় নজরে পড়ল ক্লান্ত কিন্তু বিজয়গর্বে উদ্ভাসিত তিনটি মুখ। মাত্র তিন ঘণ্টা পূর্বে তাঁরা সায়গনের 'কেবলমাত্র আমেরিকানদের জন্য' সংরক্ষিত ক্যাপিটল সিনেমার ভিতরে ২৫ পাউণ্ডের একটি বোমা ফাটিয়েছিলেন। 'ভয়েস অফ আমেরিকা' প্রচারিত সংবাদে পরের দিন সকালে সেই বিস্ফোরণের ফলাফল সম্বন্ধে সরকারী হিসাবে শুনেছিলাম, ৩ জন মার্কিন সৈন্য নিহত ও ৫৭ জন আহত।

আমার সম্মুখে উপবিষ্ট তিনজনের মধ্যে দুই জন ছিলেন সায়গন-শহরতলীর পূর্বতন কৃষক; তৃতীয় জন আগে ছিলেন একটি কারখানার শ্রমিক। এঁদের আমি ১, ২ এবং ৩ নম্বর বলে এবার

থেকে উল্লেখ করব। ১ নম্বর ব্যক্তি, অর্থাৎ শ্রমিকটি ছিলেন উক্ত পরিকল্পনার রচয়িতা, এবং পলায়নের ব্যাপারটাও তিনিই সংগঠিত করেন। তাঁর কথায়: "এর আগে আমরা ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে এম. এ. এ. জি. (মিলিটারী এইড অ্যাণ্ড অ্যাডভাইসরি গ্রুপ) সদর কার্যালয়টি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। ক্যাপিটল সিনেমাটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা অন্য একটি দল আগেও করেছিল; কিন্তু সফল হয় নি। কারণ তারা সিনেমাটির পিছন দিক থেকে আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। তার আগের সপ্তাহে অন্য আর একটি দল মার্কিন বেসবল স্টেডিয়ামের ভিতরে একটি বোমা ফাটায়। যাই হোক, ক্যাপিটল সিনেমায় অন্যেরা ব্যর্থ হয়েছিল। সুতরাং, সাফল্য অর্জনের দায়িত্ব স্বভাবতঃই পড়েছিল আমাদের উপরে। তাই স্থির করেছিলাম, চান্দ্র নববর্ষ উপলক্ষ্যে যুদ্ধ বিরতির কাল শেষ হবার পর কাজটিতে হাত দেব। কিন্তু নববর্ষের দিন মার্কিন বিমান বহর যখন কু ছি জেলায় একটি বিরাট সমাবেশের উপর নাপাম বোমা বর্ষণ করল, তখন স্থির করলাম ওদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতেই হবে। আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে স্নুয়েন খানকে গদিনসীন করে ওদের ধারণা হয়েছে যে ওরাই হল সায়গনের প্রকৃত প্রভু। সেই কারণেও ওদের শাস্তি পাওয়া দরকার। ওদের দেখিয়ে দিতে হবে যে, সায়গনে এখনো জনগণ রয়েছে। তাই আমরা মনস্থ করলাম যুদ্ধ-বিরতি কালের মধ্যেই আঘাত হানব। কারণ যুদ্ধ বিরতির শর্ত ইয়াংকিরা আগেই লংঘন করেছে।"

তাঁদের বিবৃতি অনুসারে, ১ নং এবং ২ নং পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথে একটা গোলমাল সৃষ্টি করে সকলের মনোযোগ সেই দিকে আকর্ষণ করেন। ইত্যবসরে ৩ নং, অর্থাৎ কবি-কবি চেহারার দ্বিতীয় কৃষকটি প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে বিস্ফোরক-পদার্থগুলো নিয়ে সোজা ঢুকে যান ভিতরে। ঘটনাটি ৩ নম্বরের ভাষায়: "বাইরে গুলির শব্দে ভিতরের আমেরিকানরা আগেই সাবধান হয়ে গিয়েছিল। আমি ভিতরে ঢুকতেই দু-জন আমার উপর লাফিয়ে পড়ে কাবু করে ফেলতে চেষ্টা

করে। হাতে বিস্ফোরক পদার্থগুলো থাকায় আত্মরক্ষা করতে পারলাম না। কিন্তু কোন রকমে ডিটোনেটরটি টেনে দিলাম; এবং যেই সেটা ছিটকে উঠেছে অমনি আমেরিকান দু'জন ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে দৌড়ে সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপরে উঠে গেল। ডিটোনেটর টেনে দেবার ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে থাকে। সুতরাং যে সময়টুকু পেলাম, তার মধ্যেই বোমাটিকে থামগুলোর মাঝে রেখে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেই পিছনের বোমা নিরোধক ইস্পাতের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলাম। সংগে সংগেই ভিতরে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হল।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আমেরিকান দু'জনের সংগে নিজেকেও আপনি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন?"

স্থির দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করে ৩ নম্বর উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই"

তাঁর দিকে তাকিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দির রুশ সাহিত্যে উল্লিখিত কবি এবং বুদ্ধিজীবীদের কথা আমার মনে পড়ে গেল। জারদের ধ্বংসের জন্য তাঁরা নিজেদের শক্তি, বুদ্ধি, এমন কি জীবনও উৎসর্গ করতেন। এই ৩ নম্বরও হলেন সেই জাতের একজন মানুষ।

চার পাশের জংগলে রাত্রির নিরন্ধ্র জমাট অন্ধকারের পটভূমিকায় তিন জন মানুষের দেহের রেখা যেন খোদাই করা মনে হচ্ছিল। আকাশে প্রথম শুক্লপক্ষের একফালি বিবর্ণ চাঁদ ব্যর্থ চেষ্টা করছিল সেই আঁধারকে দূরীভূত করতে। বোতল-বাতির ম্লান আলোয় যতখানি সম্ভব ওই কঠিন মুখ তিনটিকে নিরীক্ষণ করে অবাক হয়ে গেলাম। এই ধরনের কাজে মানুষ অনুপ্রাণিত হয় কিসের তাগিদে?

মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধতা নেমে এলো। শুধু জেগে রইল কী একটা রাত-জাগা পাখির একঘেয়ে বিরক্তিকর ডাক — শুরু হয়েছে সেই সন্ধ্যা থেকে। শেষ হবে ভোরের আগে।

সেই নিস্তব্ধতা ভংগ করলেন ২ নম্বর। বললেন, "সায়গনে আমাদের মতো সংগ্রামী মানুষ রয়েছে হাজারে হাজারে। তারা যে

কোনো মুহূর্তে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতে পিছপাও নয়। কিন্তু আমাদের প্রতিটি প্রাণের বিনিময়ে পাঁচ কিংবা দশজন আমেরিকানের প্রাণ আমরা চাই।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রেক্ষাগৃহে কি নারী ও শিশুও ছিল?"

প্রশ্নটা শুনে ২ নম্বর যেন জ্বলে উঠলেন, "নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্রধারণ করি না। কিন্তু আমাদের নারী ও শিশুদের প্রতি তারা কী ধরনের ব্যবহার করে? ওই প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ছিল কেবলমাত্র সেই সমস্ত বৈমানিক যারা দিনের পর দিন নিজেদের বিমান নিয়ে বেরিয়ে যায়, আর অন্ধভাবে আমাদের গ্রামগুলোর উপব বোমা ফেলে ও গুলি চালায়। যে সমস্ত ঘর-বাড়ির উপর তারা নাপাম বোমা ফেলে, সেগুলোতে কোনো নারী ও শিশু রয়েছে কি না কখনো জিজ্ঞাসা করে কি? ববং যে কোনো জীবন্ত বস্তু দেখলেই নির্বিচারে গুলি চালায় অথবা বোমা ফেলে।"

২ নম্বর এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামতেই ১ নম্বর জানালেন, যে লোকটি ক্যাপিটল সিনেমায় বোমা মেরেছে তার ১২ বছরের একটি বোন এবং আরো পঁচিশটি শিশু কাউ জী গ্রামের একটি স্কুলে গুলি চালনায় নিহত হয়েছিল।

আগের প্রশ্নটি আবার আমার মনে জাগল। কী সে জিনিস যা মানুষকে এই ধরনের বেপরোয়া, বিপজ্জনক কাজে অনুপ্রাণিত করে? এই মানুষ তিনটির জীবন সম্বন্ধে সবিস্তারে জানতে পারলে হয়ত এ প্রশ্নের একটা সদুত্তর পাওয়া যেত।

জিজ্ঞাসা করলাম ১ নম্বরকে। জানলাম, এর আগের নয় বৎসরের মধ্যে দিয়েমী কারাগারে তাঁর কেটেছে পাঁচ বৎসর। তিনি বললেন, "মানুষ হিসাবে অতুলনীয় সব কমরেডদের আমার চোখের সামনে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা ছিল দেশপ্রেমিক, এবং সেইটাই ছিল তাদের একমাত্র অপরাধ।"

প্রশ্নের উত্তরে ২ নম্বর জানালেন, তাঁর বাড়ি যে বসতিতে ছিল

সেটিকে বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। কারণ, বিমান ক্ষেত্রটিকে শহরের উত্তর দিকে সম্প্রসারিত করবার প্রয়োজন পড়েছিল। তারপর কিছুদিন তিনি একটি মার্কিন সামরিক শিবিরে কুলির কাজ করেন। বললেন, "আমাদের স্ত্রীলোকদের প্রতি তারা যে অত্যাচার করেছে, তার কোনো ক্ষমা কোনো দিন নেই। এমন সমস্ত বীভৎস ব্যাপার আমি এই চোখে দেখেছি, যা কোনো মানুষের দেখা উচিত নয়। আমার দেশের মাটিতে তারা যতদিনই থাকুক না কেন, বেঁচে থাকলে এর প্রতিশোধ নেবই। আমার আপন বোন, দেশপ্রেমিক বন্ধুবর্গ, আমাদের যে সমস্ত যুবতীদের উপর বলাৎকার করা হয়েছে, যে সমস্ত কমরেডদের অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের নামে এ হল আমার শপথ।"

যাত্রার সময় হয়ে এসেছিল তাঁদের। ছোট ছোট বোঁচকাগুলো কাঁধের উপর তুলে নিতেই গন্তব্যস্থল জিজ্ঞাসা করলাম। ১ নম্বর বললেন, "আপাততঃ বিশ্রামস্থলে যাচ্ছি। সেখানে বসে মে মাসের পয়লা তারিখকে স্মরণীয় করবার একটা পরিকল্পনা করতে হবে। সায়গনে মে দিবস উদ্‌যাপন করা হল আমাদের ঐতিহ্য।"

পরে একদিন বেতার সংবাদে শুনলাম, ১লা মে তারিখে খুব ভোরে এক দুঃসাহসিক অতর্কিত আক্রমণে সায়গন পোতাশ্রয়ে ১৪,০০০ টনের এক মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ ডুবে গেছে; এবং উক্ত জাহাজকে উদ্ধারের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে যে আমেরিকান দল গিয়েছিল, তারা সবাই হতাহত হয়েছে দ্বিতীয় একটি বোমার বিস্ফোরণে। ক্যাপিটল সিনেমার ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা অস্বাভাবিক দৃঢ় করা হয়েছিল; এবং সেই সংগে মার্কিন-ভিয়েতনামী যুক্ত টহলদারি ব্যবস্থাও করা হয়েছিল অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ রোধ করবার উদ্দেশ্যে। তা সত্ত্বেও উপরিউক্ত ঘটনা ঘটে। সংবাদ শুনেই সেদিন আমার মনে পড়ে গিয়েছিল সেই তিনজন দেশপ্রেমিকের কথা।

আক্রমণকারীদের প্রতি ঘৃণা

হুইন তান ফাট একদিন কথাপ্রসংগে বলেছিলেন, আমেরিকানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হল মুক্তিফ্রন্টের নীতির অন্যতম অংগ। আরো বলেছিলেন, "এই ধরনের কার্যকলাপের স্বপক্ষে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আমরা সর্বদাই পাই। যে সমস্ত নৈশ ক্লাব, সিনেমা, খেলার মাঠ, রেস্তরাঁ ইত্যাদি কেবলমাত্র মার্কিন সামরিক ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত. সেইগুলোই শুধু হল আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য। তাই আগেকার দিনে ফরাসীদের মতো, এরাও এখন কাঁটাতার আর বোমা-নিরোধক লোহার জাল লাগাতে বাধ্য হয়েছে। ফলে, তারা যে সর্বদা মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে এই প্রকৃত অবস্থার চিত্র ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়ে পড়ছে জনসাধারণের সামনে। অবশ্য সামান্য কয়েকজন বিচ্ছিন্ন, একক সন্ত্রাসবাদীদের দিয়ে এই ধরনের কার্যকলাপ চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু জনসাধারণের সর্বাত্মক সমর্থন থাকলে তাও সম্ভব হয়। কারণ সর্বদাই তারা সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিয়ে থাকে। একাধিকবার এমন হয়েছে, কোন ব্যক্তি এই ধরনের কোনো কাজ করে পুলিশ আসবার আগেই পালিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাকে ধাক্কা দিয়ে নিজের বাড়ি কিংবা দোকানের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে; তারপর লুকিয়ে ফেলেছে তাকে। আবার কেউ হয়ত তার হাতে কিছু অর্থ গুঁজে দিয়ে বলেছে, 'এই দিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নাও'।"

ক্যাপিটল সিনেমার ঘটনার সপ্তাহ দুয়েক পরে মুক্তিফ্রন্ট এক বেতার ঘোষণায় সায়গনবাসী আমেরিকানদের সতর্ক করে দিয়ে বলে, তারা যেন আমেরিকানদের জন্য সংরক্ষিত কোনো স্থানে স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে না যায়। কারণ সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ হল 'শুধু পুরুষদের' জন্য।

ইন্দোচীনে ফ্রান্স যখন তার 'ঘৃণ্য যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়েছিল সেই

সময় বাস্তবের আলোকে ঘটনাপ্রবাহ নিরীক্ষণ করবার মতো মার্কিন নেতার অভাব ছিল না। এই বিষয়ে, ১৯৫৪ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কেনেডির মন্তব্যও ছিল যথেষ্ট বাস্তব-সম্মত। তখন তিনি ছিলেন 'ম্যাসাচুসেট থেকে নির্বাচিত একজন সেনেটর।' বলেছিলেন, "বিজয়ের সামান্যতম সম্ভাবনাও যেখানে সুদূর পরাহত, সেখানে ইন্দোচীনের জংগলে অর্থ, জিনিসপত্র এবং জনবল ঢালা হবে সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ এবং ক্ষতিকারক।...ইন্দো-চীনে আমেরিকা যত সাহায্যই প্রেরণ করুক না কেন, তা শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবে না। কারণ, এ শত্রু হল এমন, যে একই সংগে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, আবার কোথাও নেই; যে, একদিকে হল 'জনগণের শত্রু', আবার অন্যদিকে তাদের প্রতি জনগণের রয়েছে সহানুভূতি এবং সমর্থন।" এই উক্তিটি আজ বরং আরো বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। দশ বৎসর পূর্বে এই উক্তিটি যখন উচ্চারিত হয়, তখন তা যতখানি সত্য ছিল, দশ বৎসর পর তা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে অধিকতর সত্য। কিন্তু এরও এক বৎসর পূর্বে, ইন্দোচীন পরিদর্শনের পর আদেলাই স্টিভেনশন যে মন্তব্য করেছিলেন, (প্যারিসের l' Intransigeant পত্রিকায় ১৯৫৩ সালের ১১শে মে তারিখে প্রকাশিত) সেটিও ছিল সমপরিমাণে সত্য। পরিস্থিতি সম্বন্ধে কতগুলো যথার্থ নৈরাশ্যজনক মূল্যায়নের পর, রাষ্ট্রপুঞ্জে তৎকালীন আমেরিকার প্রতিনিধি দলের নেতা স্টিভেনসন মন্তব্য করেছিলেন:

> 'কী বিরাট প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে ফরাসীরা আজ লড়াই চালাচ্ছে, তা দেখে আমরা চমকিত হই। ছিন্নবস্ত্র পরিহিত গ্রামীণ জনসাধারণকে কী ভাবে বোঝানো যাবে যে, এই সমস্ত জার্মান, ফরাসী, সেনেগলি এবং মরোক্কানরা তাদেরই জন্য ভিয়েতমিনদের বিরুদ্ধে লড়ছে? কারণ, সব-কিছু সত্ত্বেও ভিয়েতমিনরা হল তাদেরই স্বজাতি, তাদেরই দেশের মানুষ।'

সেই সময় এটা ছিল খুবই সংগত একটা প্রশ্ন। এবং আজো, আদেলাই স্টিভেনসন, ডীন রাস্ক এবং প্রেসিডেন্ট জনসনের কাছে

তা' চিন্তা করে দেখবার মতো একটি সংগত প্রশ্নই রয়ে গেছে। ছিন্ন-বস্ত্র পরিহিত ওই গ্রামীণ জনসাধারণকে কীভাবে বোঝানো যাবে যে, তাদেরই জন্য এই সমস্ত আমেরিকান, কুওমিনটাং চীনা, ফিলিপিন-বাসী, অস্ট্রেলিয়াবাসী এবং অন্যান্য সৈনিকেরা ভিয়েতকং-দের বিরুদ্ধে লড়ছে? সব-কিছু সত্ত্বেও যে ভিয়েতকং-রা হল তাদেরই স্বজাতি এবং তাদেরই দেশবাসী। ১৭ অক্ষরেখার উত্তর অংশের ভিয়েতনামীরা তাদের দক্ষিণ অংশের অন্য দেশপ্রেমিকদের সংগে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করলেও, সেই সংগত প্রশ্নটা রয়েই যায়। আসল কথা হল, ওই ছিন্নবাস পরিহিত গ্রামীণ জনসাধারণ নিজের অন্তরের কাছে এই প্রশ্নের জবাব অনেক আগেই দিয়ে রেখেছে। এবং সন্ত্রাসবাদী যুবগোষ্ঠীর কার্যকলাপ হল সেই জবাবেরই নিচে একটা মোটা দাগ টেনে সেটাকে আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা। ভিয়েতনামের ইতিহাসে অন্যান্য জঘন্য আক্রমণকারীদের চাইতে কোনো অংশে কম জঘন্য হস্তক্ষেপ তথা আক্রমণকারী বলে তারা আমেরিকানদের গণ্য করে না।

তে হুয়েন-এ যে ভয়ংকর ঘটনার কথা শুনেছিলাম, তা উপরিউক্ত বক্তব্যকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। ঘটনাটি বলেছিলেন জনৈক রেড সংখ্যালঘু উপজাতীয় যুবতী। নাম তাঁর হ'ব্লঙ। ডাকলাক প্রদেশের লাক লাক জেলার একটি গ্রামে তাঁর বাড়ি। বর্তমানে তিনি মুক্তিফ্রণ্টের একজন কর্মী; এবং নিজগ্রামে সাংবাদাদি আদান-প্রদানের দায়িত্ব রয়েছে তাঁর উপর। উপরের ঘটনার প্রসংগে বলেছিলেন, "শত্রুর আক্রমণ হয়েছিল বহুবার। বহু মানুষকে তারা হত্যা করেছিল; গৃহপালিত পশু নিধন এবং চুরি হয়েছিল অসংখ্য। এই অঞ্চলে আমেরিকান উপদেষ্টাও ছিল অনেক। অবশেষে আমাদের লোকেরা ক্ষেপে গেল। ওরা যাতে আমাদের বাড়ি-ঘর লুঠ করতে না পারে তার জন্য শুরু হল প্রতিরোধ। প্রথমে ফাঁদ এবং সুঁচালো বাঁশের বর্শা দিয়ে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাদের অত্যাচার থামল না। শেষে আমাদের যুবকেরা গড়ে তুলল আত্মরক্ষী দল। কোনো রকম

আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের ছিল না ; ছিল শুধু ধনুক এবং বিষ-মাখা তীর।

"একদিন আমাদের গ্রামের উপর হল অতর্কিত আক্রমণ। আত্মরক্ষী দলের সবাই সে সময় ছিল মাঠে। গ্রামে ছিল মাত্র দুটি বালক। বয়স কম বলে ওদের আত্মরক্ষী-দলে নেওয়া হয় নি। একদল শত্রু সৈন্যকে গ্রামের দিকে আসতে দেখে, তারা গিয়ে লুকিয়ে পড়ল গ্রামের পাশের নদীটির ধারে। গ্রামে আসতে হলে শত্রু সৈন্যদের ওই নদী হেঁটে পার হয়ে আসতে হবে। তারা যখন নদীর মাঝখানে এসেছে, সেই সময় বালক দু'জন তীর ছুড়তে আরম্ভ করল। আহত হল দু-জন আমেরিকান এবং চার জন দিয়েমী সৈন্য। তীরগুলোতে ছিল তীব্র বিষ মাখানো। আহত ছয়জন মারা গেল সংগে সংগেই। তাই দেখে, বাকি সৈন্যরা ওপারে ফিরে গিয়ে গ্রামের উপর মেশিনগান চালাতে আরম্ভ করে দিল। বালক দুটি অপেক্ষা করতে লাগল মাথা নিচু করে। শত্রুসৈন্য আবার নদী পার হতে শুরু করল। যেই তারা আগের জায়গায় পৌঁচেছে, অমনি আবার শুরু হল তীর ছোড়া। আবার মারা পড়ল কিছু শত্রুসৈন্য। ব্যাপারটাকে বড় রকমের একটা সংঘর্ষ মনে করে শত্রু শেষ পর্যন্ত পালাল। বিষ মাখানো তীরকে তাদের বড় ভয়।

"মৃতদেহগুলো সেখানেই পড়েছিল। বালক দু'জন তখন গিয়ে সেগুলোকে টেনে নিয়ে এল নদীর পাড়ে। অস্ত্রশস্ত্র সং সংগ্রহ করল। আমেরিকান দু-জনের কাছে পাওয়া গেল দু-খানা ছোরা। তারপর তারা ছুটে মাঠে গিয়ে সবাইকে জানাল ঘটনার কথা। আমাদের লোকেরা গুলির শব্দ শুনেছিল। কিন্তু ওই দুটি বালক, বয়সে নিতান্ত ছোট বলে যাদের আত্মরক্ষী দলেও নেওয়া হয়নি, তারাও শত্রুর এত বড় একটা দলকে পরাস্ত করতে পারে, একথা বিশ্বাস হলো না কারো। তাই সবাই দল বেঁধে ছুটে এল নদীর ধারে।

"মৃতদেহগুলো তখনো সেখানে পড়েছিল। অবিশ্বাস করবার আর উপায় নেই। কিন্তু আমেরিকান দু-জনের বুকে গভীর ছোরার আঘাত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা তো আগেই মারা গিয়েছিল।

তা' সত্ত্বেও ওদের তোমরা ছোরা মারলে কেন? আর, মারলেই যদি, তবে কেবল ওদের দু-জনকেই কেন?'

"বালক দুটির মধ্যে একজন সংগে সংগে জবাব দিল, 'কারণ ভিয়েতনামীরা হল আমাদের লোক। ওরা বিভ্রান্ত হয় বলেই ভুল করে। কিন্তু ওই দু-জন আমেরিকান হল বিদেশী। সমুদ্র পার হয়ে কতদূর থেকে ওরা এদেশে এসেছে একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। তা হল আমাদের ক্ষতি করা। এই লম্বা নাকওয়ালা লোকগুলোই দিয়েমীদের দিয়ে আমাদের এত ক্ষতি করায়। তাই মৃত হলেও, ওদেরই ছোরা দিয়ে ওদের আমরা আঘাত করেছি।"

কাহিনী শেষ করে হ'ল্লঙ আবার বললেন, "বালক দুটি এখন আমাদের আত্মরক্ষীদলের সদস্য হয়েছে। এবং সেই ঘটনার পর থেকে শত্রুরা আর কখনো আমাদের গ্রামের উপর আক্রমণ চালায় নি।"

একটা কথা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। চিন্তাশক্তির প্রাথমিক স্তরে রয়েছে বলে যাকে মনে হয়, সেও তার দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ—তথা উৎসকে ঠিক চিনতে পারে, এবং সেই অনুসারে কাজও করে। যখন প্লেনগুলোকে গুলি করে নামান হয় এবং লাল-চুলের মাথার খুলির টুকরো মাঠের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকে; যখন মার্কিন 'বিশেষ বাহিনী'র বিশেষজ্ঞরা মোষ ও মুরগির পাল জবাই করতে নির্দেশ দেন, তখনই ব্যাপারটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে পড়ে—যেমন, আমেরিকানদের বেলায় না হলেও, ফরাসীদের বেলায় আদলাই স্টিভেনসন ঠিক চিনতে পেরেছিলেন।

মার্কিন যুদ্ধবন্দী

মনোবল এবং এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণার সম্পূর্ণ অন্য এক চিত্র পেলাম চার জন মার্কিন যুদ্ধবন্দীর কাছ থেকে। যে জায়গায় এদের সংগে দেখা হয়, নিঃসন্দেহে সে জায়গা ছিল দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ায় প্রথম মার্কিন যুদ্ধবন্দী শিবির প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। চার জনই ছিল প্রথম শ্রেণীর সারজেন্ট, এবং হিয়েপ হোয়া 'বিশেষ বাহিনী'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯৬৩ সালের ১৩।১৪ নভেম্বর তারিখে তারা ধরা পড়ে। ওই দিন গেরিলারা উক্ত কেন্দ্র আক্রমণ করে সেখানকার সব-কিছু ধ্বংস করে ফেলে এবং প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সরে পড়ে। যে পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র তারা পেয়েছিল তা মুক্তিফ্রন্টের বিরাট একটি ব্যাটেলিয়ানকে সুসজ্জিত করবার পক্ষে যথেষ্টের চাইতেও ছিল বেশী।

প্রতি-গেরিলা অথবা 'বিদ্রোহ-বিরোধী' তৎপরতায় ভিয়েতনামীদের প্রশিক্ষণ দেবার উদ্দেশ্যে উক্ত চার জন আমেরিকানকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। অন্ততঃ তাদের পাঠ্যপুস্তকে তাই লেখা আছে। সেই দিক থেকে বিচার করলে ভেবে অবাক লাগে যে, চার জনই সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়েছিল; গুরুত্বপূর্ণ ওই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে রক্ষাকল্পে সম্ভবতঃ একটি গুলিও খরচ করা হয় নি; যখন আক্রমণ হয় তখন উক্ত কেন্দ্রের ১১ জন আমেরিকানের মধ্যে সেখানে উপস্থিত ছিল মাত্র ৫ জন, আর বাকিরা 'হৈ-হল্লা' করে সময় কাটাচ্ছিল সায়গনে।

চারজনের মধ্যে একজনের নাম হল কেনেথ রোরাব্যাক। বিরলকেশ মস্তক, চোখের উপরে ঘন এক জোড়া ভ্রু এবং কঠোর মুখ, এই হল তার মোটামুটি চেহারা। কোরিয়ার যুদ্ধ ফেরত এই ঝানু সৈনিক মার্কিন সেনা বিভাগে কাজ করছে ১৫ বৎসর ধরে। ঘটনার দিন মাঝরাত নাগাদ যখন আক্রমণ হয়, তখন চার জনের মধ্যে একমাত্র সে-ই জেগে ছিল; চিঠি লিখছিল স্ত্রীর কাছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঠিক কি হয়েছিল বল তো?"

কেনেথ জবাব দিল, "জায়গাটাকে ওরা বলত প্রশিক্ষণ শিবির। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু অন্যান্য শিবিরগুলোর মতো সেটাও ছিল লক্ষ্য-ভেদের একটি স্থায়ী নিশানা। যে কোনো সময় এ ধরনের শিবিরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। যাই হোক, সেই নৈশ আক্রমণ ছিল

অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং সুসম্পাদিত। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সব-কিছু চুকে-বুকে যায়।"

প্রতিরোধের জন্য সে নিজে কি করেছিল জিজ্ঞাসা করায় স্পষ্ট জবাব পেলাম, "সোজা দৌড় লাগালাম ট্রেঞ্চের দিকে।"

"সংগে কি কোন অস্ত্র নিয়েছিলে?"

"অস্ত্র নেবার মতো সময়ই ছিল না।"

"প্রতিরোধ সংগঠিত করবার কোনো রকম প্রচেষ্টা হয়েছিল কি?"

"তা কথা ছিল অসম্ভব। সব-কিছু তখন জ্বলছে। পুরো এলাকাটা ছেয়ে গেছে ভিয়েতকং গেরিলায়। দলে-দলে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে গড় এবং বাড়িগুলোর চারিধারে।"

বাকি তিন জন হল টেকসাসের অধিবাসী জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, নাম কামাচো; ধ্বংসাদির কাজে বিশেষজ্ঞ ম্যাকলিওর নামে একজন নিগ্রো এবং মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট তথা বেতার চালক স্মিথ। তিন জনই সে সময় ঘুমিয়েছিল; এবং তিন জনেই রোরাব্যাকের মতো একই কাহিনী বিবৃত করল। স্মিথ বলল, "...নিখুঁতভাবে সংগঠিত নৈশ আক্রমণ। ব্যারাকের ঠিক পিছনে বিস্ফোরণের আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়। মর্টার দাগার দমকা শব্দ। মনে হয় ওরা সাদা ফসফরাস ব্যবহার করেছিল। মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠেছিল সব-কিছু। বাংকারগুলোর ভিতর থেকে ভেসে আসছিল বিস্ফোরণের শব্দ। ট্রেঞ্চের দিকে ছুটলাম। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভিয়েতকংরা সেখানেও পৌঁছে গেল। হাত দুটো বেঁধে আমাকে গড়ের উপর দিয়ে নিয়ে চলল তারা।"

আশ্চর্যের ব্যাপার, পালাবার সময় চার জনের কেউই সংগে কোনো অস্ত্র-শস্ত্র নেয় নি। কিন্তু কোনো গেরিলা সৈনিক হাতে অস্ত্র না নিয়েই ট্রেঞ্চের দিকে ছুটছে এটা কল্পনা করা আর উড়ন্ত হাতির কল্পনা করা দুই-ই সমান। নাইলনের যে দোলনা বিছানায় গেরিলা সৈনিক ঘুমায়, সেই বিছানার সংগেই থাকে তার অস্ত্র। বিছানা থেকে দৈবাৎ পড়ে গেলেও, আপনা হতেই তার হাত আঁকড়ে ধরবে

অস্ত্রটিকে।

ধরা পড়বার পর মাসের পর মাস ধরে ওই চার জন যুদ্ধবন্দীকে নানাস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কোথায় তারা রয়েছে তা যাতে বুঝতে না পারে সেই জন্য নিয়ে যাওয়া হয় আঁকা-বাঁকা, বিসর্পিল পথে। কখনো সামপানে; এবং বেশীর ভাগই পদব্রজে। বর্তমানে তারা ছিল পশ্চাৎবর্তী এলাকার একটি নিরাপদ স্থানে।

রোরাব্যাককে জিজ্ঞাসা করলাম, পথ চলার সময় বিমান আক্রমণ তাদের খুব বেশী উত্যক্ত করেছিল কি না। উত্তরে রোরাব্যাক বলল, "ঘটনাটি ঘটে যাবার পরই আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে হাজির হয়ে ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন। তারা ভাল করল, কি মন্দ করল, তা জানি না। আসল কথা, ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমার কিছু হয় নি। দিন দুয়েক পর একটি বি-১৬ বোমারু বিমান এসে ১১ বার গুলি বর্ষণ করে। কেউ তাতে হতাহত হয়েছিল কি না জানি না। ওই যা বললাম, আসল কথা হল ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি বেঁচে গেছি।" কথাগুলো শুনে ক্যাপিটল সিনেমায় আক্রমণকারী সেই তিন জনের কথা আমার মনে পড়ে গেল: 'যে কোন মুহূর্তে জীবন বিসর্জনের জন্য আমরা হাজারে হাজারে তৈরী রয়েছি। কিন্তু আমাদের প্রতিটি জীবনের বিনিময়ে পাঁচ কি দশজন আমেরিকানের জীবন চাই।'

ওই চার জন সারজেন্টের সংগে আমি পৃথক পৃথক ভাবেও কথা বলেছিলাম। সকলেই জানিয়েছিল যে ওদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করা হয়েছে। এতে তারা যে অবাক হয়েছে সে কথাও গোপন করে নি। রোরাব্যাক বলেছিল, "প্রথম থেকেই এরা আমার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম আমাকে ওরা সোজাসুজি গুলি করে মারবে। মনে হয়, চিন্তাটা আমার মুখেও ফুটে উঠেছিল। কিন্তু আমার আশংকা সেই মুহূর্তে ফলল না; দ্বিতীয় দিনেও নয়। তখন ভাবলাম হয়তো গুলি করে মারবার জন্য আমাদের তারা খানিকটা দূরে নিয়ে যাচ্ছে।"

প্রশ্ন করলাম, "তোমাকে যে গুলি করে মারবে একথা ভাবলে কেন ?"

রোরাব্যাক যেন খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর ঢোঁক গিলে বলল, "সেইটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। বন্দীদের প্রতি নজর রাখবার মতো পরিস্থিতি গেরিলাদের থাকে না। কিন্তু আমি যে ভয় পেয়েছি, তা তারা লক্ষ্য করেছিল, এবং আমার ভয় ভাঙাতে চেষ্টাও করেছিল অনেক।"

"কিন্তু কি ভাবে তুমি কথাবার্তা চালাতে ? উভয়ের বোধগম্য কোনো ভাষা তোমাদের ছিল কি ?"

"না। কিন্তু তারা আমার পিঠ চাপড়াত, মুখের সামনে হাত এনে বন্ধুভাবে নাড়ত, বাহুতে হাত রাখত ; এবং নানা রকম ইশারা ইংগিতে আমাকে দুশ্চিন্তা পরিহার করতে বলত।"

রোরাব্যাক এবং অন্য তিনজনের দুর্ভাবনার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। কোনো গেরিলা ধরা পড়লে, তাকে যে তৎক্ষণাৎ অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হবেই, সে কথা রোরাব্যাকরা ভাল করেই জানে। তা'ছাড়া যে 'বিশেষ বাহিনী'র সংগে তারা যুক্ত, সেই বাহিনীর অতুলনীয় বর্বরতাও সর্বজনবিদিত। তা সত্ত্বেও কেউ যদি ওই বন্দী চারজনের দুশ্চিন্তার কারণ জানতে চান, তবে একবারের জন্য তাঁকে মার্কিন সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ভিয়েতকং বন্দীদের ছবি দেখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৬৪ সালের ২৪শে মে তারিখের নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার আন্তর্জাতিক সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রায় উলঙ্গ একজন ভিয়েতনামীর ছবি ছাপা হয়েছিল। তাতে ছিল, লোকটা পড়ে রয়েছে মাটির ওপর, এবং যে দড়ি দিয়ে তার হাত দুটোকে মাথার উপরে টেনে বাঁধা হয়েছে, সেই দড়ি আবার সংযুক্ত রয়েছে একটি মার্কিন ট্যাংকের সংগে। ছবির শিরনামা অতি অল্পকথাতেই পাঠকদের জানিয়ে দেয় যে, ভিয়েতকংটির 'মুখ খোলাবার' জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ওই ট্যাংক এইবার তাকে প্রথমে মাটির উপর দিয়ে তারপর নদীর মধ্য দিয়ে টেনে হিঁচড়ে

নিয়ে যাবে।

যাইহোক, পূর্বোক্ত নৈশ আক্রমণে মর্টারের টুকরোয় ম্যাকলিওর আহত হয়েছিল। সেই প্রসংগে বলল, "পরের দিন আমার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়; এবং চারদিন পর মর্টারের টুকরোগুলো বার করা হয়। আসল কথা হল, ওরা আমাদের সংগে সত্যিই ভাল ব্যবহার করে। কোনো রকম দুর্ব্যবহার এখনো পাই নি। সত্যিই আশ্চর্য! এমন ব্যবহার পাবো তা কখনো ভাবি নি।"

স্মিথের মতামত জিজ্ঞাসা করতে, সে জানাল, "যুদ্ধবন্দীদের দেখা-শোনা করবার মতো উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা গেরিলাদের নেই। তবু স্বীকার করতেই হবে যে, তাদের ব্যবহার ভাল। এই পরিস্থিতির মধ্যে যতখানি করা সম্ভব, তা তারা করে।"

কানাচোকে জিজ্ঞাসা করলাম তার অভিমত। বলল, "আমাদের সংগে এরা খুবই ভাল ব্যবহার করেছে। কিন্তু আমরা যে খাদ্যে অভ্যস্ত, তা যোগাড় করা ওদের পক্ষে মুশকিল।" কথাটা শুনে আশ্চর্য লাগল। সাদা চামড়ার মানুষ প্রধান খাদ্য হিসাবে রুটি না খেয়ে ভাত খেলে বাঁচতে পারে না, এ কথাটা মার্কিন সৈন্যরা এখনো বিশ্বাস করে! যাই হোক, এইটাই কিন্তু ছিল ওই চারজন বন্দীর প্রধান সমস্যা। কোরিয়ায় মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে মৃত্যুর যে অস্বাভাবিক হার ছিল সে তুলনায় ব্রিটিশ, ফরাসী, তুর্ক এবং অন্যান্য জাতের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল না বললেই চলে। তার ফলে, ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো হয় এই বলে যে, এশিয়া মহাদেশে চাকরির জন্য নির্বাচিত মার্কিন সৈনিকদের এবার থেকে ভাত খাবার অভ্যাসে রপ্ত করানো হবে। কিন্তু তার আগে 'দেশ ছেড়ে থাকা'র অভ্যাসে রপ্ত হওয়া যে বিশেষ করে গেরিলা 'বিশেষজ্ঞদের' ক্ষেত্রে অপরিহার্য পূর্ব শর্ত হওয়া উচিত, একথা চিন্তা করা উচিত ছিল।

বন্দী আমেরিকানদের কাছে এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ এবং উদ্দেশ্য কয়েক সপ্তাহ ধরে 'ব্যাখ্যা' করে, তারপর তাদের মুক্তি দেওয়া, এই ছিল জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের নীতি। যে ছোট্ট শিবিরটিতে

উক্ত চারজন সারজেন্টের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই শিবিরের সংগঠন পদ্ধতি দেখে আমার ধারণা হয় যে আরো বহু আমেরিকান যুদ্ধ-বন্দীর আগমন হবে, এবং ভবিষ্যতে তাদের মুক্তির প্রশ্নটি হবে আলাপ-আলোচনার ব্যাপার। ওই চারজন বন্দীর ইউনিফর্ম নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, এবং পরিবর্তে তাদের দেওয়া হয়েছিল দু-জোড়া করে কালো রংয়ের সার্ট ও প্যান্ট। সাবান ও দাঁত মাজার ব্রাশও দেওয়া হয়েছিল তাদের। সপ্তাহে একদিন করে তারা স্নান করতে পারত; এবং কামাচো'র ভাষায়, "যখন ওরা আমাদের দাড়ি কামানো প্রয়োজন মনে করে, তখনি এনে দেয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।" প্রতিটি কুটিরেই রয়েছে একটি করে বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থল। কুটিরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে উঁচু বাঁশের বেড়া। ভিয়েতনামীরা সাধারণতঃ যে ধরনের বাঁশের বিছানায় শয়ন করে, তাদের জন্যও রয়েছে সেই রকম শয্যার ব্যবস্থা। শিবিরের কর্তৃপক্ষ আমায় বললেন, "শত ইচ্ছা থাকলেও যেহেতু জংগলের মধ্যে রুটির কারখানা আমরা স্থাপন করতে পারছি না," তাই চেষ্টা করে ভিন্ন রকমের খাদ্য ব্যবস্থা ওদের মানিয়ে নিতে হবে।

আমাকে মঙ্গলগ্রহ থেকে নেমে আসতে দেখলেও ওই বন্দী চার জন ততখানি অবাক হত না, যতখানি হয়েছিল জংগলের ভিতর থেকে আমি বেরিয়ে আসাতে। বহুদিন ধরে বহির্জগতের সংগে তাদের কোনো রকম যোগাযোগ নেই। তাই কারো বিশেষ-কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম ওদের নিরাসক্তি দেখে। শুধু একটা প্রশ্ন করল কামাচো। ভয়ানক গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় কে জয়লাভ করেছে জানেন?"

সৌভাগ্যবশতঃ খবরটা রেডিওয় শুনেছিলাম একদিন। বললাম, "হ্যাঁ। সপ্তম রাউণ্ডে সোনি লিসটনকে সুকৌশলে নক আউট করে ক্লে বিজয়ী হয়েছেন।"

শুনে, একগাল হেসে আমাকে ধন্যবাদ জানালো কামাচো।

তারপর, যেন স্বর্গীয় সুখ অনুভব করছে এমন একটা ভাব নিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

বেশ কয়েক মাস ধরে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেয়েছে এই চারজন বন্দী। তাই, এই যুদ্ধ সম্বন্ধে রোরা-ব্যাকের বর্তমানে কি ধারণা, তা জানতে চাইলাম। জবাবে প্রথমেই সে বলে রাখল যে, সামরিক ব্যক্তি হিসাবে রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করার অধিকার তার নেই। তারপর বলল, "পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন রহস্যময় বলে বোধ হয়। কেন যে এই যুদ্ধ, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার নেই। অবশ্য গেরিলাদের দমন করবার এবং আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করবার অধিকার, আইন-অনুযায়ী গঠিত সায়গন সরকারের রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নেরই থাকে দুটি দিক। সেই দিক থেকে বিচার করলে, বর্তমান সরকারকে তারা যদি না চায়, তবে চেষ্টা করে তাকে উচ্ছেদ করবার অধিকারও রয়েছে গেরিলাদের। কিন্তু কে ঠিক, আর কে ভুল; কে জিতবে, আর কে হারবে; অথবা সম্পূর্ণ ব্যাপারটা কিসের জন্য, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই।" বাকি তিন জনও একই কথা বলল। কিসের জন্য এই যুদ্ধ, অথবা সত্যিই কি কারণে তারা সেখানে রয়েছে, সে সম্বন্ধে তাদের কোন 'ধারণাই নেই'। সকলেই দৃঢ়স্বরে আমেরিকানদের নিছক পরামর্শদাতা-র ভূমিকার কথাই উল্লেখ করল।

মুক্তিফৌজের তরুণ সৈনিক এবং কর্মীদের কৌতূহল কিন্তু দেখেছি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। সারা পৃথিবী নিয়ে তারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে: আলোচনা চালায় গভীর রাত অবধি। তাদের নিজেদের সংগ্রামের বিষয়ে বহির্বিশ্ব কতদূর জানে এবং কি ভাবে, সে সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড কৌতূহল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সম্বন্ধে জানতেও তারা সমান আগ্রহী। যে সমস্ত দেশের নাম তারা বলে সেগুলোর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অথবা ভূগোল সম্বন্ধে তাদের ধারণা হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট। কিন্তু কি-কি বিষয়ে

যে তাদের নিজেদের মনে সর্বাধিক কৌতূহল রয়েছে, সেটি তারা খুব ভাল করে জানে; এবং সেই তালিকায় বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ বিজয়ীর প্রসংগ কিন্তু সবার উপরে স্থান পায় নি।

রোরাব্যাককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিভাবে সে সময় কাটায়। কারণ, একমাত্র নিজের ছোট্ট বাঁশের কুটিরটুকু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ছাড়া, যুদ্ধবন্দীদের আর কোনো কাজ নেই। জবাবে সে বলল, "বাড়ি ফিরে যা যা করব, সেই সমস্ত চিন্তা করি। কল্পনায় আমি একটি মা স রোস্ট করবার গর্ত, রান্না ঘরের তাক, বাচ্চাগুলোর জন্য ছ'টা মডেল প্লেন ও তিনটি রেডিও তৈরী করেছি। এই একমাত্র উপায়েই মনটাকে আমি ভুলিয়ে রাখি।"

দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে রকম ব্যাপার চলেছে, তার নমুনা হিসাবেই যেন স্মিথ ও রোরাব্যাক দক্ষিণ ভিয়েতনামে পদার্পণ করবার কয়েক-দিনেই মধ্যেই 'কান ছো'র একটি অভিযানে আহত হয়। সে কথা উল্লেখ করে রোরাব্যাক বলল, "আমার আসার সময় দুশ্চিন্তায় আমার স্ত্রী প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। কারণ, দক্ষিণ ভিয়েতনামে রওনা হবার পরই আমাদের বহু বন্ধু-বান্ধব ও জানাশোনা লোক মারা গেছে, আহত হয়েছে, কিংবা নিখোঁজ হয়েছে। এবং আমার সম্বন্ধে প্রথম যে সংবাদ আমার স্ত্রী পেয়েছিল, তা ছিল আমার আহত হবার খবর; এবং তার চারমাস পর পেল আমার বন্দী হবার সংবাদ।"

প্রশ্ন জাগে, আদর্শগত কোনো মিল অথবা এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাদের কোনো ধারনাই নেই, তারা কেন এই বিপজ্জনক অপ্রীতিকর চাকরিতে স্বেচ্ছায় যোগদান করে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে, এই মানুষগুলোর বেতনের অংকের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। রোরাব্যাকের মূল বেতন ছিল মাসিক ৩৩৫ ডলার। দক্ষিণ ভিয়েতনামে আসার সংগে সংগে সে বেতন একলাফে উঠে গেছে মাসিক ৮৫৮'৪০ ডলারে। অনুরূপভাবে অপর তিনজন মাসিক ৪৫০ ডলার থেকে ৫০০ ডলার করে অতিরিক্ত বেতন পাচ্ছে।

তাদের পদ অনুযায়ী যে বেতন তারা পাচ্ছে, তা আজ অবধি ভাড়াটে সৈন্যরা যে বেতন পেয়েছে, তার সবার চাইতে বেশী। পক্ষান্তরে মুক্তি ফ্রন্টের সাধারণ সৈনিক থেকে নিয়ে রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার অবধি পায় মাসিক ৪০ পিয়াস্ত্রা করে; সরকারী বিনিময় হারে যা' ১ ডলারের কিছু বেশী, এবং প্রকৃত কালো-বাজারী দরে যা' হল ৪০ সেণ্টের মত। এত পার্থক্য সত্ত্বেও, যুদ্ধক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক ও ভাড়াটে সৈনিকের মধ্যে যে প্রভেদ, তা আমাদের সেই খরগোশ ও কুকুরের দৌড় প্রতিযোগীতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাণপণ দৌড়েও খরগোশকে কেন যে কুকুরটি ধরতে পারে নি, তা ব্যাখ্যা করে সে বলেছিল, "খরগোশটি দৌড়াচ্ছিল প্রাণ বাঁচাবার জন্য, আর আমি দৌড়াচ্ছিলাম আহার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।" ভিয়েতনামীরা লড়াই করছে বাঁচার জন্য, এবং আমেরিকানরা লড়ছে তাদের আহার্যের তাগিদে। এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে ধরণের সংগ্রাম চলছে তাতে জয় এবং পরাজয়ের পার্থক্য যে কি, তা এতেই বোঝা যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিভাবে যুদ্ধ শুরু হল ?
জননী কারবাইন ও তার সন্তান সন্ততি।

জনৈক কৃষকের খড়ের চালাঘরের বাইবে ছায়াঘেরা একটি জায়গায় বসে আমরা কথাবার্তা বলছিলাম। সেখান থেকে সায়গনের দূরত্ব বার মাইলেরও কম। মাথার উপরের ফ্রেম থেকে ঝুলছিল পাকান শশা ও লাউয়ের আকৃতির সব ফেস্টুন। আমার সংগী ছিলেন, পশ্চিম দুনিয়া যাদেব ভিয়েতকং বলে, তাঁদেরই একজন জেলা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বেঁটে-খাটো, গোলগাল মানুষ; মাথায় একরাশ কালো চুল; মুখে তুষ্টিপূর্ণ হাসি; চমৎকার দু-সারি দাঁত; পরনে হাফ প্যান্ট। সবল শবীরের মাংসপেশীগুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

ভিয়েতকং কথাটি হল ভিয়েতনামী কম্যুনিস্ট শব্দ দুটির সংক্ষিপ্ত রূপ। মুক্তি ফৌজ অবশ্য বলে 'জিয়াই ফঙ কে ন', অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের সামরিক বিভাগ।

মার্কিন সেনাবিভাগের ভাঙা-চোরা একটি কারবাইন হাতে নিয়ে সংগী সেইরকম তুষ্টিপূর্ণ হাসিব সংগে বললেন, "এই হল আমাদের জননী কারবাইন। এইটিই ছিল আমাদের প্রথম অস্ত্র। কিন্তু চার বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের পর সে আরো অনেকগুলো অস্ত্রের জন্ম দিয়েছে।"

সমীপবর্তী হেলিকপ্টারের গর্জ শোনা গেল। সংগে সংগে তিনি একটু কোণের দিকে সরে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর এক টুকরো খড় চিবুতে চিবুতে জবুথবু আকারের দুটি হেলিকপ্টারের

প্রতি সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, "ওই যে, অনেক উঁচুতে উড়ছে, যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব দিকে। ওই অঞ্চলে একটি অভিযান চলছে। মনে হয় আহতদের নিয়ে চলেছে। আহতদের নিয়ে যাবার সময় ওরা এই রকম জোড়ায়-জোড়ায় ওড়ে।"

আমাদের প্রতি নজর না দিয়ে হেলিকপ্টার দুটি মাথার উপর দিয়ে বিকট গর্জনে চলে যাবার পর, আবার তিনি এসে বসলেন ছোট্ট কাঠের টুলের উপর। ছয় বর্গ ইঞ্চি পরিমিত কাঠের টুলের উপর পা-দুটোকে মুড়ে ভিয়েতনামীরা যে কি-ভাবে বসে তা ভেবে অবাক লাগে।

যাই হোক এর পর তিনি ছোট্ট দুটি পেয়ালায় খানিকটা বিস্বাদ, হলুদ রংয়ের চা ঢাললেন। তারপব কাববাইনটির গায়ে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "এটা না পাওয়া পর্যন্ত সাবা জেলার ভিতরে আমাদের একটিও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। শুধু জেলা কেন, সারা জিয়াদিন এলাকাতেই ছিল না। ১৯৬০ সালেব প্রথম দিকে তে-নিন প্রদেশের তুয়া-হাই'তে বেশ বড রকমের একটি অভিযান চালানো হয়। বহু অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া যায় সেখানে। তাই থেকে প্রতি জেলার জন্য একটি হিসাবে ছযটি পাঠান হয় জিয়াদিন-এ। এই ভাবেই আমরা এই 'জননী'কে পাই। এর সাহায্যেই আমরা প্রথম ঘাঁটিটি দখল করি; এবং তাইতেই অস্ত্র-শস্ত্রের প্রথম ঝাঁকটি 'জননী' আমাদের উপহার দেয়।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "একটিমাত্র কারবাইন দিয়ে কিভাবে একটি সৈন্য-ঘাঁটি দখল করা সম্ভব হল?"

জবাবে গেরিলা-নেতা বললেন, "প্রথমতঃ সবাই হয়ে উঠেছিল হতাশ এবং মরিয়া। অমানুষিক অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, ফাঁসি ইত্যাদি আমাদের জেলায় হয়ে উঠেছিল নিত্যকার ঘটনা। দিয়েমী আড়কাঠিদের অত্যাচারে যুবকেরা সমস্ত সময় আত্মগোপন করে পালিয়ে বেড়াত। এই যুবকেরা যা'হয় একটা-কিছু করবার জন্য অধীর হয়ে পড়েছিল। সুতরাং ফরাসীদের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের সময়কার গেরিলা বাহিনীর যে কয়েকজন আমরা গ্রামে ছিলাম, সবাই একত্রিত হলাম। শলা-পরামর্শের পর এই 'জননী'র অনেকগুলো কাঠের নকল তৈরী করা হল। তারপর এক চাঁদনীরাতে সেগুলো নিয়ে ঘাঁটিটির পাশ দিয়ে মার্চ করে গেলাম সবাই। গুলিও চালালাম কয়েকটা। আর, মেগাফোন মারফত গ্যারিসনটিকে সাবধান করে দিলাম, তারা যদি ব্যবহার না শোধরায়, তা'হলে 'জনগণের সশস্ত্র বাহিনী' উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এমন ভয় পেয়ে গেল ওরা যে, বাইরে আসতেও সাহস করল না। তারপর একটা ঘুরপথে গ্রামে ফিরে গিয়ে অস্ত্রগুলোকে লুকিয়ে ফেললাম। পরের দিন সকালে ঘাঁটির কমাণ্ডার কয়েকজন বিশ্বাসী লোককে সংগে নিয়ে গ্রামের বাজারে এসে লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল। এরকম পরিস্থিতিতে কি জবাব দিতে হবে, তা আগেই মেয়েদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কথাবার্তা মোটামুটি হল এই ধরনের:

'গতরাত্রে যে সশস্ত্র লোকগুলো এখানে এসেছিল, তারা কারা?'

একজন বৃদ্ধা জবাব দিল, 'কি জানি কারা। তবে দেখলাম বিরাট একটা দল। গ্রামের ভিতর দিয়ে মার্চ করে যেতে সময় লাগল প্রায় এক ঘণ্টার মতো। মনে হয়, কাগজে যে ভিয়েতকং-দের নিয়ে লেখালেখি চলছে, ওরা তারাই।'

'ওদের কাছে কি ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র ছিল বলতে পারো?'

'বহু অস্ত্র। বেশীর ভাগই রাইফেল। তবে কতগুলো অস্ত্র দেখলাম দুই-তিন জন লোক বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কতগুলো আবার দেখলাম বিরাট বিরাট নলের মতো। অমন ধরনের অস্ত্র আগে কখনো দেখি নি। এক'াদা অস্ত্র দেখলাম যেগুলোর দু-তিনটে করে পা আছে।'

"জবাব শুনে কমাণ্ডার ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। বাজুকা এবং ভারি মেশিনগানে সুসজ্জিত বিরাট এক সেনাবাহিনীকে সে মানসনেত্রে দেখতে লাগল। খবরটা সংগে সংগে ঘাঁটির সমস্ত সৈন্যের মধ্যে

ছড়িয়ে পড়ল। এ ব্যবস্থাও করেছিল ওই মেয়েরাই। ফলে, জেলা সদর দপ্তর থেকে কয়েকদিনের জন্য আরো সৈন্য-সামন্ত এল ওদের। কিন্তু কিছুই ঘটল না। কোনো ভিয়েতকং-এর দেখা না পেয়ে অবশেষে ওরা ফিরে গেল।

"দিন দুয়েক পর এক রাতে সবাই প্রস্তুত হলাম। সাইকেলের বাতির জন্য আমরা বেশ খানিকটা কারবাইড কিনেছিলাম। বাঁশের বিরাট বিরাট চোঙার ভিতরে সেই কারবাইড আর জল ভরা হল। মাঝরাত নাগাদ ঘাঁটিকে ঘিরে ফেললাম সবাই। তারপর শুরু হল সেই বাঁশের কারবাইড বোমা ফাটানো। প্রচণ্ড শব্দে বাঁশের চোঙাগুলো ফাটছে, আর তার ফাঁকে ফাঁকে 'জননী' কারবাইন থেকে দু'একটা করে গুলি ছুটছে। সেই সংগে মেগাফোন মারফত গ্যারিসনটিকে বলা হল যে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ না করলে, তাদের প্রত্যেকটি লোককে এক এক করে খতম করা হবে। ব্যারাকগুলোর চারপাশে বিস্ফোরণের আওয়াজে আগেই ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিল ওরা। ফলে, নিঃশব্দে, সারবন্দী হয়ে এক একজন করে এসে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করল। নকল কারবাইনগুলো আগেই আমরা আড়ালে সরিয়ে ফেলেছিলাম। আসল কারবাইনটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র একজন। যেমন যেমন ওরা সব বেরিয়ে আসছে, সে ওদের পরীক্ষা করতে লাগল। শেষ সৈন্যটি যতক্ষণে আত্মসমর্পণ করেছে, ততক্ষণে ওদেরই অস্ত্র-শস্ত্রে আমরা পুরোপুরি সজ্জিত হয়ে গেছি। এই ভাবেই সায়গনের নয় মাইল দূরে অবস্থিত কু-ছি জেলার ফু মাই হুঙ ঘাঁটিটা আমরা দখল করি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেউ কোন রকম বাধা দিল না?"

"না। একটি গুলিও চালায় নি কেউ। ওদের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। 'জননী'কে পাবার পর থেকেই আমরা স্থানীয় স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়কদের সতর্ক করে দিতে থাকি। দিয়েমী সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ওরাই হল সব চাইতে নিষ্ঠুর। প্রত্যেককে চাকরি ত্যাগ করতে আদেশ দিই

আমরা। সেই সংগে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, বারংবার সাবধান করা সত্ত্বেও যদি তারা চাকরি না ছাড়ে, তা'হলে শাস্তি দেওয়া হবে। এবং সত্যি সত্যিই একজনকে ফাঁসিও দিই। লোকটা ছিল কু-ছি জেলার শাসনকর্তা, সাক্ষাৎ একটা শয়তান। বহু লোককে সে হত্যা করিয়েছিল। তা'ছাড়া, ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী আমাদের ৮০ জন কমরেডকে হয় সে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে মেরে ফেলে, নয় তো সরাসরি হত্যা করে। বহুবার তাকে সাবধান করা হয়েছিল। কিন্তু সমানে সে অত্যাচার চালিয়ে যেতেই থাকে। অবশেষে এক রাতে তাকে আমরা বন্দী করলাম। তার অপরাধের ফিরিস্তি, এবং যে সমস্ত লোক তার অত্যাচারের বলি হয়েছিল সবার নাম পাঠ করে তারপর তাকে ফাঁসি দেওয়া হল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহের তালিকা ও ফাঁসির হুকুমের প্রতিলিপি একটি করে আটকে দেওয়া হল তার মৃতদেহের সংগে এবং কিছু টাঙিয়ে দেওয়া হল জেলা সদরের চারিদিকে। কু-ছি জেলায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল মাত্র ওই একজনকে। কিন্তু ছোট ছোট অত্যাচারীদের উপর এর ফলাফল হল দারুণ। আশে-পাশের গ্রামের এই ধরনের সবাই চাকরি ছেড়ে দিল এবং উৎপীড়ন-অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেল রাতারাতি। অবশ্য, 'ফুমাই হুঙ' এর ঘাঁটিতে রাতের বেলায় আমাদের প্রচারকর্মীরা 'জনগণের সশস্ত্র বাহিনী'র বিরুদ্ধাচরণ করলে সাংঘাতিক ফলাফল সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী প্রচার করেছিল, বিশেষ করে তার ফল হয়েছিল সবচাইতে বেশী।"

তুয়া-হাই'এর লড়াই।

জিয়াদিন'এর 'জননী কারবাইন' যদি হয়ে থাকে প্রথম অস্ত্র, তা'হলে আমার মনে হয় 'তুয়া-হাই'-এর লড়াই হল 'জননী যুদ্ধ।' আমার এই বর্তমান ভ্রমণ—তথা পরিদর্শন পর্যায়ে যে প্রশ্ন সব সময় মনের মধ্যে তোলপাড় করেছে, তা'হল, কি ভাবে, কোথায় এবং কবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের এই লড়াই শুরু হয়েছিল। সেই প্রশ্নের

অন্যতম সূত্র পাওয়া যায় এই লড়াইতে। গেরিলা নেতা ভাসাভাসা-ভাবে শুধু জানিয়েছিলেন যে, উক্ত লড়াইয়ে 'প্রচুর পরিমাণে' অস্ত্র-শস্ত্র দখল করা হয়েছিল। কিন্তু পরে যে মানুষটি সেই অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তাঁকেই আমি খুঁজে বার করি। নাম তাঁর কুয়েত থান; ঢ্যাঙা, রোগা একজন কৃষক। বর্তমানে তিনি মুক্তি-ফ্রন্টের নিয়মিত বাহিনীর একজন রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার। ফরাসিদের বিরুদ্ধে লড়াই, অর্থাৎ গেরিলারা যাকে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ বলে উল্লেখ করে, সেই যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন তে নিন প্রদেশের ছোট্ট একটি গ্রামের গেরিলা নেতা।

তে নিন শহর হল তে নিন প্রদেশের রাজধানী। সায়গন থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৫৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এই তে নিন শহরের প্রায় তিন মাইল উত্তরে ছিল ফরাসীদের দুর্গ 'টুর-২', ভিয়েতনামীরা যাকে বিকৃত উচ্চারণ করে বলে তুয়া-হাই। আয়তক্ষেত্রাকার দুর্গটি ফরাসীদের সময় যেমন ছিল, এখনো তেমনি সুদৃঢ় এবং দুর্ভেদ্য রয়েছে। আলোচ্য অভিযান যে সময় পরিচালিত হয়, সে সময় এই দুর্গ ছিল দিয়েমী সেনাবাহিনীর একবিংশতিতম ডিভিশনের ৩২তম রেজিমেণ্ট ও একটি ব্যাটেলিয়ান—মোট প্রায় দু'হাজার সৈন্যের মূল সদর দপ্তর।

কুয়েত থান বললেন, "অভিযান শুরু করবার আগে আমাদের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। বিস্তারিতভাবে সব কিছু বারংবার আলোচনা করা হয়েছিল। অবশ্য অভিযানের পরেও আমাদের দুশ্চিন্তা কাটে নি। ১৯৫৯ সালের আগে পর্যন্তও নীতি ছিল সম্পূর্ণ আইনানুগ, রাজনৈতিক, অহিংস সংগ্রামের রূপ। কিন্তু পূর্বেকার মুক্তিসংগ্রামের কর্মীদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সমস্যা যখন সামনে এসে দাঁড়াল, তখন, ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে তা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ব্যবহারের নীতিতে পরিবর্তিত হল।"

জিজ্ঞাসা করলাম; "কে এই নীতি নির্দেশ করেছিল; আর তার পরিবর্তনই বা করল কে?"

প্রশ্ন শুনে তিনি লঘু পরিহাসপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। অতীতের প্রতিরোধ সংগ্রামের কোনো কর্মীকে এই ধরনের প্রশ্ন করলেই, ওই রকম দৃষ্টির সামনে পড়তে হয়। এতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু চোখে পরিহাসের দৃষ্টি থাকলেও, জবাবটি তাঁর ছিল বিশদ। আগে এই ধরনের প্রশ্নের যে সমস্ত উত্তর পেয়েছি, সেগুলোর চাইতে তাঁর উত্তর ছিল অনেক স্পষ্ট। বললেন, "ভিয়েতমিন নামে আমাদের একটি সংস্থা ছিল। সেই সংস্থাই প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা করে। অস্ত্র সংবরণচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সংগে সংগে যে এই সংস্থা ভেঙে ফেলা হবে ; অথবা সমস্ত ভিয়েতমিন সভ্যেরা নিয়মিত সেনাবাহিনীর সংগে ১৭ অক্ষরেখার উত্তরে সরে যাবে এমন কোনো শর্ত জেনিভা চুক্তিতে* ছিল না। কারণ তা'হলে জনসংখ্যার বিরাট একটা অংশকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করতে হয়। প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামে যারা কোনো-না-কোনো রকমে সামান্যতম অংশও গ্রহণ করেছিল, এরকম সমস্ত পূর্বতন ভিয়েতমিন সভ্যদের এক-এক করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে দিয়েমীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু তবু আমাদের বহু সভ্যই চারিদিকে ছড়িয়ে রয়ে গেছে।

---

* জেনিভা সম্মেলনে তিনমাস ধরে আলাপ-আলোচনার পর, সমস্ত বৃহৎ শক্তিবর্গ ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কেবল স্বাক্ষর করে নি আমেরিকা। না করলে চুক্তিটিকে মর্যাদা দিতে কিন্তু আমেরিকা প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। উক্ত চুক্তির মুখ্য সর্তগুলোর মধ্যে ছিল ভিয়েতমিন সশস্ত্র বাহিনীকে ১৭ অক্ষরেখার উত্তর দিকে প্রত্যাহার করা, দক্ষিণ-অংশের ফরাসী বাহিনীকে পুনর্বিন্যাস করা ; দেশের দুটি অংশের মিলনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে একটি সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনের এক বৎসর পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অংশের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উপর কোনো ধরণের প্রতিহিংসামূলক আচরণ অথবা পক্ষপাত প্রদর্শন করাও উক্ত চুক্তিতে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হ। চুক্তিটি যাতে কার্যকরী করা হয় তা দেখবার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রন কমিশনও (ভারত, পোলাণ্ড ও কানাডাকে নিয়ে) গঠন করা হয়।

সর্বরকম বিপদ ও অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরের সংগে যোগাযো রক্ষা করে চলি।

"সম্পূর্ণ ভিয়েতনামের জন্য জেনিভা যুদ্ধবিরতি চুক্তি যে মুহূর্তে স্বাক্ষরিত হয়, সেই মুহূর্তেই আমাদের নেতৃত্ব পূর্বোক্ত নীতিটি স্থির করেন। নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলার জন্য বিস্তারিত নির্দেশনামায় জেনিভা চুক্তির প্রতি নিঃসর্ত এবং যথাযথ মর্যাদা দেবার কথা ঘোষণা করে আইনানুগ, রাজনৈতিক সংগ্রামের সীমা লংঘন করতে নিষেধ করা হয়। আমরা হলাম বিপ্লবী। আমাদের বিপ্লবী নিয়মানুবর্তিতার চেতনা উক্ত আদেশ অমান্য করতে নিষেধ করে। ফলে ১৯৫৪-৫৯ সালের মধ্যে আমামাদের বহু খাঁটি কমরেডকে জীবন দিয়ে এর দাম দিতে হল। দীর্ঘ দিন ধরে যে-কোনো 'কর্মপন্থা' অনুসরণ করে চলতে আমরা অভ্যস্ত। প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় বিশেষ কোনো 'কর্মপন্থা' সমস্ত অঞ্চলে জানিয়ে দিতে কখনো কখনো এক বৎসরও সময় লেগে গেছে আমাদের। সুদূর দক্ষিণ অংশ থেকে কোনো প্রতিনিধিকে হয়ত ছয় মাস ধরে পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যোগদান করতে। সেখান থেকে সে আবার পদব্রজে ফিরে গিয়ে নতুন 'কর্মপন্থা' সম্বন্ধে সকলকে জানাবে। এই ছিল অবস্থা। এবং সেই সময় যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কাজ করতাম, তাতে বিচ্ছিন্ন, একক, স্বাধীন দল হিসাবে কাজ করতে এবং মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে নিজেরাই নিজেদের সমস্যা-বলীর সিদ্ধান্ত নিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এটা অবশ্য এখনো খানিকটা পরিমাণে করতে হয়। যাই হোক, যা কিছু করি না কেন, তা সেই 'কর্মপন্থার' কাঠামোর ভিতরেই আবদ্ধ থাকত। ১৯৫৬ সালের শেষ অবধি সেই 'কর্মপন্থা' ছিল অহিংস, এবং তারপর 'আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সহিংস।"

১৯৫৯ সালের শেষ দিকে উক্ত কর্মপন্থার পরিবর্তন কে করেছিলেন জিজ্ঞাসা করলাম। শুনে, অনেকক্ষণ ধরে তিনি সেই রকম লঘু পরিহাসপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন

"চারিদিকে এখনো আমাদের পূর্বতন নেতৃত্বের এমন বহু লোক রয়েছেন, যাঁরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করবার জন্য পূর্বতন ভিয়েতমিন সভ্য, দেশভক্ত, কমুনিস্ট, পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মী, দিয়েমী আড়কাঠিদের হাত এড়াতে জংগলে পালিয়ে আসা যুবকদের মতো নতুন সদস্য, ইত্যাদি যথেষ্ট সংখ্যক লোক আমাদের রয়েছে।

"তুয়া-হাই দুর্গ আক্রমণ করাটা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য সহিংস সংগ্রামের সিদ্ধান্তের বাইরে চলে যাবে কি না তা নিয়ে আমাদের বিরাট দুশ্চিন্তা ছিল। শেষে, অনেক আলোচনার পর স্থির হল, আত্মরক্ষার জন্যও আমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে; আমাদের প্রস্তাবিত আক্রমণ আসলে অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'আত্মরক্ষামূলক' সংগ্রাম এবং প্রচলিত নিয়মে 'লংঘন' বলতে যা বোঝায়, এটা 'কর্মপন্থা'র সে রকম কোনো 'লংঘন' নয়। সুতরাং, ১৯৬০ সালের 'চান্দ্র বৎসরে'র (ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি) ঠিক পূর্বে আক্রমণ করা স্থির হল। এর আগের কয়েক সপ্তাহ ধরে শত্রুর অত্যাচার উৎপীড়ন চরমে উঠেছিল। তে নিন অঞ্চলে বিরাট এক সামারিক অভিযানে হাজার হাজার কৃষককে হত্যা করে তুয়া-হাই রেজিমেন্ট সবে প্রত্যাবর্তন করেছিল। সেই অত্যাচার এবং পাইকারি হত্যার চলচ্চিত্র তুলে নিয়ে এসেছিল কমাণ্ডারেরা; এবং জনসাধা 'কে সম্পূর্ণরূপে ভীতিগ্রস্ত করবার উদ্দেশ্যে বলপূর্বক সবাইকে বাধ্য করছিল সেই ছবি দেখতে। ছোট ছোট চাকাওয়ালা গাড়ির উপর রাখা গিলোটিন সংগে নিয়ে ১০/৫৯ আইন অনুসারে গঠিত বিশেষ ট্রাইবুনালগুলো গ্রামাঞ্চলে হয়ে উঠেছিল সক্রিয়। যেমন, পূর্বতন জনৈক প্রখ্যাত মুক্তিসৈনিক উত্ত্লেপ'কে ছাউথান জেলা সদরে গিলোটিনে হত্যা করা হয়, এবং তাঁর স্ত্রীকে স্বামীর কর্তিত মুণ্ড নিয়ে বাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করতে বাধ্য কর। য়। আর, দিয়েমী ক্যামেরা-ম্যানেরা সেই ছবি তোলে।

"জানুয়ারির শেষ দিকে শুরু হল শত্রুর সবচাইতে বড় অভিযান।

পূর্বতন সমস্ত মুক্তি সৈনিকদের বন্দী করা ছাড়াও, এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সক্ষম সমস্ত যুবকদের ধরে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করা। ফলে হাজার হাজার যুবক পালিয়ে গেল জংগলে। শত্রু সৈন্যরা তাদের ঘর-বাড়ি লুঠ করল। চান্দ্র নববর্ষের উপলক্ষ্যে সংগৃহীত সমস্ত খাদ্যসম্ভার ও উপহারের সামগ্রী চুরি করল তারা। আর চালাল অত্যাচার। বস্তুত, এই অভিযানে শত্রুদের সংগে এমন সমস্ত অধঃপতিত সেনাদল ছিল যারা বাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে ধৃত ব্যক্তিদের চোখ উপড়ে ফেলা, নাক-কান কাটা, নররক্ত পান করা ইত্যাদি পাশবিক কাজে পরম আনন্দ লাভ করত। জনগণের মধ্যে চরম সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য তাদের প্রতি যে আদেশ ছিল, তা যথাযথ প্রতি-পালিত করতে তাদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। স্বভাবতই এই সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়নে জনসাধারণ ভয় পেয়ে গেল ; মনোবল ভেঙে গেল তাদের। কিন্তু সেই সংগে তাদের অন্তরে জ্বলে উঠল ক্রোধের অগ্নিশিখা।"

"নতুন 'কর্মপন্থা' যে সঠিক, সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল আমাদের কাছে। বুঝলাম, দুটি মাত্র পথ খোলা আছে; অস্ত্রধারণ করে নিজেদের রক্ষা করা, অথবা মুরগির বাচ্চার মতো মৃত্যুবরণ করা। বাইরের কোনো শক্তি আমাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে, সে ভরসা ছিল না। হয় নিজেদেরই রুখে দাঁড়াতে হবে, নইলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। সুতরাং পুরনো কয়েকজন প্রতিরোধ-কর্মী মিলিত হয়ে তুয়া-হাই আক্রমণের চরম সিদ্ধান্ত নিলাম। পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মী, আড়কাঠিদের হাত এড়িয়ে পালিয়ে আসা যুবকের দল, সশস্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট কয়েজন এবং দিয়েমী সেনাবাহিনী থেকে পলাতক কয়েকজন সৈনিক—সব মিলিয়ে আমরা হলাম মোট ২৬০ জন। শেষোক্ত লোকদের কাছে ছিল মহামূল্যবান কিছু অস্ত্র-শস্ত্র। এ ছাড়া সশস্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকগুলোর গুরুত্বও কিছু কম ছিল না। কারণ তারা (হোয়া হাও, কাও দাই এবং বিন জুয়েন সম্প্রদায়) ছিল পূর্বতন ফরাসী সেনাবাহিনীর অংশ বিশেষ। আমাদের সেনাবাহিনীর

মতো তাদের অবশ্য অস্ত্র-শস্ত্র সহ উত্তর অংশে চলে যেতে হয় নি পরে দিয়েম গেলেন ফরাসীদের বিরুদ্ধে। সেই সংগে তাঁর কোপ-দৃষ্টি পড়ল এই লোকগুলোর উপরেও। ফলে, তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু কিছু লোক দেশের পশ্চিম অংশে পালিয়ে যায় এবং স্থানীয়ভাবে গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। তাদেরই কয়েকজন এসে যোগ দিল আমাদের সংগে। বাকীরা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে দিল আমাদের। এইভাবে সংগৃহীত হল মোট ১৭০টি আগ্নেয়াস্ত্র। অধিকাংশই পুরনো ধরনের। আর যোগাড় হল খুব সীমিত সংখ্যক গুলি।"

শান্ত স্বরে কুয়েত থাঙ বলে চললেন, "আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজেদের দলটিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করবার জন্য ৩০০ অস্ত্র ও তদনুযায়ী গোলাগুলি অধিকার করা; 'জনগণের আত্ম-রক্ষী বাহিনী'র নামে লিখিত প্রচার-পত্র বিলি করা এবং আমরা কেন সশস্ত্র আক্রমণের পথ ধরেছি তা শত্রুসৈন্যদের কাছে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা। নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী ছাড়াও, দূর প্রান্তের গ্রামগুলো থেকে ৫০০ লোকও যোগাড় করলাম। এদের কাজ হল, আক্রমণের শেষ পর্যায়ে ঘটনাস্থলে এসে অধিকৃত মাল-পত্র ও হতাহত যদি কেউ হয়, তাদের বহন করে নিয়ে যাবে। কাছের গ্রামগুলো থেকে কোনো লোক সংগ্রহ করলাম না। কারণ পরে তাদের উপর অত্যাচার হতে পারে।"

চান্দ্র নববর্ষের প্রাক্কালে আক্রমণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কারণ এরা জানত সেই সময় ততটা সতর্কতা থাকে না। তুয়া-হাই দুর্গটি হল বিশাল। দৈর্ঘ্যে এক হাজার গজ ও প্রস্থে আটশো গজ এই দুর্গকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ৭ ফুট উঁচু মাটির প্রাচীর। প্রাচীরের প্রতিটি কোণে রয়েছে মেশিনগানের জন্য উঁচু জায়গা। এছাড়া প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে ছোট ছোট সান্ত্রী-ঘাঁটি। পূর্বতন প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের ধন্যবাদ যে, দুর্গের ভিতরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান —তথা গুলি চালনার স্থানগুলোর বিন্যাস-ব্যবস্থা, সান্ত্রী পরিবর্তনের

সময় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকদিন আগেই কুয়েত থাঙ কয়েকজন স্কাউটকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন। ২০০০ সৈন্যের ভিতরে দুটি কম্পানি থাকত স্থায়ী পাহারার দায়িত্বে। বাকীরা নিরস্ত্র অবস্থায় ব্যারাকে ঘুমোত। তাদের অস্ত্রশস্ত্র তালা বন্ধ থাকত অস্ত্রাগারে।

ভিতরের স্কাউটরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভবনের চারিপাশে মাইন পেতে রেখেছিল। স্থির হয়েছিল, মাইনগুলোর বিস্ফোরণের শব্দই হবে আক্রমণের সংকেত। যথাসময়ে প্রচণ্ড শব্দে মাইনগুলো বিস্ফোরিত হল। আগুন লেগে গেল বেতার ভবন, কমাণ্ড পোস্ট এবং অন্যান্য বাড়িগুলোতে। এবং সেই অবসরে দক্ষিণ দিক থেকে ১২০ জন এবং উত্তর দিক থেকে ৮০ জন গেরিলা দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ল। অবশিষ্ট লোকেরা তে-নিন থেকে আসবার পথের উপর ওৎ পেতে রইল, যাতে সেদিক থেকে কোনো রকম সাহায্য না আসতে পারে। গেরিলারা নতুন অস্ত্র-শস্ত্রে তড়িৎ গতিতে নিজেদের সজ্জিত করে নিল। তারপর ঝটিকা আক্রমণ চালাল পাহারাদার মঞ্চগুলোর উপর। জ্বলন্ত ব্যারাকগুলো থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে এলো হুড়মুড় করে। কিছু আত্মসমর্পণ করল; কিছু ছুটল ট্রেঞ্চের ভিতরে। কিন্তু অধিকাংশই দেওয়ালের উপর দিয়ে ছুটে বাইরে গিয়ে সেখান থেকে গুলি চালাতে লাগল। কেউই কিন্তু আক্রমণ চালাতে সাহস করল না।

চারবছর পর ঘটনাটির স্মৃতি বুঝি কুয়েত থাঙের চোখে জল এনে দিল। ধরাগলায় বললেন, "এক নম্বর অস্ত্রাগারের ভিতরে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল অজস্র অস্ত্র। নতুন অস্ত্রের বহু বাক্স তখনো পর্যন্ত খোলাই হয় নি। এত বেশী অস্ত্র, যে আমরা সব বয়ে নিয়ে যেতে পারব কি না সন্দেহ। এমন সমস্ত অস্ত্র, যা আমি আগে কখনো দেখি নি। যেমন ৫৭ এম. এম. রিবয়েললেস্‌ রাইফেল। ওগুলো দিয়ে কি হয়, সে সম্বন্ধে আদৌ কোনো ধারণাই আমার তখন ছিল না। তবু নিলাম পাঁচটা। পরে ওগুলো শত্রুর এম-১১৩

ট্যাংক এবং অন্যান্য বাধার বিরুদ্ধে চমৎকার কাজ দিয়েছিল। মূল্যবান এত অস্ত্র-শস্ত্র ওখানে ফেলে আসা যে কি আপসোসের তা বলবার নয়। সেই ৫০০ কুলী ততক্ষণে নিরাপদে এসে পৌঁছে গিয়েছিল। তা'ছাড়া ইতিমধ্যে কিছু শত্রু সৈন্যও যোগ দিয়েছিল আমাদের পক্ষে। তারাও আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। কিন্তু সবাই মিলেও হাজারখানেকের বেশী নিতে পারলাম না। তার মধ্যে ছিল ৮০০ রাইফেল ও একগাদা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। আক্রমণের পৌনে হু'ঘণ্টার মধ্যে আমাদের দলটি আবার জংগলের ভিতরে ফিরে চলল। অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদের ভারে প্রত্যেকের ওজন তখন হয়ে পড়েছে দ্বিগুণ। পরিবহণের ব্যবস্থা থাকলে সূতি এবং অন্যান্য জিনিষের গাদা গাদা পোশাকও আমরা নিতে পারতাম।"

দিয়েমী বাহিনী গেরিলাদের খুঁজে বার করে অপহৃত অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধারের কোনোরকম চেষ্টা করেছিল কি না জানতে চাইলাম। কারণ সেটা এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। তুয়া-হাই'য়ের চারিপাশে দশ মাইলের একটি বৃত্ত রচনা করে অন্বেষণের কাজ চালালেই, গেরিলারা যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো ভোর নাগাদ উদ্ধার করা যেত।

জবাবে কুয়েত থাঙ বললেন, "পিছনে পিছনে শত্রুরা দুটি ব্যাটেলিয়ন পাঠিয়েছিল; কিন্তু তারা জংগলের ভিতর প্রবেশ করতে সাহস করে নি। পরবর্তী দিনটা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলাম। অবশ্য সেই সংগে গড়ে তুললাম সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। আমাদের লোক-জনেরা খুবই ক্লান্ত ছিল। তবু, ওই সমস্ত চমৎকার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য তারা ছিল প্রস্তুত। এমনকি কুলীরা পর্যন্ত। যাই হোক, তুয়া হাই দুর্গ আক্রমণের ফল হল দারুণ। দিন দুয়েক পর, একশ'র বেশী দিয়েমী পুতুল সৈন্য তুয়া-হাই থেকে সরে পড়ল। হাজার খানেকের উপর নতুন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আমরা আশেপাশেই রয়েছি, একথা জানবার সংগে সংগে প্রচণ্ড ভীত হয়ে সরকারী আমলারা আমাদের সংগে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করে দিল।

স্থানীয় পুতুল উৎপীড়করা অত্যন্ত নরম হয়ে পড়ল। তাদের ব্যবহার হয়ে উঠল অনেকটা মানুষের মতো। দিয়েমী দালালেরা এই সেদিনও যাদের ভীতিপ্রদর্শন করেছে, তাদের সংগেই তারা অতি বিনয়ের সংগে কথাবার্তা বলতে শুরু করল।

"যুদ্ধের ফলস্বরূপ যে ব্যাটেলিয়ানটি আমরা সংগে সংগে গড়ে তুলেছিলাম, সেটার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র রেখে দেওয়া হল। বাকীগুলো বিলিয়ে দিলাম অন্যান্য প্রদেশে। সেখানেও অস্ত্র-শস্ত্রের খুব প্রয়োজন ছিল। শত্রুর দমন-পীড়নের সংস্থাগুলো টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে আরম্ভ করল। সামান্য অস্ত্র হাতে নিয়েও মানুষ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল সব জায়গায়। ফলে শত্রুর সম্মান প্রচণ্ড ঘা খেল। 'জননী' কারবাইন আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করল চতুর্দিকে, এবং অচিরাৎ জন্ম দিতে শুরু করল সন্তান-সন্ততির। সংগ্রামের ক্ষেত্রে সূত্রপাত হল সম্পূর্ণ এক নতুন অধ্যায়ের।"

তুয়া-হাইয়ের লড়াইয়ে 'কর্মপন্থা' অমান্য করা হয়েছে বলে নেতারা মনে করেছিলেন কি না, আমার এই প্রশ্নের জবাবে কুয়েত থাঙ প্রশান্ত হাসির সংগে বললেন, "সত্যি কথা বলতে গেলে, লড়াইয়ের পরও বেশ কয়েক সপ্তাহ আমরা খুবই অশ্বস্তিতে অতিবাহিত কর্ি। কন্তু তার পরেই খবর এল, নেতৃবৃন্দ আমাদের কাজটিকে শুধু যে সমর্থন করেছেন তাই নয়; আন্তরিক অভিনন্দনও জানিয়েছেন। বস্তুতঃ রাতারাতি সমগ্র পরিস্থিতিটাই গেল বদলে। তুয়া-হাই আক্রমণের পূর্বে অন্যান্য প্রদেশ থেকে যে সমস্ত চিঠি-পত্র আসত, সেগুলো ভরা থাকত নৈরাশ্যপূর্ণ মনোভাবে। পাঠ করে আমরাও বিমর্ষ হয়ে পড়তাম। থাকত শুধু গ্রেপ্তার অথবা কোনো কমরেডের গিলোটিনে নিহত হবার সংবাদ। কিন্তু যে পথ আমরা ধরলাম, সেটা শুরু করবার পর থেকে চিঠি-পত্রের সুর গেল বদলে। ক্ষয়-ক্ষতির কথাও যে মাঝে মাঝে থাকত না তা নয়। কিন্তু আগের চাইতে অনেক কম। বেশী থাকত চতুর্দিকের সাফল্যের সংবাদ। হাতে অস্ত্র আসবার সংগে সংগে মানুষের মনোবল অনেক দৃঢ় হয়ে

উঠেছিল। খোলাখুলিভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রতিরোধ সংগ্রাম। যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরী হবার পর থেকে, সেই ১৯৬০ সালে প্রথম আমরা 'টেট' (চান্দ্রনববর্ষ) উৎসবের দিনে প্রাণ খুলে 'শুভ নববর্ষ' কথাটা উচ্চারণ করতে পারলাম। এই যুদ্ধ থেকেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌছুলাম যে, সংখ্যাগত শক্তি অথবা অস্ত্রশস্ত্র আসল কথা নয় ; আসল কথা হল মনোবল এবং স্থির প্রতিজ্ঞা। দক্ষিণ-ভিয়েতনামের বিশেষ পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে হলে রাজনৈতিক তথা সামরিক সংগ্রামের যে কতখানি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত অভিযানের পরিকল্পনা ও কার্যকারিতার মূল সূত্রটিকে, বিশেষ করে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরে ব্যবহার করা হতে থাকে। একটা কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই অভিযান সম্ভব হয়েছিল একমাত্র আমাদের লোকজনদের অসাধারণ মনোবলের জন্য। এবং এই মনোবলের উৎস ছিল পূর্বাহ্নে নিজেদের ভিতরে বিস্তারিতভাবে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা তথা তুয়া হাইয়ের ভিতরের কিছু সংখ্যক সৈন্যের মধ্যে যে রাজনৈতিক কাযকলাপ আমরা চালাতে পেরেছিলাম, সেইগুলো।"

অধিকৃত অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে ছিল গেরিলাদের অতি প্রিয় ৮১ এম. এম. ও ৬০ এম. এম. মর্টার। শ'খানেক গজের দূরত্ব থেকে তারা এই সমস্ত অস্ত্র মারাত্মক যোগ্যতার সংগে ব্যবহার করতে পারে

তুয়া-হাই-এর অভিযান যে রীতির সূত্রপাত করল, সেই অনুযায়ী একাধিক অভিযান পরে পরিচালিত হয়। তুয়া হাইয়ে যা করা হয়েছিল তা হল, পূর্বাহ্নে রাজনৈতিক প্রস্তুতি ; লক্ষ্যস্থলের অভ্যন্তরস্থ সৈনিকদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন ; স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে হতাহতদের তথা অধিকৃত মালপত্র বহনের ব্যবস্থা করা যাতে আক্রমণকারী ক্ষুদ্র দলটি সর্বক্ষণ এক শ' ভাগ সংগ্রাম ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে পারে; প্রতিটি অভিযানের শুরুতে অস্ত্র-শস্ত্রের চাইতে জনবল থাকবে বেশী, কিন্তু অভিযানের শেষে জনসংখ্যার চাইতে বেশী হবে অস্ত্রশস্ত্র ; আকস্মিক এবং দ্রুত নৈশ আক্রমণ ও দ্রুত সরে পড়া। ১৯৬১ সালের

শেষ ভাগে যখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং বিরাটাকারে হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হতে থাকে, তখন থেকে আরো অন্যান্য কৌশলেরও উদ্ভব হয়।

পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকেরা হয়তো তুয়া-হাইয়ের যুদ্ধকেই দক্ষিণ-ভিয়েতনামে যুদ্ধের আরম্ভ বলে স্থির করবেন। কিন্তু আমার ধারণা, অনতিবিলম্বেই এমন সমস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যার ফলে তাঁদের সেই মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হবে। তবু একটা কথা ঠিক। মার্কিন নীতি-নির্ধারকদের অধিষ্ঠিত এবং তাঁদের দ্বারাই প্রতিপালিত সায়গনের নো দিন দিয়েমের স্বৈরাচারি একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিরাটাকারে এবং সুসংগঠিতভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধের সেই হয়েছিল সূত্রপাত।

পরবর্তীকালে মুক্তিফ্রণ্ট সাংবাদিক সংঘের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সংগে আলাপ হবার পর বুঝেছিলাম, তুয়া-হাই-এর যুদ্ধ 'প্রথম' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে অন্য কারণে। এই যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল চিয়েন থাঙ (বিজয়) পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। পত্রিকাটি বর্তমানে পূর্ব নাম-বো'র (কোচিন চায়না) সশস্ত্র বাহিনীর সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদক হলেন ট্রুং থাঙ। বছরের পর বছর ধরে উন্মুক্ত স্থানে বাস করবার ফলে গায়ের চামড়ার রঙ তাঁর হয়ে গেছে বিবর্ণ আখরোট-বাদামী। ছিপছিপে যুবক। তাঁর কাছে শুনেছিলাম কিভাবে তিনি এবং সামান্য আরো কয়েকজন মিলে তুয়া-হাই-এর যুদ্ধের জন্যই বিশেষ করে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত করেন। নোট বই থেকে পাতা ছিঁড়ে তাইতে হাতে লিখে 'সংবাদপত্র' প্রকাশ করা হত। চালের গুঁড়ো দিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে কুড়ি কপি করে ছাপা হত এক-এক বারে। তারপর লিখতে হত আবার। সেই প্রসংগে বললেন, "সৈনিকেরা যখন আক্রমণ করতে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় আমরা প্রথম কপিগুলো বিলি করি। পত্রিকাটি তাদের খুব উৎসাহিত করে। আমি ছিলাম কমাণ্ড পোস্টের সংগে। দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম মাটির

উপর মুখ রেখে বন্দী শত্রুসৈন্যরা পড়ে আছে। তাদের মধ্যে আমাদের পত্রিকা বিলি করতে শুরু করে দিলাম। আমার কয়েকজন সহকর্মীকে কিছুক্ষণের জন্য কাগজের কাজ ছেড়ে লড়াইয়ে যোগ দিতে হয়েছিল। সেই থেকেই আমরা সৈনিক-সাংবাদিক রীতির প্রবর্তন করেছি। এরা একই সংগে যুদ্ধ করে এবং কলমও চালায়।" পত্রিকাটি কিভাবে হাতে লেখা অবস্থা থেকে টাইপকরা অবস্থায়, তারপর স্টেন্সিওটাইপ, এবং ১৯৬৩ সালের পর থেকে বর্তমান ছাপা অবস্থায় ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করেছে সে কথাও তিনি আমাকে জানালেন। বললেন, "প্রথম দিকে শুধুমাত্র সৈনিকদের মধ্যেই পত্রিকাটি হাতে হাতে প্রচারিত হত। বর্তমানে গ্রামে-গ্রামেও প্রচারিত হচ্ছে। গ্রামবাসী তথা স্থানীয় আত্মরক্ষী দলগুলোর মধ্যে পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।"

'জননী কারবাহন', ভুয়া-হাই-এর লড়াই এবং হস্তলিখিত সংবাদপত্র, এই তিনটি জিনিসকে কেন যে এত প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছিল তা নিয়ে কূটনীতিবিদ এবং ঐতিহাসিকগণ বছরের পর বছর ধরে বিতর্ক করতে থাকুন। আমি সরাসরি যা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম কেবলমাত্র তাই বলতে পারি; বর্ণনা করতে পারি চিত্রের খুটিনাটি বিষয় যার বাইরের রেখাগুলো দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে বেশ ভালভাবেই অঙ্কিত হয়েছে।

দিয়েমের ক্ষমতা দখল

সাধারণতঃ কোন যুদ্ধ, এমন কি গৃহযুদ্ধকেও সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন, প্রথম গুলি কখন এবং কোথায় চালানো হয়েছিল, তারও একটা নির্ভরযোগ্য হদিস মেলে। কিন্তু ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে এটা খাটে না। দক্ষিণ ভিয়েতনামে এই লড়াই কি ভাবে এবং কখন শুরু হয়েছিল, সে বিষয়ে আমি অক্লান্তভাবে খোঁজখবর করেছি। কিন্তু যত লোককে প্রশ্ন করেছি, প্রত্যেকের কাছ

থেকেই পেয়েছি ভিন্ন ভিন্ন উত্তর। প্রত্যেকেই নিজের গ্রাম, জেলা অথবা প্রদেশে গুলিবর্ষণের কথাটাই বিশেষভাবে বলেছে। সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য যে ব্যক্তিকে এ বিষয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি হলেন জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের প্রেসিডেণ্ট হুয়েন হু থো।

সায়গনে যখন তিনি আইন ব্যবসায় করতেন, তখন কিন্তু তাঁকে বামপন্থী বলে মনে করা হত না। ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তিনি কোন রকম অংশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে যখন ফ্রান্সের 'ঘৃণ্য যুদ্ধের' প্রতি সম্মতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সায়গনে তিনটি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ এসে পৌছায়, তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য একটি মিছিলের পুরোভাগে তাঁকে দেখা যায়। থো এবং বেশ কয়েক হাজার সায়গনবাসী এ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, এবং প্রতিবাদ মিছিলে যে বুদ্ধিজীবী দলটি অংশ-গ্রহণ করেছিল, থো তার নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধজাহাজ তিনটি পরের দিনই বন্দর ত্যাগ করে চলে যায় ; এবং ফরাসী কর্তৃপক্ষ হুয়েন হু থো'কে গ্রেপ্তার করে দিয়েন বিয়েন ফু'র উত্তরে লাউচাউ নামক এক দূরবর্তী শহরে বন্দী করে রাখে। বছর দুয়েক পর ভিয়েতমিন সৈন্যেরা তাঁকে মুক্তি দেয়। জেনিভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থো আবার সায়গনে আইন ব্যবসা সুরু করেন। সুতরাং তাঁকেই আমি আমার প্রথম প্রশ্নটি করলাম: "ব্যাপারটা কিভাবে শুরু হল? কোথায় এবং কখন প্রথম গুলি চলে?"

"সায়গন সম্বন্ধে বলতে গেলে, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার বার দিন পর, ১৯৫৪ সালের ১লা অগাস্ট তারিখে আমরা প্রথম সাংঘাতিক আঘাত পেলাম। একটা কথা আপনাকে বলতে পারি। জেনিভা সম্মেলন সার্থক হবার সংবাদ প্রচারিত হবার সংগে সংগে সায়গনের লোকেরা আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। দেশের দুটি অংশের পুনর্মিলনের জন্য দুই বৎসরের। পর অবশ্য কিছুটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবু বিদেশী শাসনমুক্ত শান্তি ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে পাবার বদলে এটাকে অতি সামান্য মূল্য বলেই

সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে। জেনিভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ঘটনাকে অভিনন্দন জানানো—তথা উদযাপনের উদ্দেশ্যে ১লা অগাস্ট তারিখে সায়গনে আনন্দোচ্ছল জনতার বিরাট এক সমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে জেনিভা চুক্তির শর্ত অনুসারে, রাজনৈতিক এবং সামরিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানিয়ে একটা প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেই দাবির জবাব এল এক ঝাঁক রাইফেলের গুলিতে। বহু লোক আহত হল; জনৈক গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেট এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল গুলিতে। আমরা ভেবেছিলাম দেশে শান্তি ও স্বাধীনতা ফিরে এসেছে। অথচ এই অবস্থায় সংগঠিত প্রথম জনসমাবেশকে এই রকম বর্বর উপায়ে দমন করা হল। ঘটনাটি বহু অত্যুৎসাহী মানুষের মনে প্রচণ্ড আঘাত হানল। সেই দিনই আমরা 'শান্তি তথা জেনিভা চুক্তি রক্ষা কমিটি' নামে একটি সংস্থা গঠিত করলাম। আমাকে নির্বাচিত করা হল তার সভাপতি।" পাশ্চাত্য দুনিয়ায় এই সংস্থাটি 'সায়গন-চোলোন শান্তি কমিটি' নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন সায়গনের বুদ্ধিজীবী মহলের সেরা মানুষেরা।

হুয়েন হু থো বলে চললেন, "স্পষ্ট বুঝলাম, নো দিন দিয়েমের নতুন সরকারও বাও দাই*-এর মতোই একটা পুতুল সরকার মাত্র; এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার প্রথম দিন থেকেই সে সরকার জনতাকে দমন করতে উঠে-পড়ে লেগে গেছে। এটা আমরা আশা করি নি; এবং ১লা অগাস্টের সেই রাতের ও তার পরবর্তী দিনগুলোর বহু বেদনাদায়ক স্মৃতি আমাদের মনে পড়ে। সায়গনে দমন-পীড়নের প্রথম গুলি চলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ১২০ দিন পরে।" কমিটির উদ্দেশ্য ছিল, চুক্তির শর্তগুলো যাতে যথাযথ প্রতিপালিত হয় এবং কোনো রকম সর্তলংঘন হলে তা সংগে সংগে যাতে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (চেয়ারম্যান হিসাবে ভারত; এবং

---

* ফরাসীদের অধীনে পুতুল সম্রাট। আমেরিকার সমর্থন পুষ্ট নো দিন দিয়েম তাঁকে সরিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসেন।

অন্যান্য সদস্য পোল্যাণ্ড ও কানাডা) নজরে আনা যায় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।

গ্রামাঞ্চলের চারিদিক থেকে প্রথমে একটু একটু করে, এবং তারপরেই ব্যাপকভাবে সংবাদ আসতে থাকে যে, জেনিভা চুক্তি অনুসারে যে সমস্ত অঞ্চল থেকে ভিয়েতমিন সৈন্যেরা ১৭ অক্ষরেখার উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে শুরু হয়েছে পাইকারি হারে ধর-পাকড় এবং হত্যা।

হুয়েন হু থো আবার বললেন, "আমাদের কমিটি গঠনের মাস দুয়েকের মধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসে সমগ্র গ্রামাঞ্চলে ওই ধরনের কমিটি গঠন করে দেবার জন্য আমাদের অনুরোধ করতে থাকেন। আমরাও তাঁদের সংগঠিত করতে আরম্ভ করলাম। এমন সময়, জেনিভা চুক্তির চার মাস পর, ১১ই নভেম্বর তারিখে হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে আমাদের কমিটি ভেঙে দিল এবং আমাকে ও আরো বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল।"*

একটু থেমে প্রেসিডেন্ট থো বললেন, "সে সময় আমাদের ধারণা ছিল না যে সায়গন কমিটি এবং তার বিভিন্ন শাখা গঠিত করে, ছয় বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের সূত্রপাত করেছি আমরা।"

গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাস

গ্রামাঞ্চলে যে সে সময় কি ঘটছিল, তার কিছু কিছু আভাস আন্তর্জাতিক কমিশনের সতর্ক বিবরণীগুলোতে পাওয়া যায়। প্রথম দিকে ছো দুয়োক-এর ঘটনা সম্পর্কে একটি বিবরণী আমার মনে পড়ে। সে সময় মধ্য-ভিয়েতনামের যে জায়গাটাতে আমি ছিলাম, সেটা ছিল

* এই ঘটনার সপ্তাহ খানেক পরে আমি সায়গনে যাই, এবং যে সমস্ত লোক বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের গ্রেপ্তারের খবর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রন কমিশনের সদর দপ্তরে দিতে আসছে, তাদের দিয়েমী পুলিশ গ্রেপ্তার করছে দেখতে পাই।

মধ্যযুগীয় দানব নো দিন ক্যানের (নো দিন দিয়েমের ভ্রাতা) জায়গিরের মধ্যে। কোয়াঙনাম্ প্রদেশের মুক্তিফ্রন্টের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য দিন্ ছাউয়ের কাছে আমি ঘটনাটির সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে চেয়েছিলাম। ছাউ আগে ছিলেন মাঝারি একজন চাষী। হাসিখুশি মুখখানা মনে হয় যেন গ্রানাইট পাথর কুঁদে বার করা। প্রথম দিকে এক সামরিক তৎপরতায় তাঁর একখানি পা খোয়া যায়। তৎসত্ত্বেও গোপন এক পার্বত্য ঘাঁটি থেকে তিনি অভিযানাদি পরিচালনা করতে থাকেন। বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত কর্মীদের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের অধিকাংশের মতো ছাউ'ও প্রথম থেকেই চুক্তিটির কার্যকারীতা সম্বন্ধে সায়গনবাসীদের চাইতে বেশী সন্দিগ্ধ ছিলেন। প্রশ্নের জবাবে বললেন :

"চুক্তিটির সংবাদ এখানে আমরা খুব একটা আশার সংগে গ্রহণ করতে পারি নি। অবশ্য সারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে ভেবে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম: এবং আমরা প্রতিরোধ কর্মীরা নিয়মানুবর্তিতার খাতিরে শপথ নিয়েছিলাম যে, চুক্তিটি মান্য করতে তথা শত্রু অথবা মিত্র কেউ যাতে কোনো রকমে লঙ্ঘন না করে সে জন্য যথাসাধ্য করব। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা চুক্তিটিকে মান্য করবে কি না সে সম্বন্ধে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

"আমাদের সন্দেহ যে অমূলক নয়, তা, শীঘ্রই পরে। এর ঘটনাবলীই প্রমাণ করে দিল। প্রতিরোধ সংগ্রামের শেষ কয়েক বৎসরে একমাত্র টুরেন নৌ-ঘাঁটি বাদে প্রায় সমগ্র কোয়াঙনাম্ মুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লি ভ্যান্ কিম্-এর নেতৃত্বে (পরবর্তী কালে যে সামরিক পরিষদ দিয়েমকে গদীচ্যুত করে, তার তিনি একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য হন।) এক দল সৈন্য সেই অঞ্চলে আসে। প্রদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত সো হুয়োক-এ একটি ইউনিট পাঠানো হয়। এবং কাউকে কোনো কথা না বলে সৈন্যরা নিজেদের ব্যারাক নির্মাণের জন্য অধিবাসীদের নিজস্ব বাগানগুলোর ফলগাছ এবং বাঁশঝাড় কাটতে শুরু করে। অধিবাসীরা

তখন সেখানে জমায়েত হয়ে এতে আপত্তি জানায়। কেউ কোনো রকম হিংসাত্মক কার্যকলাপ করে নি, কারো হাতে একটি সামান্য ছড়িও ছিল না। জনতার দাবী ছিল শুধুমাত্র একটি—তাদের সম্পত্তি নষ্ট করা চলবে না। কিন্তু ইউনিট কমাণ্ডার একটা কাগজ খুলে কি একটা হুকুমনামা পাঠ করল; এবং কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই সৈন্যরা জনতার প্রতি বারংবার গুলি চালাতে আরম্ভ করে দিল। রাইফেলের মুহুর্মুহু নির্ঘোষের সংগে মিলিত হল মর্মান্তিক আর্তনাদ এবং চীৎকার। গুলিবর্ষণ যখন থামল তখন জায়গাটা মৃত, মৃতপ্রায় এবং আহতদের দেহে ভরে গেছে। মোট ৪০ জন নিহতের মধ্যে অধিকাংই ছিল স্ত্রীলোক এবং শিশু। কারণ পুরুষেরা সে সময় ক্ষেতে কাজ করছিল। কিন্তু যারা রেহাই পেল, তারা বিরাট এক মনুষ্য তরংগের মতো ঘিরে ধরল সৈন্যদের। সৈন্যরা পালাল।"

"যথাসম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হল আহতদের। যাদের সরানো সম্ভব তাদের, এবং মৃতদেহগুলোকে কোন রকমে স্ট্রেচার তৈরী করে তাইতে তোলা হল। তারপর সেগুলো নিয়ে এক ক্রোধোন্মত্ত শোভাযাত্রা রওনা হল ব্যাটেলিয়নটির সদর দপ্তর অভিমুখে। ঘটনাটির সংবাদ আশেপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে স্ট্রেচার বাহকেরা পৌঁছুবার অনেক আগেই বিরাট এক জনতা এসে জমায়েত হল ব্যাটেলিয়ান সদর দপ্তরে। খালি হাতেই সেই জনতা ভিতরে প্রবেশ করে সৈনিকদের নিরস্ত্র করে ফেলল এবং রাইফেল ও কামানের নলগুলোতে ভরে দিল বালি। তারপর এসে পৌঁছুল স্ট্রেচার বাহকেরা। হতাহতদের নামিয়ে রাখা হয় ব্যারাকের বাগানে; এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবেরা দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি, আহতদের চিকিৎসা এবং মৃতব্যক্তিদের পরিবারবর্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে লাগল। ভীড় ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল। অবশেষে ব্যারাকগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলল তারা। ব্যারাক থেকে বেরুনোও সৈনিকদের পক্ষে হয়ে পড়ল অসম্ভব।"

"তিন দিন ধরে ১৫ হাজার মানুষের এক বিশাল জনতা ব্যারাক-

গুলোর চারপাশে আস্তানা গেড়ে রইল। স্বতঃস্ফূর্ত বদলী নিয়মের মতো একদল যায়, অন্যদল আসে। নিকটবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা চাল এনে অন্যদের জন্য ভাত রেঁধে দিতে লাগল। পতাকা এবং নিদারুণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার অসংখ্য লিখিত শ্লোগানে ভরে গেল চারিদিক। সেগুলোর মধ্যে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি থেকে শুরু করে, জেনিভাচুক্তির ঘোরতর অন্যায়ের জন্য মার্কিন-দিয়েম সরকারের নিন্দা, সব কিছু ছিল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ব্যাটেলিয়ানটির পক্ষে রেজিমেন্টের অপর দুই ব্যাটেলিয়ানের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা অথবা কথাবার্তা বলা পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়ল। এর উপর আবার সেই জনতা সৈনিকদের, বিশেষকরে যারা গুলি চালনার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে নি তাদের সংগে ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করল। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য পলাতক হল সেইখানেই। ১৫ হাজার মানুষের সেই জনতা অতি সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের মুখপাত্র নির্বাচিত করল এবং খাদ্যবস্তু সকলের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করতে লাগল। দেখেশুনে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, প্রয়োজন হলে তারা এই প্রতিবাদ অনির্দিষ্টকাল অবধি চালিয়ে যাবে।

"জনতার দাবী ছিল, সরকারী খরচে মৃতদেহগুলোকে কবরস্থ করা, আহতদের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, নিহতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, জনসাধারণের সম্পত্তি বিনষ্ট করা থেকে বিরত হওয়া এবং আন্তর্জাতিক কমিশন দ্বারা এ ব্যাপারে তদন্ত করা। অবশেষে এই সমস্ত দাবিই ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডার মেনে নিতে বাধ্য হল। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের একটি দল সেই অনুযায়ী হাজিরও হল একদিন। কিন্তু তাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য কোনো ফল হল না। উপরন্তু তারা যাতে জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ করতে না পারে, সে ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ করে ফেলল। তিন মাস পরে সেই রেজিমেন্টের সৈনিকদের সংগেই একই ধরনের আরো দুটি ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে ছিয়েন দান-এ নিহত হয় ৩০ জন, এবং কাম কক-এ নিহত হয়

৪০ জন লোক। শান্তি ফিরে আসবার আশা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হল মানুষের মন থেকে।"

দূর-দূরান্তবর্তী প্রদেশগুলোতে পরিভ্রমণ করে আমার ধারণা হয়েছে যে, যুদ্ধের সময় যে সমস্ত অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে ভিয়েতমিন নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল এবং বর্তমানে যাকে তারা 'মুক্তাঞ্চল' বলে থাকে, সেই সমস্ত অঞ্চলে ছো তুয়োকের ঘটনার মত বহু ঘটনাই ঘটেছিল। মতলব বোধ হয় ছিল, যুদ্ধ বিরতির প্রথম কয়েক সপ্তাহ অথবা মাসের মধ্যে ভিয়েতনাম গণ-ফৌজ এবং কর্মীরা চলে যাবার সংগে সংগে সন্ত্রাসের খড়্গ চালিয়ে জনসাধারণকে একেবারে পংগু করে দেওয়া।

জেনিভা চুক্তির শর্ত অনুসারে আন্তর্জাতিক কমিশনের তত্ত্বাবধানে ১৪০,০০০ সৈনিক ও কর্মী আপন আপন অস্ত্রশস্ত্রসহ উত্তরাঞ্চলে চলে যায়। তাদের বেশ কিছু সংখ্যক লোকের সংগে স্ত্রী-পুত্রাদি ছিল। এবং, উপদেষ্টাদের অধিবেশন তথা ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসের নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবার সংগে সংগে, দমনমূলক কার্যকলাপের তীব্রতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনসাধারণের তখনো আশা ছিল, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশাও ঘুচবে।

এতো গেল মধ্য ভিয়েতনামের পরিস্থিতির কথা। সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের আরেকটি অঞ্চলে গিয়ে আমি ফ্রন্টের কোয়াঙ নাম প্রাদেশিক কমিটির অপর একজন সদস্য হুইন থান-এর সংগে কথাবার্তা বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভদ্রলোক তুরেন-এ ডাক্তারি করতেন। ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজের পেশা পরিত্যাগ করেন। তারপর কয়েক সপ্তাহ মাত্র স্থায়ী শান্তির অবসানে আবার পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল বিশেষ করে তাম কাই-এর পার্বত্য জেলা সম্বন্ধে। দক্ষিণের কোয়াঙ নাই প্রদেশের লাগোয়া এই জেলাটির মধ্যে আন্নামী পর্বতমালার কিছুটা অংশ পড়ছে।

সেই প্রসংগে বললেন, "আমাদের ধারণা অন্যান্য জেলার চাইতে

তাম কাইতে 'অত্যাচার হয়েছে অনেক বেশী। কারণ, এই জেলাটি ছিল সম্পূর্ণরূপে মুক্ত একটি অঞ্চল। তাই, সেই সময় সায়গন কমাণ্ডের প্রতি প্রথম আদেশই ছিল, প্রতিরোধ প্রশাসনে অংশগ্রহণকারীদের নির্মূল করে দিয়ে, তাদের বদলে দিয়েমীদের প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। এই আদেশ কার্যকরী করবার জন্য অত্যাচার চালাতে হয়; এবং নতুন প্রশাসন কার্যভার গ্রহণ করেই অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। যে সমস্ত পুতুল সৈন্য ফরাসী বিরোধী যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল, তারাই এবার বিজয়ীরূপে ফিরে এলো এবং বাড়ি-ঘর, মন্দির ইত্যাদি দখল করে বাসিন্দাদের পথে বার করে দিল।

"প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পরই, প্রথম কাজ হল প্রতিরোধ সংগ্রামে যে যে-রকম ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেই অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করা। প্রথমে ওরা সামান্যতম অংশগ্রহণকারীদেরও তালিকা প্রস্তুত করতে মনস্থ করেছিল। কিন্তু সে ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। কারণ প্রতিটি সমর্থ স্ত্রী-পুরুষই প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। এমন কি সামান্য একটা পার্সেল কিংবা কোনো সংবাদ বহন করতে পারে এমন শিশুরাও বাদ যায় নি। সুতরাং সে মতলব ছেড়ে ওরা শুরু করল নিজেদের বিবেচনা মতো প্রত্যেকটি লোকের কাজের গুরুত্ব নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করতে। দিয়েমীরা যে সময় আসে, সে সময় আমার বহু কর্মীই প্রশাসনের কাজে নিযুক্ত ছিল। এ রকম সমস্ত কর্মীকে সারাজীবনের মতো কারারুদ্ধ করা হল। প্রকৃতপক্ষে কারারুদ্ধ হবার পর আর কেউ তাদের দেখেনি। অন্যান্যদের তিন অথবা ছয় মাস, কিংবা তারও বেশী সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি বেঁধে নিয়ে রওনা হতে হল 'কম্যুনিস্ট বিরোধী মতাদর্শে'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যোগদান করতে। বস্তুতঃ প্রথম বৎসরে প্রতিটি পরিবারকে রাস্তাঘাট, সৈন্য-ব্যারাক ও অন্যান্য সামরিক প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কার্যের জন্য গড় পড়তা আটমাস ধরে বেগার খাটতে হয়।"

"গ্রামে গ্রামে বহু ব্যারাক নির্মাণ করে তার মধ্যে যুবক-যুবতীদের পৃথক পৃথক কুটিরে গাদাগাদি করে রাখা হয়। সেখানে তাদের রাত্রিবাস করতে হত এবং নিয়মিতভাবে ভিয়েতমিন, হো চি মিন তথা উত্তর অংশ সংক্রান্ত সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা শুনতে হত। এসবের আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশপ্রেম ও প্রতিরোধ সংগ্রামের দিনগুলোর সমস্ত স্মৃতি, এমন কি রাজনৈতিক চিন্তারও মূলোচ্ছেদ করা। যাতে ওই সমস্ত সম্বন্ধে কারও মনে কোনো কিছু অবশিষ্ট না থাকে।"

হুইন থান কতগুলো নথিপত্র বার করলেন। তাঁর মতে অবশ্য সেগুলো ছিল অসম্পূর্ণ। যাই হোক, উক্ত নথিপত্র অনুসারে, দ্বিতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামে মুক্তিকৃত তাম কাই জেলার ১৮০,০০০ জন সংখ্যার ভিতরে ১৩,০০০ মানুষ 'নিখোঁজ' হয়েছে এবং ৭০০০ মানুষকে বন্দী করে রাখা হয়েছে বিভিন্ন কারাগারে। 'নিখোঁজ' ব্যক্তিদের অধিকাংশকেই হত্যা করা হয়েছে এবং বন্দী সাত হাজারের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ কারাগারের মধ্যে মারা গেছে বলে বিশ্বাস। অর্থাৎ প্রতি নয় জনের মধ্যে একজন হয় নিহত, নতুবা অনিশ্চিত কালের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছে। এই প্রসংগে জেনিভা সম্মেলনের ১৪সি অনুচ্ছেদ স্মরণ করা যেতে পারে :

"লড়াইয়ের সময় কোনো রকম কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রতিশোধমূলক কিংবা প্রভেদ-মূলক আচরণ করা হবে না বলে উভয় পক্ষই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, এবং তাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ করছে।"

আন্তর্জাতিক কমিশন তার প্রথম বৎসরের কার্যকালে দক্ষিণ অংশে উপরিউক্ত অনুচ্ছেদ লংঘনের চল্লিশটি ঘটনা তদন্ত করে। প্রকৃতপক্ষে যতগুলো ঘটনা ঘটেছিল, এটা হল তার খুব সামান্য একটা অংশ। এই ধরনের কোনো কোনো লংঘনের ঘটনায় হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। উপরে উল্লিখিত ৪০ টি ঘটনার ভিতরে, প্রথম

বৎসরের শেষ দিকে গিয়ে ১৬ টি ঘটনা যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হয়; ১৩ টি ঘটনায় তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু তদন্তের ফলাফল অপ্রকাশিত থাকে; ৮ টি ঘটনা তখন পর্যন্ত তদন্তাধীন ছিল এবং ৩ টি ঘটনায় সাক্ষ্য-প্রমাণাদির অপ্রতুলতার কারণে কোনো রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি বলে ঘোষণা করা হয়। লক্ষণীয় এই যে, উক্ত অনুচ্ছেদ লঙ্ঘণের কোনো ঘটনার সংবাদ উত্তর অংশ থেকে পাওয়া যায় নি। কোয়াঙ নাম ও কোয়াঙ নাইতে প্রেরিত আন্তর্জাতিক কমিশনের ২৪ নং ভ্রাম্যমান দলটি আট মাস সেখানে থাকে। এই আট মাসের মধ্যে মাত্র পনেরো দিন তারা কাজ করতে সমর্থ হয়। তারপর দলটিকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। ৬১ নং দ্বিতীয় একটি দলকে প্রথম দলটির সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দলটিকে এক শ' দিন ধরে অকেজো করে রাখা হয়। কাজ আরম্ভ পর্যন্ত করতে পারে নি। অবশেষে তাদেরও সরিয়ে আনা হয়; এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চলতেই থাকে। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ৪ নং প্রতিবেদনে বলা হয়:

"যে সমস্ত ক্ষেত্রে তদন্ত করা সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত ৩১৯ টি ঘটনার সত্যতা আমরা যাচাই করে দেখেছি··· উল্লিখিত ঘটনাগুলো ছাড়া প্রতিশোধাত্মক অথবা পক্ষপাতমূলক আর কোনো ঘটনা যে ঘটে নি সেটা নির্ণয় করতে কমিশন অপারগ হয়েছে।"

শান্তি স্থাপনের প্রথম বৎসরে হিসাব-নিকাশের কি চমৎকার একটি আংশিক চিত্র!

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে কোনো পরামর্শদায়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল না। তার আগেই ফরাসীরা আলজিরিয়াতে আর একটা বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক সামরিক ··· য মাতবার উদ্দেশ্যে জেনিভা চুক্তির দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে ভিয়েতনাম থেকে সরে পড়েছিল। এদিকে দিয়েমও অকৃপণ মার্কিন সাহায্য পেয়ে ফরাসী স্বার্থ প্রায় উচ্ছেদ করে এনেছিলেন এবং সশস্ত্র ধর্মীয়

সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করে ফেলেছিলেন। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাস এসে গেল; কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল না। অতি সরল কিছু লোক ছাড়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার আশা সকলের মন থেকে অন্তর্হিত হল। জুলাই মাসের পর থেকে আরো বর্ধিত হল সন্ত্রাসের মাত্রা। কারণ, নির্বাচনের আশা ধূলিসাৎ হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে বিরাট একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে বলে দিয়েম আশংকা করেছিলেন।

১৯৫৭ সালে 'কম্যুনিস্টদের নিন্দা করার' ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু হল। ইতিমধ্যে দিয়েম আন্তর্জাতিক কমিশনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, জেনিভা চুক্তির ১৪ সি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আর কোনো তদন্ত-কার্য তিনি সহ্য করবেন না। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা নভেম্বরের প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন, জেনিভা সম্মেলনের সহ-সভাপতিদের জানালেন: ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো অভিযোগের জবাব তাঁরা দেবেন না, এবং জেনিভা চুক্তিতে এই ধরনের অভিযোগ সম্পর্কিত ঘটনাবলীর তদন্ত করবার যে ব্যবস্থা রক্ষিত রয়েছে সেই অনুসারে তদন্তকারী দলগুলোকে কোনো রকম কার্যকলাপ চালাবার অনুমতিও তাঁরা দেবেন না।"

'কম্যুনিস্ট নিন্দা' প্রচার কার্যের বিস্তারিত একটি বিবরণী আমাকে দিয়েছিলেন মুক্তিফ্রন্টের কোয়াঙনাই প্রাদেশিক কমিটির সদস্য এবং একজন অভিজ্ঞ প্রতিরোধ কর্মী, লী কোয়াঙ বিন। তাঁর ভাষায়: "প্রথম দিকে আমাদের অঞ্চলে ওদের উস্কানিমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এমন কিছুই করা হয়নি যাতে দমন-পীড়ন চালাবার কোনো মিথ্যা অজুহাত ওরা পেতে পারে। তাই শুরু হল 'কম্যুনিস্ট নিন্দা' প্রচার অভিযান। দীর্ঘ-মেয়াদী এই অভিযানে আমাদের বহু শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মীদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়; যারা দেশের উত্তর অংশে চলে গিয়েছিল, তাদের স্ত্রীদের 'খাঁটিত্ব' প্রমাণের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ করে আবার

বিবাহ করতে বাধ্য করা হয়। প্রতিরোধ সরকারের ভূমি সংস্কার পরিকল্পনা অনুযায়ী যাদের মধ্যে জমি বিলি করা হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে জমি-জমা কেড়ে নিয়ে আবার দেওয়া হয় পূর্বতন জমিদারদের, এবং তাদের না পাওয়া গেলে, নো ক্যান-এর অন্তরংগ লোকজনদের। যে সমস্ত পরিবারের জনবল কম তাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে যে পারস্পরিক সাহায্য দল গঠন করা হয়েছিল, সেগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়। স্থানচ্যুত পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মী ও কৃষকদের হাজারে হাজারে ধরে পার্বত্য অঞ্চলে তথাকথিত 'কৃষি-উপনিবেশ'-গুলোতে প্রেরণ করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কৃষকেরা বহু সেচ ব্যবস্থা নির্মাণ করেছিল। সেগুলোকে হয় ভেঙে ফেলা হল, নইলে সেগুলো থেকে জল সরবরাহের উপর অস্বাভাবিক কর ধার্য করা হল। অধিকাংশ কৃষকই প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। সুতরাং জনসংখ্যার বিরাট একটি অংশ এই সমস্ত দমন-পীড়নের শিকার হল। কোয়াঙ নাই প্রাদেশিক রাজধানীতে ছয় হাজার মানুষকে স্থায়ীভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বহু মানুষকে জাহাজে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল পোউলো'কন্দর এবং অন্যান্য জেলে। জেলায়-জেলায়, গ্রামে-গ্রামে বহু নতুন নতুন জেলখানা তৈরী হল। প্রতিটি গ্রেপ্তারের অর্থই ছিল বর্বর অত্যাচার; এইটাই ছিল একমাত্র অলংঘণীয় নিয়ম। বন্দী কোনো ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক হতে রাজি হলে এবং প্রথম থেকেই ওদের সহযোগিতা করতে সম্মত হলেও, প্রাথমিক অত্যাচারগুলো থেকে তার রেহাই ছিল না।

"অর্থনৈতিক দুরবস্থা উঠল চরমে। দিয়েমীদের আগমণের এক বৎসরের মধ্যেই শুরু হল অনাহারে মৃত্যু এবং দুর্ভিক্ষ; বিশেষ করে সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে। ১৯৫৫ সালে উক্ত এলাকায় বহু লোক অনাহারে মৃত্যু বরণ করে। জনবল নেই, জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সেচ ব্যবস্থা ধ্বংস করা হচ্ছে। এই অবস্থায় আর কি আশা করা যেতে পারে? ভাতের বদলে জংলী আনারস আর গাছের মূল ইত্যাদি খেয়ে মানুষ কোনো রকমে বাঁচবার চেষ্টা করতে থাকে।

আখ ও রেশমের চাষও ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ দিয়েমীদের বক্তব্য ছিল মার্কিন চিনি ও নাইলনের কাপড় আমদানি করা অনেক সস্তা।"

এই ছিল ভিয়েতনামীদের দুর্দশার চিত্র। কিন্তু এর চাইতেও অন্ততঃ দশগুণ বেশী দুরবস্থা ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর। কোয়াঙ নাই প্রদেশে এদের সংখ্যা হল; বরং বলা চলে ছিল, ৮০ হাজারের মতো। এদের অধিকাংশই ছিল 'হার' সম্প্রদায়ের। এ ছাড়া কিছু কিছু ছিল ব'নাম, ক'দঙ এবং কর উপজাতীয় গোষ্ঠীর।

লী কোয়াঙ বিন আবার বললেন, "সেই সময়ের মোটামুটি পূর্ণাংগ তথ্যই রয়েছে আমাদের কাছে। কারণ চারটি পার্বত্য জেলাকে এবার বেশ শক্তভাবেই মুক্ত করা করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত, এই এক বৎসরে ওই অঞ্চলগুলোতে মহামারীতে মারা যায় দুই হাজার উপজাতীয় মানুষ। তাদের কোনো রকম সাহায্যই দিয়েমীরা দেয় নি। এ ছাড়া ছয় শত উপজাতীয় মানুষকে পাইকারী হারে হত্যা করা হয়েছিল। আর তাদের হত্যা করার ধরনও ছিল বিচিত্র। সাধারণতঃ জীবন্ত সমাধি দেওয়া হত কিংবা হাত-পা বেঁধে নদী অথবা পাহাড়ের খাতে ফেলে দেওয়া হত। এ ছাড়া ৪৫০ জন মারা যায় কারগারে; ৫০০ জনকে দালালেরা গোপনে হত্যা করে কিংবা গ্রেপ্তারের পর তাদের আর কোনো হদিস পাওয়া যায় না। এবং আরো ৫০০ মারা যায় অনাহারে। বহু গ্রামে প্রতি দশ জনের মধ্যে একজন মৃত্যুবরণ করে এইভাবে।"

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের দুশ্চিন্তার সেই সবে ছিল শুরু। বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মোড়ল অথবা সাধারণ মানুষের কাছে এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছি। নিদারুণ আতংক-জনক সেই সমস্ত বিবরণ, আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ানদের অথবা অস্ট্রেলিয়ায় শ্বেতাংগ-উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম বৎসরে তথাকার আদিবাসীদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেবার অমানুষিক ঘটনা-গুলোর স্মৃতি মনে পড়িয়ে দেয়।

সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি আমি হুয়েন হু থোকে করেছিলাম, তার উত্তর তাঁর সংগে সাক্ষাতের বহু পূর্বেই আমার জানা ছিল। তবু সায়গনের তরফ থেকে সেই প্রশ্নের সমর্থন পাওয়াটা কম কথা নয়। সে জবাব হল, সময় এবং স্থানের দিক থেকে বিচার করলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধের কোনো প্রারম্ভ নেই ; কারণ সেখানে যুদ্ধ কখনো শুরু হয় নি। শুরু হয় নি, কারণ যুদ্ধ কখনো থামে নি। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছে তা হল, ১৪০,০০০ ভিয়েতমিন এবং কর্মী উত্তর অংশে সরে যাবার পর, নিরস্ত্র এক জনতার বিরুদ্ধে একতরফা একটি যুদ্ধ চলতে থাকে। ফরাসীদের সেবা করার জন্য মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্রে ও ডলারে সজ্জিত যে সামরিক যন্ত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, সেই যন্ত্রকেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রাজনৈতিক প্রতিরোধের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রতিরোধকে ফরাসীরা কোনো দিনই দমন করতে পারে নি। এবং এই লেলিয়ে দেবার উদ্দেশ্য ছিল, দিয়েম যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, তার বিরুদ্ধে যে কোনো রকম প্রতিরোধকে জন্ম লগ্নেই দমন করা।

নবম পরিচ্ছেদ।

পার্বত্য অঞ্চলে স্ফুলিঙ্গ।
'কর' উপজাতীয়দের বিদ্রোহ।

নিচু করে টাঙানো একটা হাতে বোনা দোলনায় বসে একজন অথর্ব বৃদ্ধ ধীর অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কিছু একটা বলছিলেন। আর তাঁকে ঘিরে উবু হয়ে বসে সেই কথাগুলো শুনছিল ছয় জন মানুষ। মানুষগুলোর তামাটে রঙের শরীরে সামান্য কটি-বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কথা শেষ হবার পর লোকগুলো অন্য আরেকজনের দিকে ফিরে তাকাল। শেষোক্ত মানুষটি তাদের জাতের নন। পরনে তাঁর 'কিন' অথবা সমতলের ভিয়েতনামীদের কালো রঙের সুতির পোশাক।

বৃদ্ধ লোকটির সুন্দর সাদা চুলগুলো মাথার পিছন দিকে খোঁপা করে টেনে বাঁধা। পাতলা সাদা দাড়ি নেমে গেছে বুকের অনেকখানি অবধি। শীর্ণ দেহের কাঠামোর উপরে কুঞ্চিত কমলালেবুর মতো পাতলা চামড়ার একটা আস্তরণ। যে কয়টি দাঁত অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলো অনবরত শুপারি চিবুনোর ফলে হয়ে গেছে কালো কুচকুচে, এবং সেগুলোকে আবার উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মাড়ি পর্যন্ত ঘষে ফেলা হয়েছে। কানদুটিতে অজস্র বড়বড় ছিদ্র। এক কালে সে দুটোতে নানারকমের অলংকার ছিল। এখন আর নেই। হাতের কবজিতে তামার একটা বালা। কথা বলা শেষ করে তিনি দৃষ্টিহীন চোখ দুটিকে 'কিন' মানুষটির দিকে ফেরালেন, এবং তাঁর প্রতিটি কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল এই ভাবে। দুটি মানুষ কথা বলছে এবং উপজাতীয় গোষ্ঠীর বয়স্ক ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে সম্মতি অথবা অসম্মতি সূচক হুঁ-হাঁ শব্দ করছে।

বৃদ্ধ মানুষটি ছিলেন ক্ষুদ্র 'কর' উপজাতীয় গোষ্ঠীর নেতা ফো মাক জিয়া। যে সময়ের কথা বলছি, তখন এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪,৭০০ জনের মতো। ত্রান বো'র (আন্নাম) কোয়াঙ নাই প্রদেশের অন্তর্গত ত্রা বঙ জেলার পাহাড়ের পাদদেশে এরা বাস করত। যৌবনকালে ফো মাক জিয়া ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, এবং প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হবারও আগে তিনি তাঁর উপজাতীয় গোষ্ঠীকে ফরাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিলেন। বর্তমানে তিনি প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছেন, এবং উপজাতীয় গোষ্ঠীতে প্রচলিত হিসাব অনুসারে তাঁর বয়স হয়েছে ৯০ বৎসরেরও বেশী। 'এই হিসাব করা হয়, উপজাতীয় গোষ্ঠীটি যতবার তাদের 'রশ্মি' পরিবর্তন করে, অর্থাৎ পাহাড়ের পাদদেশে জংগল কেটে চাষের জমি উদ্ধার করে, সেই অনুসারে। প্রতিবার হাসিল করা জমি চাষ করা হয় মাত্র কয়েক বৎসর তার পর আবার বদলানো হয়। যাই হোক, এই ৯০ বৎসর বয়সেও তিনি ছিলেন গোষ্ঠীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। অন্যান্য উপজাতীয়দের মত, 'কর' উপজাতীয়রাও নিজেদের স্বাধীন পার্বত্য বন্য জীবনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, এবং তাদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করে না।

সমতলের অধিবাসী ভিয়েতনামী লোকটির নাম হল সাও নাম। এর আগে বহু বৎসর ধরে তিনি কোয়াঙ নাই প্রদেশের উপজাতীয়দের মধ্যে বসবাস করেছেন। 'কর' এবং বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। তাঁর কাছে জানতে পারলাম, একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বারংবার যে অন্তহীন কথাবার্তাগুলো চলছে তার সারমর্ম মোটমুটি হল এই রকম :

"শুকিয়ে আসা পুকুরে মাছগুলো যে ভাবে ধরা যায় আমাদের গোষ্ঠীকেও সেই ভাবে নিঃশেষে মেরে ফেলা হবে। আমাদের নতুন শিশু যত না জন্মাচ্ছে তার চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি মানুষগুলোকে ওরা মেরে ফেলেছে। দিয়েমী রাক্ষসগুলো আসবার পর থেকে মারা গেছে ৫০০ জনেরও বেশী মানুষ।"

"আপনার লোকজনদের দুঃখ-দুর্দশায় আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে।"

"ওরা আমাদের মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে ; মোষ, শুয়োর চুরি করে, সমতলে ক্রীতদাসরূপে যুবকদের ধরে নিয়ে যায়। এটা বেঁচে থাকা নয় ; এ হল জীবন্ত মৃত্যু।

"ওদের এই সমস্ত দুষ্কার্যের বিরুদ্ধে বহুবার আমরা একযোগে প্রতিবাদ জানিয়েছি।

"আমাদের দেখলেই, কিংবা গ্রামের মধ্যে আসলেই ওরা আমাদের অপমান করে ; আমাদের আচার-ব্যবহারকে অপমান করে, আমাদের স্ত্রীলোক অথবা বৃদ্ধের প্রতি কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন করে না। ওরা আমাদের পশু বলে ভাবে। ওরা চায় যাতে 'কর'-গোষ্ঠীর কোনো মানুষ যেন কখনো মাথা উঁচু করে না দাঁড়ায়।

"তবু আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আপনাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কথা আমি এবং আমার কমরেডরা খুব ভাল করেই জানি। তাই বলছি, আপনারা এই সমস্ত পশুদের থেকে দূরে অন্য কোনো জেলায় চলে যান।"

"বিনা যুদ্ধে আমাদের লোকেরা কখনো সরে যায় না। তা'করলে সেটা হবে আমাদের পূর্বপুরুষদের সমাধির অপমান। আপনি এবং আপনার বন্ধুরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে কত বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করেছেন। আমাদের সংগে যোগ দিয়ে আবার একসংগে কেন আপনারা যুদ্ধ করেন না? হয় একসংগে আমাদের লড়তে হবে, নইলে গাছের সংগে যেমন মোষগুলোকে বেঁধে রাখে, সেইভাবে আমাদেরও বাঁধা পড়তে হবে।"

"লড়াই করলে, দুঃখ-দুর্দশা বাড়বে অনেক বেশী। তার চাইতে আপনারা সরে যান না কেন? এখানে যেমন পাহাড় আর জংগল রয়েছে, পুকুরে মাছ রয়েছে, জংগলে প্রচুর প্রাণী রয়েছে, সেখানেও রয়েছে, একই রকম। বরং সেখানে গেলে শত্রুর পক্ষে আপনাদের প্রতি অপমান-অত্যাচার করা আরো কঠিন হয়ে পড়বে।"

"আপনাদের আত্মগোপনের স্থানগুলো দেখিয়ে দেবার জন্য ওরা যখন আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল, তখন আমরা কি এতটুকুও দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিলাম? আপনাদের অপমান করবার জন্য আমাদের যখন তারা মার-ধোর করেছিল, তখন কি এতটুকুও কেঁপেছিলাম?"

"আপনি এবং আপনার লোকেরা যে কতবড় বীর এবং সত্যাশ্রয়ী সে কথা আমরা কোনো দিন ভুলবো না।"

"তা হলে বিনা যুদ্ধে ভীরু হরিণের মতো আমাদের পালিয়ে যেতে বলবেন না। 'কর'-গোষ্ঠীর লোকদের সে কাজ করতে আমিও কোনো দিন বলতে পারব না। এই জংগল যতদিন না শেষ হয়ে যায়, পাহাড়গুলো যতদিন না ধ্বসে পড়ে, আকাশ যতদিন না ভেঙে পড়ে ততদিন এটা হতে পারে না। না! না! না!"

সাও নাম বললেন, "এবং এই ব্যাপারে অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরাও দৃঢ়ভাবে অসম্মতি প্রকাশ করল। এক বাক্যে উচ্চারণ করল 'না-না-না'; বলতে বলতে প্রায় চীৎকার করে উঠল সবাই। ফলে গ্রামের সমস্ত লোকজন ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।"

বৃদ্ধ আবার বললেন, "আগে আপনারা যখন প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন, তখন আমরা একযোগে লড়াই করেছি। কিন্তু এখন দেখছি আপনারা আর সেই আগেকার প্রতিরোধ যোদ্ধা নেই। যদি হতেন, তা'হলে আমাদের সমর্থন করতেন; পালিয়ে যেতে বলতেন না।"

"এখন আপনাদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী। ফলে দুঃখ-দুর্দশা আরো বাড়বে।"

"যুদ্ধ না করে আমরা পিছু হটব না।"

সাও নাম বললেন "এবং এই ভাবেই চলল কথাবার্তা। এ ধরনের তর্কাতর্কি কিন্তু এই প্রথম নয়। সমতল থেকে আমরা যারা পাহাড়-জংগলে পালিয়ে গিয়েছিলাম, 'কর'-গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের ব্যাঘ্র-বিক্রমে রক্ষা করেছিল। 'কর' উপজাতীয়দের মধ্যে ফো মাক জিয়া'র সম্মান যে কতখানি তা দিয়েমীরা জানত। তাই প্রথম প্রথম তাঁকে

নিজেদের দলে ভেড়াবার চেষ্টার কসুর করে নি। কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রামে কমরেডদের বিরুদ্ধে তাঁকে দিয়ে দিয়েমীরা বিশ্বাসঘাতকতা করাতে চায় দেখেই তিনি তাদের প্রতি থু-থু নিক্ষেপ করেন। এই ব্যাপারে গোষ্ঠীর সবাই ছিল দৃঢ়-সংকল্প। নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করেও, পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মীরা যে ওই অঞ্চলে লুকিয়ে ছিল, এ কথাটা কেউ দিয়েমীদের কাছে ফাঁস করে নি। ওদের লাঞ্ছনা ও কষ্ট দে'খ আমাদের খুব খারাপ লাগল; এবং আগে যে আলোচনা-সভার কথা বলেছি, তার একটু পূর্বেই আমরা ঠিক করলাম যে ওদের ওই স্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাবার পরামর্শ দেব। একটা জায়গাও আমরা নির্বাচন করলাম। সেখানে ওরা অনেকটা নিরাপদে থাকবে। সেখানকার পরিস্থিতিও তাদের বর্তমান স্থানের চাইতে অনেকাংশে ভাল। বৃদ্ধ লোকটিকে এ ব্যাপারে সম্মত করানোর ভার পড়েছিল আমারই উপরে।"

উপরের আলোচনা সভার পরের দিন রাত্রিবেলায় 'কর' উপজাতীয় পুরুষদের একটি সভা বসল, এবং কয়েকদিন পর, তিওরিও সামরিক ঘাঁটির খুব কাছাকাছি গ্রামটিতে একটি ভোজের আয়োজন করা হল। বৃদ্ধ মোড়লকেও বহন করে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। এই ঘাঁটিটি ছিল তাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল। প্রচুর খাদ্যদ্রব্য এবং পচা ভাত থেকে তৈরী 'শাম শাম' নামক তীব্র এক প্রকার মদ প্রচুর পরিমাণে পরিবেশিত হবে শুনে একজন বাদে সায়গন গ্যারিসনের সব কটা লোক বেশ ভারিক্কি চালে গিয়ে হাজির হল সেখানে। 'কর'-গোষ্ঠীর লোকেরা চিরদিনই অতিথি-বৎসল; এবার তারা অতিথিপরায়ণতার চূড়ান্ত করে ছাড়ল। 'শাম শাম' যখন আপন কাজ শুরু করে দিয়েছে, সেই সময় বৃদ্ধ মোড়লের ইংগিতে গোষ্ঠীর ৫৪ জন যুবকই ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্যারিসনটির উপর। তারপর এক এক করে হত্যা করল প্রত্যেকটি মানুষকে। গোষ্ঠীর কয়েকজন আবার ধেয়ে গেল সামরিক ঘাঁটিটির দিকে। কিন্তু সেখানকার একমাত্র সান্ত্রীটি তখন পালিয়ে গেছে। ফলে, 'কর' উপজাতীয়

গোষ্ঠীর হাতে পড়ল ৫৪টি অস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে এই ঘটনা ঘটে ; এবং আমি যতদূর জানতে পেরেছি তাতে, মধ্য ভিয়েতনামে 'অপর' পক্ষ থেকে সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা সেই ছিল প্রথম, এবং সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রথম ঘটনাগুলোর অন্যতম।

সাও নাম আবার বললেন, "ব্যাপারটা শুনে আমরা আঁতকে উঠেছিলাম। প্রথমতঃ, এটা ছিল 'কর্মপন্থা'কে স্পষ্ট অমান্য করা এবং দ্বিতীয়তঃ, জানতাম এই বিদ্রোহকে সাংঘাতিক কঠোরতার সংগে দমন করা হবে এবং 'কর' ও অন্যান্য উপজাতীয় গোষ্ঠীকে সম্ভবতঃ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হবে।"

প্রতিক্রিয়া সত্যিই হয়েছিল দ্রুত এবং সাংঘাতিক। 'কর'দের নির্মূল করবার জন্য ত্রা বঙ জেলায় পাঠানো হয়েছিল ২নং দিয়েমী ডিভিশন এবং আরো ১৩টি কোম্পানিকে। ত্রা বঙ যেতে হলে ত্রা মি এবং সন হা এই দুটি জেলার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। যাবার পথে সৈন্যদল সমস্ত গ্রামগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় এবং গ্রামবাসী দের পাইকারিহারে হত্যা করে। এর ফলে সারা অঞ্চলে ওদের প্রতি জমে ওঠে নিদারুণ ঘৃণা, যার হিসাব-নিকাশ তোলা থাকে পরবর্তী কালের জন্য। 'করে'রা অবশ্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। তারা হল সুদক্ষ শিকারী। বন্যজন্তুর কবল থেকে ঘর-বাড়ি ও ক্ষেত-খামার রক্ষা করবার ব্যাপারে তারা সিদ্ধহস্ত। সুতরাং গ্রামে প্রবেশ করবার সমস্ত পথ-ঘাটে এবং চারিপাশে তারা সাংঘাতিক ধরনের সমস্ত মৃত্যু-ফাঁদ পেতে রাখে। উপজাতীয়দের অভিজ্ঞতার সংগে আদান-প্রদানের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে যে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের পূর্ণাঙ্গ ও উন্নত ধরনের ফাঁদ আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেগুলোর তুলনায় এই ফাঁদগুলো অবশ্য ছিল অনেক নিকৃষ্ট। তবু কার্যকারীতার দিক থেকে ছিল মারাত্মক। উপর থেকে কে .না জায়গা দেখে হয়ত মনে হবে কঠিন ভূমি। কিন্তু এক কিংবা একাধিক সৈনিক তার উপরে পা দেবার সংগে সংগে পুরো জায়গাটা ধ্বসে পড়বে কয়েক ফুট গভীর

গর্তের মধ্যে। সেই সংগে লোকগুলোও গিয়ে গেঁথে যাবে সুঁচের মতো তীক্ষ্ণ ও ইস্পাতের মতো কঠিন বাঁশের ফলায়। শূলবিদ্ধ গুটিকয়েক সৈনিকের অবস্থা দেখেই বাকীদের উৎসাহ উবে যায়। ভুট্টা ক্ষেত নষ্ট করতে হাতির পাল প্রায়ই চড়াও হয়; এবং তাদের শায়েস্তা করবার জন্য 'করে'রা বিশেষ একধরনের ফাঁদ পেতে রাখে। তাতে ওই ধরনের বাঁশের বর্শা এত জোরে নিক্ষিপ্ত হয় যে, সেগুলো হাতির পেটে সম্পূর্ণ ঢুকে যায়। আর এক ধরনের ফাঁদ রয়েছে তাতে কেউ হয়ত সামনে গর্ত করা ফাঁদ পাতা আছে সন্দেহ করে জমিটাকে টোকা দিয়ে দেখল। সংগে সংগে ছোট্ট একটা তার লাফিয়ে উঠবে। পরক্ষণেই মাথার উপরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে পাথরের চাঙড়।

অন্যান্য উপজাতীয়দের মতো এরাও অতর্কিত আক্রমণ ও নিঃশব্দে সরে পড়বার বিদ্যায় স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধহস্ত। যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তারা অধিকার করেছিল, সেগুলো ছাড়াও তাদের কাছে ছিল ঘরে-তৈরী 'করবন্ধ পতংগ' বন্দুক। ভয়াবহ, ঘণ্টা-মুখের এই অস্ত্রগুলো এক-এক বারে এক গাদা করে ছট্‌রা-গুলি কয়েক গজ দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুর উপর নিখুঁতভাবে নিক্ষেপ করতে পারে। জংগলের কোনো পথ রক্ষা করতে হলে, পূর্বনির্ধারিত স্থানে শত্রু উপস্থিত হবার সংগে সংগে একজন গেরিলা একটা দড়ি ধরে নাড়া দেয়। অমনি গুলি ছোটে। এমনও দেখা গেছে যে, একবারের গুলি চালনায় অকেজো হয়ে গেছে এক ডজন সৈন্য। দিয়েমী সৈন্যরা অবশ্য যে অস্ত্রটিকে সব চাইতে বেশী ভয় করত, সেটি হল ধনুক আর বিষাক্ত তীর। এই ধরনের তীরে সামান্য একটু আঁচড় লাগলেই তৎক্ষণাৎ সারা শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসে অবধারিত মৃত্যু। ধনুকের ছিলার মৃদু শব্দ থেকে ধরাই যায় না যে কোন দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

যাই হোক, 'কর'দের গ্রামগুলোতে পৌছুবার অনেক আগে থেকেই দিয়েমী সৈন্যেরা ফাঁদের ভিতরে এবং অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়তে লাগল। অথচ 'কর'দের কোনো দেখা নেই।

অদৃশ্য শত্রুর হাতে প্রতিদিন ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করতে করতে বহুদিন ধরে জংগলের ভিতর দিয়ে শম্বুকগতিতে অগ্রসর হয়ে সৈন্যেরা যখন 'কর' গ্রামগুলোতে হাজির হল, তখন সেখানে সব ফাঁকা এবং শান্ত। বৃদ্ধ ফো মাক জিয়া'র সম্মান রক্ষিত হয়েছিল। কারণ তাঁর লোকেরা যুদ্ধ করেছে। সুতরাং সবাইকে নিয়ে তিনি দূর অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিরিখাতের পাশে নকল গুহা কেটে তার মধ্যে 'করে'রা নতুন ঘরবাড়ী তৈরী করেছিল। সেই নতুন এলাকার প্রতিটি প্রবেশ পথে এবং বাড়ি-ঘর ও খেত-খামারের চারিধারে তারা স্থায়ীভাবে পেতে রেখেছিল জটিল সমস্ত মরণ-ফাঁদ।

'কর'দের শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রথম পিটুনি অভিযানটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তিও-রিও-র ঘটনার তিন মাসের মধ্যে ব্যাটেলিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে আরো বড় আকারের ৬৫টি সামরিক অভিযান তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। কোয়াঙ নাই পার্বত্য অঞ্চলের এই প্রথম অগ্নি-স্ফুলিংগকে সম্পূর্ণরূপে দাবিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা দিয়েম খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন। কিন্তু নতুন 'কর' গ্রামগুলোতে তাঁর সৈন্যেরা কোনো দিন পৌঁছুতেই পারে নি। বরং, 'কর'দের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে, এবং এই বিদ্রোহের সংগে সর্বরকম সম্পর্কশূন্য গ্রামগুলোতে বর্বর অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে অন্যান্য উপজাতীয় গোষ্ঠীরাও বছরের পর বছরের অসহনীয় নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবশেষে প্রত্যাঘাত হানতে শুরু করে। ফলে, যাবার পথে দিয়েমী সৈন্যেরা যে সমস্ত গ্রাম বিনা বাধায় জ্বালিয়ে দিয়েছিল, ফেরার পথে সেই সমস্ত গ্রামেই অকস্মাৎ চতুর্দিক থেকে তাদের প্রতি ছুটে আসতে থাকে ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি।

'কর' নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে, উল্লিখিত প্রথম তিন মাসে তাঁরা ১,২০০ শত্রুসৈন্য হতাহত করেছিলেন। জনৈক উপজাতীয় যুবক আমাকে বলে, "ওদের আমরা হত্যা করতে চাই নি ; চেয়েছি শুধুমাত্র আহত করতে। মৃতদেহগুলোকে ওরা সোজা পাহাড়ের খাতে অথবা জংগলে নিক্ষেপ করে ; কিন্তু আহতদের বয়ে নিয়ে যেতে হবেই।

ওই পাহাড়ী পথে একজন আহত ব্যক্তিকে তার সাজ-সরঞ্জামসহ বহন করে নিয়ে যেতে লাগে চারজন মানুষ। সুতরাং, একজনকে আহত করবার অর্থ হল পাঁচজনকে অকেজো করে দেওয়া। কোনো কোম্পানির এক ডজন সৈন্যকে আহত করে দিতে পারলেই, কোম্পানিটি তখন আর লড়াইয়ে বাহিনী থাকে না।"

উপরের বক্তব্যটি অবশ্য সর্বক্ষেত্রে সঠিক ছিল না। কারণ পরবর্তীকালে দিয়েমীরা তাদের চলৎশক্তিহীন আহত সৈনিকদের গুলি করে মেরে ফেলত। মধ্য ভিয়েতনামে অন্ততঃ এ ব্যাপার বহুবার ঘটেছে; এবং এ রকম অসংখ্য ঘটনার কথাও আমি শুনেছি। এ ছাড়া, এমন বহু দিয়েমী সৈনিকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যারা আহত হবার পর তাদের নিজেদের অফিসারেরাই আবার গুলি করেছে, এবং মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে গেছে। পরে তাদের জীবিত দেখে গেরিলারা তুলে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসাদি করে বাঁচিয়ে তোলে।

সামরিক অভিযান দিয়ে 'কর'দের নিশ্চিহ্ন করতে না পেরে, দিয়েমীরা তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ছিল লবণের মতো অত্যাবশ্যক দ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া। এই প্রসংগে সাও নাম আবার বললেন, "ঘটনার গতি দেখে আমরা, অর্থাৎ পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মীরা ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ি। সেই সংগে, দুর্ধর্ষ 'করে'রা যে ভাবে তখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে অবাক হয়ে যাই। কিছু একটা অবিলম্বে করা দরকার। তাই, প্রদেশের যে সমস্ত পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মীদের যোগাড় করা গেল, তাদের নিয়ে আমরা একটা পরামর্শ সভায় বসলাম। স্থির হল, 'কর'দের যাতে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া যায়, অন্ততঃ পক্ষে সেই চেষ্টাও করতে হবে। সাধারণত সমতলের লবণ ও ঔষধপত্রের সংগে 'করে'রা দারচিনি ও চায়ের বিনিময় করে। আমরা স্থির করলাম, অন্যান্য জেলায় ভিতর দিয়ে ওদের মালপত্র যাতে বাইরে যেতে পারে এবং সমতল থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ওদের কাছে পৌঁছুতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করব। এর পরই, পাহাড়

এবং সমতলের মধ্যে রাতের অন্ধকারে মানুষের বিরাট কাফিলা চলাচল শুরু করল এবং 'কর'দের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থাও রাতারাতি উন্নত হল। বিভিন্ন ধরনের ঔষধিও আমরা সংগ্রহ করলাম এবং নতুন 'কর' গ্রামগুলোর চারপাশে সেগুলোকে রোপণ করলাম। বাঁশ এবং নল-খাগড়ার মূল পুড়িয়ে এক ধরনের লবণ প্রস্তুত প্রণালীও ওদের শিখিয়ে দেওয়া হল, এবং এক ধরণের গাছের ছালও তাদের দেখিয়ে দেওয়া হল যার কষ লবণের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে। তাদের ওই পার্বত্য অঞ্চলে ধানের চাষ করা ছিল মুশকিল। তাই ম্যানিওকের কন্দ জোগার করে সেগুলোর চাষ করতে ওদের রাজি করালাম; যাতে ওদের চালের অভাব পূরণ হতে পারে। আমাদের এই সমস্ত সাহায্য পেয়ে বৃদ্ধ ফো মাক জিয়া অভিভূত হয়ে পড়লেন। আমাদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস আরো বর্ধিত হল।"

ফো নিয়া'র অস্ত্র-শস্ত্র।

ইতিমধ্যে 'ত্রী' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেও এক অভিনব এবং অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যায়। অতীতে এই উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোক নিয়ে ফরাসীরা একটি পুতুল ব্যাটেলিয়ন গঠন করেছিল। দিয়েম ক্ষমতায় এলে, উক্ত ব্যাটেলিয়নটিও তাঁর অধীনে আসে। এই গোষ্ঠীর অন্যতম অতি সম্মানিত নেতা ছিলেন ফ... দের অধীনস্থ জনৈক আঞ্চলিক সহকারী সর্দার ফো নিয়া। ছোট খাটো, শান্ত-ধীর মানুষ। মাথাটা দেখে রেড ইণ্ডিয়ান যোদ্ধা-সর্দার বলে মনে হয়। প্রথম প্রতিরোধ লড়াই শুরু হতেই তিনি 'বৃদ্ধ' হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন, এবং সন হা জেলায় নিজের গ্রামে চলে যান দিয়েমী শাসন প্রবর্তিত হবার পর, পূর্বতন প্রতিরোধ কর্মীদের খুঁজে বার করবার জন্য তাঁর গ্রামেও যথারীতি বর্বর অত্যা... চালানো হতে থাকে। উপজাতীয় গোষ্ঠীর বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। মেয়েদের উপর বলাৎকার, গৃহপালিত পশু-পক্ষী চুরি কিছুই বাদ যায় না। এই সমস্ত দমনমূলক অত্যাচারের ফলে ফো নিয়া আত্মগোপন করে

ছিলেন। 'কর' বিদ্রোহের সংবাদ শুনেই তিনি প্রকৃত তথ্য জানবার উদ্দেশ্যে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। তারপর স্থির করলেন তাঁর গোষ্ঠীও বিদ্রোহ করবে।

'হ্রী' গোষ্ঠীর অধিকাংশ দুঃখ-দুর্দশার মূলে ছিল দিন গো এবং দিন এন-এর অধীনস্থ পূর্বোক্ত পুতুল ব্যাটেলিয়নটি। ফো নিয়ার মতো মানুষও তাদের হৃদয় পরিবর্তন করতে এবং অন্তরে জাতীয় সংহতির ভাবধারা জাগরূক করতে অনেক চেষ্টা করে ছিলেন। কিন্তু সাও নাম-এর কথায়, "দীর্ঘকাল যাবৎ ঔপনিবেশিকদের দ্বারা দুর্নীতিগ্রস্ত হবার ফলে তারা হত্যা এবং লুণ্ঠনে ভয়ানকভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল; এবং যে বিশ্বাসঘাতকতার সূত্রপাত করেছিল ফরাসীরা, সেই দুষ্কার্যের জন্যই দিয়েমীরাও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও পুরস্কারের ব্যবস্থাদি যথাযথ চালু রাখে।"

অবশেষে ফো নিয়া স্থির করলেন, ব্যাটেলিয়নটির সংগে একটা বোঝা-পড়া করতে হবে। সেই অনুসারে ব্যবস্থাদি করলেন নিখুঁত ভাবে। বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ নির্মাণের কলা কৌশল শেখালেন তাঁর লোকজনদের। শেখালেন 'সুঙ ভান নাঙ' অর্থাৎ 'দশহাজার ফলদায়ক' বন্দুক ব্যবহারের কলা-কৌশল। আদিম ধরনের এই বন্দুকে রবারের ফিতা দিয়ে একটি পিন লাগানো থাকে ঘোড়া হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যে কোন হালকা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেট এতে ব্যবহার করা যায়। উপজাতীয় যোদ্ধারা সাধারণতঃ যে দূরত্ব থেকে এই বন্দুক ব্যবহার করে তাতে যে কোনো লক্ষ্যবস্তুকেই সঠিকভাবে আঘাত করা যায়। এ ব্যাপারে এই বন্দুকের কার্যকারীতা 'করবদ্ধ পতঙ্গ' বন্দুকের মতই। ভাঙা এরোপ্লেন অথবা মোটর গাড়ির ধাতব অংশ স্থানীয় কামারশালে আগুনে পুড়িয়ে, পিটিয়ে পিটিয়ে উপযুক্ত ব্যাসের নিখুঁত সোজা, সরু একটি ছড়ির মতো করে তৈরী হয় বন্দুকের নল। নলটাকে পরে আর একবার আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। যাই হোক, শীঘ্রই গোষ্ঠীর প্রায় প্রতিটি মানুষ একটি করে এই ধরনের বন্দুক হাতে পেল।

১৯৫৯ সালের জুলাই মাস থেকে ফো নিয়া শুরু করলেন তাঁর অতর্কিত-তথা নৈশ আক্রমণ। এই সমস্ত আক্রমণে উক্ত ব্যাটেলিয়নের ব্যারাকগুলোর খড়ের চালা লক্ষ্য করে আড়ধনু থেকে নিক্ষেপ করা হতে লাগল আগুনে তীর। তিন মাস ধরে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করে অবশেষে ব্যাটেলিয়নটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। সন হা জেলাটি বর্তমানে রয়েছে মুক্তিফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে। ফ্রন্ট কর্মীদের সতর্ক তথ্যাদি অনুসারে, ফো নিয়া'র প্রথম আক্রমণের ছয় মাসের মধ্যে দিয়েমী বাহিনী সন হা জেলায় ১০২টি 'শত্রু নিধন' অভিযান চালায়। কিন্তু সুপরিকল্পিত গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে ফো নিয়া প্রতিটি অভিযানেরই সার্থক মোকাবিলা করেন। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে তাঁর লোকজনদের যুদ্ধ নিনাদ ছিল: "যে রক্ত, হাড় এবং সম্পত্তি শত্রুরা চুরি করেছে, সেগুলো তারা ফিরিয়ে দিক।" পূর্বের মতো এখনও ফো নিয়া হলেন সামরিক তথা রাজনৈতিক সহজাত একজন নেতা; এবং বর্তমানে তিনি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সন হা জেলা কমিটির প্রধান।

সাও নাম বললেন, "ফো নিয়া'র নাম শুনলেই দিয়েমী সৈনিকদের হৃদয় ভয়ে কাঁপতে থাকত। পরবর্তীকালে উক্ত পন্থা অনুসরণকারী প্রত্যেকটি 'ত্রী' উপজাতীয় নেতাই ফো নিয়া'র নামেই তাঁদের তৎপরতা চালিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত রূপকথা এতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ফো নিয়া তাঁর লোকজনদের এক রকম যাদুকরী ঔষধ দিয়ে বুলেটের আঘাত থেকে রক্ষা করে থাকেন। আসলে জাদু কিন্তু তাঁর ছিল অন্যত্র। তা হল, প্রতিটি লড়াইয়ে তাঁর অতি সতর্ক প্রস্তুতি এবং নিজেদের গ্রামগুলো রক্ষা তথা বিগত পাঁচ বৎসরের সীমাহীন বর্বর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর অনুগামীদের অত্যুচ্চ মনোবল।

আদিম ধরনের অস্ত্র-শস্ত্রের উন্নতি বিধানের কাজ ফো নিয়া চালিয়ে যেতে থাকেন; এবং ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এই ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোর উপজাতীয় অস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে

পারস্পরিক অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানও শুরু হয়ে যায়। 'করবদ্ধ পতঙ্গ' ও 'দশহাজার ফলদায়ক' বন্দুকের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। স্টেনগানের বুলেট থেকে শুরু করে যে কোন ধরনের বুলেটই এ সমস্ত বন্দুকে ব্যবহার করা যায়। বুলেটগুলো বন্দুকের নলের সঠিক মাপ অনুযায়ী না হলেও ক্ষতি নেই। এ ছাড়া, আরো একটা সুবিধা হল, প্রয়োজনের সময় খুব সহজেই এগুলোকে নিড়ানি অথবা লাঙলের হাতলের মতো ব্যবহার করা চলে। হঠাৎ কোনো শত্রু সামনে এসে পড়লে, ল ঙলের হাতলে একটা ঝাঁকানি দিলেই সেটা হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক একটি অস্ত্র। এবং এগুলো ব্যবহার করে পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালকেরা সবাই। স্থানীয় কামারেরা এগুলো তৈরী করে কাতারে কাতারে। বুলেটের অভাব হলে কার্তুজের শূন্য খোলে বাড়িতে তৈরী ব:রুদ ভরে নেওয়া হয়। এই বারুদ তারা তৈরী করে বাদুড়ের বিষ্ঠা পুড়িয়ে। বাদুড়ের বিষ্ঠায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শোরা। তার সংগে মেশানো হয় বিশেষ এক ধরনের গাছের ছা:লের ছাই। গুলি করবার জন্য ব্যবহৃত হয় সাইকেলের বল-বিয়ারিং থেকে শুরু করে যে কোনো জিনিস।

আরেক ধরনের অস্ত্র হল 'বে দা'। প্রস্তরযুগের অস্ত্রের মতো এই অস্ত্রগুলো বক্সুর পার্বত্য অঞ্চলে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 'করে'রা যে অঞ্চলে নতুন বসতি স্থাপন করেছিল, সেই অঞ্চলের পক্ষে এই ধরনের অস্ত্র হল সর্বাধিক উপযোগী। আর, এই অস্ত্র বিন্যাসের কৌশলও অদ্ভুত। শত্রু-সৈন্যের অনুমিত আকার অনুযায়ী, অতর্কিত আক্রমণের জন্য নির্ধারিত সম্পূর্ণস্থান জুড়ে তৈরী করা হয় অনেকগুলো শক্ত বাঁশের মাচা। জনৈক উপজাতীয় ব্যক্তির ভাষায় 'মোষের মতো বিরাট বিরাট' সমস্ত পাথরের চাঁই টেনে তোলা হয় সেই সমস্ত মাচার উপরে। মাচাগুলো সংযুক্ত করা হয় একটি তারের সংগে। শত্রু সৈন্যের সম্মুখ ভাগ সেই ফাঁদের সারির শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেলেই, সৈন্যের সম্পূর্ণ সারিটা এসে পড়ে একেবারে ফাঁদের দৈর্ঘ বরাবর। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রথম ফাঁদের তারটিকে টেনে দেওয়া হয়। সংগে

সংগে সব কটি ফাঁদে টান পড়ে, এবং মাথার উপরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে সবগুলো পাথরের চাঁই।

এই ধরনের ফাঁদের ছোট্ট একটি নমুনা আমি দেখেছিলাম। উপজাতীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিটি বলেছিলেন, "পাথরের চাঁইগুলো নেমে আসার সময় এমন প্রচণ্ড আওয়াজ হয় যে শত্রু সৈন্য ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে।" কথাটি ঠিক। কিন্তু এই ধরনের ফাঁদের বিরাট একটি ত্রুটিও রয়েছে। একবার ব্যবহৃত হলে, মালপত্র কিছুই পাওয়া যায় না। পাথরগুলোর ওজন এবং যে উচ্চতা থেকে যে রকম ভীমবেগে সেগুলো পড়ে, তাতে মানুষ, অস্ত্র-শস্ত্র সব কিছু এমন ভাবে ভেঙে তালগোল পাকিয়ে যায় যে তাদের আর চেনবারও উপায় থাকে না।

'টেনলুয়া' অর্থাৎ আগুনে তীর নিক্ষেপ করা হয় বিশেষ এক ধরনের গুলতির সাহায্যে ; এবং গুলি যায় ১০০ গজ পর্যন্ত। দেখতে সাধারণ তীরের মতো হলেও, এদের ভিতরে কিছুটা ফাঁপা অংশ থাকে। সেই ফাঁপা অংশে খুব কাছাকাছি রাখা হয় গন্ধক, গ্যাসোলিনে ভিজানো খানিকটা তুলা আর একটি পলতে। তীরটি যাতে লক্ষ্যবস্তুর খুব গভীরে প্রবেশ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তার মুখের ঠিক পিছন দিকে বিশেষ ধরনের একটি হাতল আটকে দেওয়া হয়। লক্ষ্যবস্তু সাধারণতঃ হয় খড়ের কিংবা তালপাতার চাল। পলতের মুখটি থাকে গন্ধকের দিকে। ও নিক্ষেপের আগে পলতেটাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করবার মুহূর্তেই গন্ধকে বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে, গ্যাসোলিনসিক্ত তুলোর টুকরো জ্বলে ওঠে এবং নিমেষের মধ্যে চালটি জ্বলতে থাকে দাউ দাউ করে। গেরিলাদের পক্ষ থেকে এই অস্ত্র হল নাপাম বোমার জবাব। এবং নাপামের চাইতে এর কর্মক্ষমতা অনেক বেশী। শত্রু গ্যারিসনের বাড়িগুলোর উপরেই প্রধানতঃ 'টেনলুয়া' ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে একবার এক দল শত্রু-সৈন্য সন হা জেলার না-ও গ্রামে 'নির্মূল অভিযান' চালাবার সময় একটি নদী

পার হবার চেষ্টা করে। হঠাৎ সারির সম্মুখ ভাগের লোকগুলো চীৎকার করে জলের মধ্যে পড়ে গেল। পিছনের লোকেরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে না এলে, লোকগুলো জলে ডুবেই মারা যেত। যাই হোক, একটু পরেই দেখা গেল, যারা সাহায্যের উদ্দেশ্যে এসেছিল তারাও জলের মধ্যে পাক খাচ্ছে আর নিজেদের ভিতরে জড়াজড়ি করে টাল সামলাবার চেষ্টা করছে। দেখতে দেখতে মাঝ নদীতে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড হট্টগোল এবং দাপাদাপি। পায়ে হেঁটে নদীটি পার হবার জায়গা ছিল ওই একটা মাত্রই। আসলে, ফোনিয়া'র আবিষ্কৃত সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের ফাঁদে গিয়ে পড়েছিল লোকগুলো। এই ধরনের ফাঁদের নাম হল 'চঙ গিয়া' অর্থাৎ 'কণ্টকাকীর্ণ দড়ি'। এগুলো তৈরী হয় বিরাট বিরাট শক্ত জংলী লতা দিয়ে। লতায় একোঁড়-ওকোঁড় করে গাঁথা হয় এক সংগে তিনটি করে ক্ষুরের মতো ধারাল ৮।৯ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের অসংখ্য বাঁশের গজাল। গজালগুলোর এক প্রান্ত গাঁথা থাকে নদী গর্ভে। লতার উপর পা পড়তেই স্রোতের কারণে সেটা সৈনিকদের পায়ের সংগে সাপের মতো জড়িয়ে গিয়েছিল। ছাড়াবার জন্য লোকগুলো যত দাপাদাপি করতে থাকে ততই তাদের পাগুলো ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে 'চঙ গিয়া'র আঘাতে। শেষ পর্যন্ত তারা জলের মধ্যেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে বাধ্য হয়। অত্যন্ত সাধারণ একটা কৌশল, কিন্তু অতর্কিত আক্রমণের পক্ষে অদ্ভুত ফলপ্রদ। এর ফলে ৪৬ জন দিয়েমী সৈনিক আহত হয় এবং অবশেষে তারা নদী পার হবার চেষ্টা পরিত্যাগ করে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্রামগুলোকে বশে আনবার জন্য দিয়েমী সৈনিকদের বিরাট একটি অস্ত্র ছিল তাদের খাদ্যশস্য ধ্বংস করা। ধান পাকবার আগেই গাছগুলোকে কেটে ফেলবার জন্য অথবা চারা গাছগুলোকে উপড়ে ফেলবার উদ্দেশ্যে তারা নিয়মিতভাবে অভিযান চালাত। এই সমস্ত অভিযানের জবাবে ফো নিয়া আবিষ্কার করেছিলেন 'গজাল লাঠি।' এটিও 'চঙ গিয়া'র মতোই। পার্থক্য শুধু গজাল বসানোর কায়দায়। 'গজাল লাঠি'তে গজালগুলোকে

একটি বাঁশের দৈর্ঘ্য বরাবর লাগানো হয়। তারপর এই রকম তিনটি করে বাঁশের সারি সারা ক্ষেতের পরিধি জুড়ে কাদার ভিতরে বেশ গভীরে বসান হয়। ধান খেতের কাদার মধ্যে কোনো ক্ষত হলে, তা হয়ে ওঠে ভয়ানক বিষাক্ত। কারণ ধান খেতে সার হিসাবে প্রচুর পরিমাণে মানুষ এবং শূকরের বিষ্ঠা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'গজাল লাঠি'র কয়েকটি নমুনা পাবার পরই ফো নিয়া'র গ্রামগুলোর সমস্ত ধানক্ষেতকে রেহাই দেওয়া হয়। কারণ এই 'গজাল লাঠি'তে যে বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তার একমাত্র চিকিৎসা হল আহত অংগটিকে কেটে বাদ দেওয়া। অনেকে হয়ত বলবেন, এ হল অমার্জিত ধরনের লড়াই। তার জবাবে বলব, খাদ্যশস্য ধ্বংস করে উপজাতীয় মানুষদের অনাহারে মেরে ফেলবার চেষ্টাটাও একই ধরনের বর্বরতা। এবং 'ত্রী' ও 'কর' উপজাতীয় লোকেরা কেবলমাত্র তাদের গ্রাম ও ক্ষেত-খামার রক্ষার চেষ্টাই করেছে ; আর কিছুই করে নি। দিয়েমীরা তাদের উপর উপদ্রব না করলে, কোন গণ্ডগোলই হত না।

ভিয়েতনামের জংগলে ভয়ংকর কাঁটাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য গাছ-গাছড়া দেখা যায়। ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ কাঁটাযুক্ত গাছও আমার নজরে পড়েছে। গুঁড়ির ব্যাসের চাইতেও বড় এই সমস্ত কাঁটা গুঁড়ির ৩০।৪০ ফিট পর্যন্ত জায়গা জুড়ে সজারুর কাঁটার মতো বিছিয়ে থাকে। এছাড়া প্রতি পদক্ষেপে পড়ে কাঁটাযুক্ত ঘন ঝোপ-ঝাড়, তালগাছ, এমন কি গজালযুক্ত বাঁশঝাড় পর্যন্ত। এ সমস্ত এড়িয়ে যাতায়াত করা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। উপজাতীয় লোকেরা বেছে বেছে এই ধরনের গাছ-পালা নিজেদের গ্রামের প্রবেশ-পথগুলোতে এমন সুকৌশলে বিভিন্ন উচ্চতায় লুকিয়ে পেতে রাখে যাতে পা, উরু, পেট, বুক প্রভৃত স্থানে আঘাত লাগে। কোনো লুঠেরা হয়ত এই ধরনের ফাঁদে পড়ে পায়ের আঘাত বাঁচাবার চেষ্টা করল। অমনি কাঁটাগুলো গিয়ে বিঁধে যাবে তার পেটে। আবার, বুকের আঘাত বাঁচাবার চেষ্টা করতে যেয়ে কাঁটা বিঁধে যাবে তার পায়ে। এই ভাবে কাঁটায় আহত হবার ঘটনা এত বৃদ্ধি পায় যে, শেষ পর্যন্ত দিয়েমী সৈন্যরা

ওই সমস্ত গ্রামে যেতে অস্বীকৃত হয়। অন্ততঃপক্ষে পা দুটোকে বাঁচাবার জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা এক ধরনের ধাতব আবরণ আবিষ্কার করেন। সেই আবরণ বুটের পুরু তলির সংগে আটকানো হত। কিন্তু বুট হয়ে পড়ত দারুণ ভারী। সৈনিকদের চলাফেরা করতে হত মুশকিল। বিশেষ করে অসুবিধা হত প্রয়োজনের সময় বিদ্যুৎগতিতে চলাফেরা করবার বেলায়। এই প্রসঙ্গে সাও নাম একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কোয়াঙ নাই প্রদেশে 'হ্রী' উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে অগ্রসরমান এক দল সৈন্য এই ধরনের ধাতব আবরণ প্রথম ব্যবহার করে। কিন্তু গুলতি এবং 'দশহাজার ফলদায়ক' বন্দুকের পাল্লায় পড়ে তাদের প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করতে হয়। 'ধাতব পায়ে'র জন্য তাদের পক্ষে নড়াচড়া করাও মুশকিল হয়ে পড়ে। অবশেষে ধাতব আবরণগুলো তারা ফেলে দেয়; এবং সেগুলো গিয়ে পড়ে গেরিলাদের হাতে।

পরবর্তীকালে ম'নঙ (হস্তি শিকারী হিসাবে বিখ্যাত), রেড এবং জারাই সংখ্যালঘু উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিভ্রমণ কালে আমি আরো সাংঘাতিক সমস্ত আদিম ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র দেখি। তাদের ভিতরে একটি ছিল সত্যিই ভয়াবহ। ওই ধরনের অস্ত্র আমি পূর্বে কখনো দেখি নি। মধ্যযুগীয় অস্ত্র গদার সংগে সেটির সাদৃশ্য থাকার কারণে, তার নাম আমি দিয়েছিলাম 'উড়ন্ত গদা'। হাতে-বোনা ঝুড়ির মধ্যে ৫০, ১০০, ২০০ এমন কি ৫০০ পাউণ্ড পর্যন্ত মাটি ভরে বিভিন্ন আকারের এই অস্ত্র তৈরী করা হয়। লম্বা লম্বা বাঁশের বল্লম তৈরী করে তাদের দুটি ধারই করা হয় ক্ষুরের মতো ধারালো। তারপর আগুনে সেঁকে করা হয় ইস্পাতের মতো কঠিন। এই সমস্ত বল্লম ঝুড়িগুলোর ভিতরে নানাভাবে সোজাসুজি বসিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত ঝুড়ির চারিপাশে বেরিয়ে থাকা বল্লমগুলো হয় একগজ দৈর্ঘ্যের। তারপর ঝুড়িগুলো সারবন্দী করে টাঙিয়ে দেওয়া হয় মাথার উপরের শক্ত জংলী লতায়; ঘন, দুর্ভেদ্য পাতার আড়ালে। এই ধরনের দুর্ভেদ্য পাতার ছাদ অধিকাংশ জংগলেই দেখা যায়।

এমন কি বিশাল বিশাল জংগলেও। ঝুলন্ত এই ঝুড়িগুলোকে তার পর পিছন দিকে টেনে দৃষ্টির আড়ালে আটকে রাখা হয় একটা তার দিয়ে। সৈন্যদের পায়ের চাপে কিংবা গাছের আড়ালে প্রচ্ছন্ন গেরিলাদের দ্বারা ওই আটকানো তারের কোনো প্রান্ত মুক্ত হবার সংগে সংগে 'উড়ন্ত গদা'গুলো প্রচণ্ড বেগে নেমে আসে নিচের দিকে। মাটি থেকে প্রায় ৮ ইঞ্চির মতো উপর দিয়ে সেগুলো ওই বেগে একবার সামনে, আবার পিছনে দুলতে থাকে দোলনার মতো। সেই সংগে সামনে যা পায় তাই এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে যায়। কোনো মানুষ তার মধ্যে পড়লে আর রক্ষা নেই। মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেও তার পিঠ ফালা ফালা হয়ে চিরে যাবে। আবার পাশের দিকে লাফিয়ে পড়লেও যেযে পড়বে বর্শাযুক্ত খাদের ভিতরে।

ভ·.থু´ক্ত অস্ত্রগুলোর সংগে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অগণিত এমন সমস্ত ফাঁদ যাদের কর্ম-ক্ষমতা ২০০ গজ থেকে আধ মাইল পর্যন্ত এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। ১০০ গজ এলাকা জুড়ে পেতে রাখা ফাঁদ-গুলোকে পরিচালিত করতে পারে একটি দলের অর্ধেক লোক। এর চাইতে বড় এলাকা নিয়ন্ত্রিত করে এক একটি প্লেটুন। একসংগে অনেকগুলো বর্শা নিক্ষেপ করা যায় এমন ধরনের একটি যন্ত্র আমি দেখেছিলাম। রাশিয়ার বহু-রকেট নিক্ষেপন যন্ত্রের অনুকরণে এদেরও 'জংগল কাটুশা' বলা যেতে পারে। বড় একটি 'রা গাছ কেটে, ডাল-পালা ছেঁটে, তার একপ্রান্ত গোঁজ দিয়ে আটকায় সবচাইতে শক্তিমান দুই কিংবা তিনজন উপজাতীয় লোক মিলে। তারপর সেটিকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে তাতে পরানো হয় জংলী লতার ছিলা। এই প্রসংগে একটি কথা বলে রাখি। উপজাতীয় লোকেরা দড়ির চাইতে বেশী পছন্দ করে জংলী লতা। যাই হোক, সেই ছিলার সংগে সূক্ষ্ম একটি ঘোড়া যুক্ত করা হয়। তার পর গোটা বারো বাঁশের বল্লম যথাস্থানে সাজিয়ে বল্লমের বাঁট আটকানো হয় ছিলার সংগে। বল্লমগুলোর মুখ থাকে চারাগাছের সংগে ঠেকানো অবস্থায়। এবার ওই চারগাছটিকে জমির সংগে প্রায় সমান্তরালভাবে

একটু বেঁকিয়ে বসানো হয়। বল্লমগুলো একটু হেলানো অবস্থায় থাকার ফলে, প্রত্যেকটি বল্লম ৮ ইঞ্চি থেকে ৭ ফুট পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চতায় ছুটে যেতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে পেতে রাখা 'উড়ন্ত গদা' 'বে-দা' এবং জংগল 'বোমা' পরিপূর্ণ কোনো পূর্ব নির্ধারিত পথের দুই পাশে এই ধনুকগুলোকে কিছুটা দূরে দূরে পেতে রাখা হয়। জংগল 'বোমা' তৈরী হয় ৬ ইঞ্চি ব্যাসের গাছের গুঁড়ি দিয়ে। গুঁড়িতে ছোট ছোট ছোরার আকারের অসংখ্য বাঁশের টুকরো আটকে দেওয়া হয়। কার্যকারীতা এবং ওজন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ এই ধরনের তিনটি করে গুঁড়ি বাঁধা হয় এক সংগে। তারপর সেগুলোকে মাথার উপরে গাছের ডালে বেঁধে দেওয়া হয়। নিচে থাকে অদৃশ্য টানা তার। সেই তারে কেউ একবার স্পর্শ করলেই উপর থেকে গুঁড়িগুলো পড়তে থাকে। তাদের অবস্থান এমনভাবে ঠিক করা থাকে যে, তাতে টান পড়বার অর্থই হল লক্ষ্যবস্তু 'বোমা'টির ঠিক নিচে এসে উপস্থিত হয়েছে।

আমার দেখা কয়েকটিমাত্র আশ্চর্য আদিম অস্ত্রের কথাই উপরে উল্লেখ করলাম। কিন্তু এগুলোর, বিশেষ করে স্বয়ংক্রিয় ধরনের অস্ত্রগুলোর কল-কৌশল এবং নির্মাণকার্যও অসংখ্য প্রকারের এদের চালাবার জন্য কোনো মানুষের প্রয়োজন হয় না। এই প্রসংগে একদিন 'রেড' উপজাতীয় মহান নেতা ইবি আলেও আমাকে বলেছিলেন, "কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বশম্বদ প্রহরী দিবারাত্র অতন্দ্র প্রহরারত রয়েছে। এদের ভাত, লবণ অথবা কাপড়-চোপড় কিছুরই প্রয়োজন হয় না।" বস্তুতঃ, যেমন-তেমন করে কাট-ছাঁট করা গাছ, জংলী লতা অথবা গাছের, গুঁড়ি ইত্যাদি দিয়ে তৈরী অধিকাংশই জবরজংগ, আদিম ফাঁদের সূক্ষ্ম নিক্ষেপণ যন্ত্রে মৎস্য শিকারের অত্যাধুনিক সরু নাইলনের সুতোর ব্যবহার দেখে অবাক মানতে হয়। শিকারীরা সাধারণতঃ পাখি, তিতির, বানর ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে বাঘ, হাতি ইত্যাদি শিকারের জন্য যে সমস্ত ফাঁদ ব্যবহার করে, এদের ফাঁদগুলোও

সেই অনুকরণে নির্মিত। কিন্তু দিয়েমী অত্যাচারের চরিত্র, ইবি আলেও-র কথায়, "মানুষ-বাঘের মোকাবিলার জন্যও আমাদের প্রস্তুত হতে বাধ্য করেছে।"

বিভিন্ন ধরনের ফাঁদের ব্যাপক সংগ্রহ প্রথম দেখে আমার যে আতংকিত-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা লক্ষ্য করে জনৈক বলিষ্ঠ ভিয়েতনামী কৃষক যুবক যে অকাট্য মন্তব্য করে, তা এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। পনের বছর বয়সেই যুবকটি শুরু করেছিল ফরাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আমাকে বলেছিল, "আমাদের অস্ত্রগুলো অনেক-দূর অবধি নিক্ষেপ করা যায় না। অনেকগুলোর আবার দূরের লক্ষ্যভেদের কোন ক্ষমতাই নেই। কিন্তু, আমেরিকান অথবা অন্য কাউকে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ওগুলো আমরা তৈরী করি নি। দূরের অসুবিধাটুকু শত্রুরাই সুরাহা করে দেয়। আক্রমণের মতলবে ওরাই এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। বলতে গেলে, আমাদের গ্রাম, ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার, ফলের বাগান, মুরগির খামার ইত্যাদির কাছে আমরাই ওদের টেনে নিয়ে আসি। শত্রু দূরে থাকলে, আমাদের অস্ত্রের কোনো সামর্থই নেই তাকে আঘাত করবার। কিন্তু চুরি অথবা হত্যার উদ্দেশ্যে আমাদের পাছ-দুয়োরে তারা হাজির হলেই দলে দলে আহত হবে। আমাদের অস্ত্রগুলো হল তারই সাবধানবাণী।"

বাস্তব ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে হিসাব করে দেখলে, কোয়াঙ নাই'য়ের খতিয়ান খুবই নিরাশাজনক। জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রাদেশিক কমিটির সদস্য লি কোয়াঙ বিন-এর মতে, ১৯৫৯ সালের শেষ ছয় মাসে যে সমস্ত সামরিক তৎপরতা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ১২৫ বর্গ-মাইল এলাকায় 'সবাইকে হত্যা কর, সব কিছু জ্বালিয়ে দাও, সব কিছু ধ্বংস কর'—এই অভিযানে নিযুক্ত করা হয়েছিল দুই ডিভিশনের মতো সেনাবাহিনী। দু'শয়েরও বেশী গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, এবং ফোমাক গিয়া'র জেলা ত্রা বঙ'য়ে তিন হাজার, ও সন হা, মিনলঙ এবং বা-তো এই তিনটি পার্বত্য জেলায় ১৩ হাজার পরিবারকে

বাস্তুহারা করা হয়। আ-বঙ-এ এই অত্যাচারের ফলে প্রায় প্রতিটি বাড়িই ধূলিস্যাৎ হয়, লোক-জনেরা বন-জংগলে পালিয়ে যায় এবং অস্থায়ী আশ্রয়স্থল ও গুহায় আস্তানা গেড়ে বন্য ফল-মূল খেয়ে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ গৃহপালিত জীবজন্তুই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের। কিন্তু লি কোয়াঙ বিন এব মতে, "মানুষের জীবনহানির ঘটনা ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত কম। পাহাডী লোকেরা পাহাড়-জংগলে যে নতুন জীবন সংগঠিত করতে শুরু করেছিল, সেই জীবন ও সম্পত্তি রক্ষাব উদ্দেশ্যে আদিম অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সেই সময় থেকেই তারা প্রস্তুত হল প্রচণ্ড সংগ্রামের জন্য। এবং ইতিমধ্যে আমরাও সমতল প্রদেশে সংগ্রাম শুরু করে তাদেব উৎসাহিত করতে আরম্ভ করলাম।"

দশম পরিচ্ছেদ

ভগ্ন-মুষ্টি। সমতল অঞ্চলে সশস্ত্র অভিযান

১৯৬০ সালের ১৮ই মে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর উপর। কোয়াঙ-নাই প্রদেশের সমুদ্রোপকূলস্থ সমতল অঞ্চলের মো-ভাক জেলা-সদরের একটি চীনা রেস্তোরাঁয় খরিদ্দারের ভীড়। এমন সময় একদল সামরিক অফিসার দেহরক্ষীদের নিয়ে প্রবেশ করল সেই রেস্তোরাঁয়। নুডল্‌স্যুপ আহারে ব্যস্ত খরিদ্দারদের দ্রুত অতিক্রম করে ঘরের ভিতর দিয়ে তারা চলে গেল পিছন দিকের একটি কামরায়। একজন বেয়ারার সংগে নিচুগলায় একটুক্ষণ কথাবার্তা বলে, মেলে ধরল একখানা কাগজ। সংগে সংগে বেয়ারা তাদের নিয়ে গেল বেশ বড় একটি অফিস কামরায়। চীনা রেস্তোরাঁ সাধারণতঃ যেমনটি হয়ে থাকে, এই কক্ষের সংগে তার কোনো মিল নেই। কক্ষের ভিতরে একটি টেবিলের সামনে বসেছিল স্থূলকায় একজন ভিয়েতনামী। একজোড়া সরু গোঁফ যার উপরের ঠোঁট থেকে মুখের দুইপাশ দিয়ে নেমে গেছে চিবুক পর্যন্ত। অফিসারেরা সেই লোকটিকে সসম্ভ্রমে স্যালুট করল। লোকটিও জবাব দিল ঘোঁত-ঘোঁত করে।

দশ মিনিটের মধ্যে দলটি পিছনের বিরাট দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল রাস্তার উপর। এই রাস্তা চলে গেছে শহরের বাইরে। টেবিলের সামনে বসা সেই লোকটিকেও নিয়ে গেল তাদের সংগে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পর. হঠাৎ একজন অফিসার একটি রিভলবার বার করে 'রেস্তোরাঁর মালিকে'র দিকে উঁচিয়ে ধরে কঠিন স্বরে বলল, "হাউ! ভিয়েতনামের জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য সরকারী সশস্ত্র বাহিনীর দেশভক্ত অফিসারদের নামে তোমাকে

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। দণ্ডাদেশ এই মুহূর্তেই কার্যকরী করা হবে।" কথা কয়েকটি বলেই অফিসারটি সেই স্থূলকায় ব্যক্তির মাথায় গুলি করল। দেহটা লুটিয়ে পড়ল পথের উপর। সেটাকে টেনে একপাশে সরিয়ে একজন তাতে লটকে দিল একটুকরো কাগজ।

অফিসারদের ছোট্ট দলটি এবার পিছনের প্রবেশদ্বার দিয়ে দ্রুত সেই রেস্তোরাঁয় ফিরে এল। মৃতদেহ থেকে তারা যে চাবিটি নিয়েছিল, তাই দিয়ে বিরাট কালো রংয়ের একটি সিন্দুক খুলে ফেলল। ভিতরটা ঠাসা ছিল কাগজ-পত্রে। কাগজগুলোর উপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়েই তারা সেগুলোকে ভরে ফেলল একটি নাইলনের থলেতে। তারপর বিরাট একটা দেরাজ টেনে খুলেই মুহূর্তের জন্য সবাই আতংকে যেন হিম হয়ে গেল। থরে থরে মানুষের কান সাজানো রয়েছে দেরাজের মধ্যে। প্রত্যেকটি বাঁ কান। এবং প্রত্যেকটির সংগে আটকানো রয়েছে নাম লেখা একখণ্ড কাগজ এবং পাঁচ হাজার করে পিয়াস্ত্রা প্রাপ্তির রসিদ।

উপরে যে অভিযানটির কথা বলা হল, তার পরিচালক 'অফিসার' ছিলেন সাও নাম। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন, "কানগুলো ছিল আমাদের ৪৩১ জন কমরেডের। অত্যাচারী ছাউ, যাকে আমরা হত্যা করেছিলাম, সে ছিল কোয়াঙ নাই, কোয়াঙ নাম আর বিন দিন প্রদেশের গুপ্ত পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি; নো দিন ক্যান-এর বিশেষ একজন এজেন্ট। রেস্তোরাঁটি ছিল তার ঘৃণ্য কার্যকলাপ আড়ালে রাখবার একটা কৌশল। আমাদের নিহত কমরেডদের ডান কানগুলোকে প্রমাণ হিসাবে পাঠিয়ে সে প্রতিটির জন্য পেয়েছিল পাঁচ হাজার করে পিয়াস্ত্রা।

"সে রাতে আমরা অনেক-কিছু পেয়েছিলাম। যাদের গ্রেপ্তার এবং হত্যা করা হবে তাদের নামের তালিকা ছাড়াও, ছাউ-এর অধীনে কর্মরত সমস্ত এজেন্টদের নাম-ধাম আমাদের হস্তগত হয়েছিল। গ্রেপ্তার ও হত্যার তালিকায় যাদের নাম ছিল, তাদের সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হল। ছাউ-এর এজেন্টদের কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে

গ্রেপ্তার করা হল ও বাকীদের ভয় দেখিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া-হল।"

উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে সমতলের 'সশস্ত্র প্রোপাগাণ্ডা দলে'র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকেই ছাউ'-এর মত এজেন্টদের হত্যা করবার নীতি গৃহীত হয়েছিল। 'সশস্ত্র প্রোপাগাণ্ডা দলে'র পরিকল্পনা ১৯৪৪ সালে সর্বপ্রথম করেছিলেন দিয়েন বিয়েন ফু'র ব্যাঘ্র ভো নুয়েন গিয়াপ, এবং ভিয়েতনাম গণতন্ত্রী সরকারের (উত্তর ভিয়েতনাম) বর্তমান প্রধান-মন্ত্রী ফাম ভান দঙ। প্রথম দলটি গঠন করা হয়েছিল ৩৪ জন লোক নিয়ে। দেখতে দেখতে সেই ছোট্ট দলটি শক্তিশালী, বিরাট এক সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়, এবং দশ বৎসর পর ফরাসীদের পরাজিত করতে গিয়াপ সেই বাহিনীকে সাফল্যের সংগে নিয়োজিত করেন। সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হতেই সাও নাম ও তাঁর দল তথা অন্যান্য প্রদেশের ক্রমবর্ধমান অনুরূপ বহু দলই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই সময় থেকেই 'সশস্ত্র প্রোপাগাণ্ডা দলে'র ব্যবস্থাটিকে তাঁরা রাজনৈতিক-সামরিক সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেন।

সমতল অঞ্চলে শত্রুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকার দরুণ সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম সেখানে আরম্ভ করা সহজসাধ্য ছিল না। দিয়েমী অত্যাচারের হাত এড়িয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রতিরোধ কর্মীই জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় গোষ্ঠীদের ধ্বংস করবার অভিযানের সংবাদ সমতল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তেই, জনসাধারণের ক্রোধ এবং ঘৃণা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কোয়াঙ নাই প্রদেশের ভিয়েতনামী কাণ্ডাররা কি ভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধের নতুন নীতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসতে থাকে, সে কথা সাও নাম আমাকে বলেছিলেন। ১৯৫৯ সালের শেষভাগে প্রথমে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, উপজাতীয় গোষ্ঠীর প্রতি দিয়েমীদের ক্রোধ খানিকটা প্রশমিত করবার উদ্দেশ্যে দিয়েমী

প্রশাসনের বিরুদ্ধে 'অসহযোগ আন্দোলন' শুরু করা হবে। পার্বত্য অধিবাসীদের বিদ্রোহ চিরদিনের মতো শেষ করবার মতলবে দিয়েমীরা বছরের শেষের দিকে একটি নতুন সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল। সেই উদ্দেশ্যে তারা পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলো থেকে সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়াও আমদানি করে। উদ্দেশ্য তাদের সফলও হয়তো হত; কারণ মধ্য ভিয়েতনামে কোয়াঙ নাই-ই ছিল একমাত্র স্থান যেখানে ছিল সশস্ত্র প্রতিরোধের আগুন।

সাও নাম আবার বললেন, "আরেকটি আলোচনা সভায় সবাই মিলিত হলাম। এটা ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুপক্ষের দমন-মূলক কার্যকলাপের প্রধান লক্ষ্য ছিল 'কর'দের নিশ্চিহ্ন করা। সেই কারণে অন্যান্য উপজাতীয় গোষ্ঠী এবং জেলার মানুষ, এক কথায় বলতে গেলে সব কটি পার্বত্য জেলাই অস্ত্র ধারণ করেছিল। এ ছাড়া, শত্রুপক্ষ বিনা প্ররোচনায় ক্রমাগত হিংসাত্মক তৎপরতা চালিয়ে যাবার ফলে, কোয়াঙ নাইতে শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের নীতিও ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। অহিংস নীতিতে অটল থাকতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম; এবং আমাদের অনেকেরই তখনো মত ছিল আইনানুগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে যা শুরু করেছিল, তাকে আটকাবার কোনো উপায়ই আমাদের হাতে ছিল না। সমতলের ভিয়েতনামীরা সাহায্যার্থে এগিয়ে না এলে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলো হয়তো সত্যিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। চোখের সামনে দেখছি শত্রুপক্ষ সর্বাত্মক হত্যার প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তখনো কি আমরা আইনানুগ আন্দোলনের পথকেই আঁকড়ে ধরে থাকবো?

"সুতরাং চরম গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত সেই আলোচনা সভায় গৃহীত হল। স্থির হল, নিজেদের 'প্রতিরোধ কমিটি'তে সংগঠিত করা হবে; উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা যে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করেছে, তাকে সমর্থন করা হবে এবং পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের মূল ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করে সেখান থেকে সমতল এলাকায় অনুপ্রবেশের

প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হবে। সর্বশেষ যা জানতাম, তাতে এই সিদ্ধান্ত ছিল আমাদের এযাবৎকাল অনুসৃত নীতি ও পন্থা বিরুদ্ধ। তবু আশা করলাম, আমাদের বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হবে। প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামে উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা আমাদের যে ভাবে সাহায্য করেছিল এবং পরবর্তীকালে চরম বিপদের সময় আমাদের যে ভাবে রক্ষা করেছিল, তাতে আজ তাদের সমর্থন না করলে আমাদের তথা বিপ্লবের সম্মান চিরদিনের জন্য ভূলুণ্ঠিত হবে। পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোতে আমাদের বহু কমরেড আত্মগোপন করে ছিল। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানাবার জন্য তাদের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হল।”

সাও নাম এবং তাঁর কমরেডদের এই সিদ্ধান্তকে হয়তো কোনো ঐতিহাসিক 'দুই-তরফের যুদ্ধে'র প্রারম্ভ বলে চিহ্নিত করবেন। আমি যতদূর জানি, ওই পর্যায়ে গৃহীত এইটিই ছিল এ ধরনের প্রথম সিদ্ধান্ত; এবং এর প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল ব্যাপক। 'কর' উপজাতীয় গোষ্ঠীর উদাহরণ এবং শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনামী ক্যাডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমর্থনের ঘটনাকে পরবর্তীকালে উচ্চতম পর্যায়ে 'পন্থা' পরিবর্তন তথা সারা দক্ষিণ-ভিয়েতনামে সশস্ত্র প্রতিরোধ ছড়িয়ে দেবার স্বপক্ষে চরম যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হত। পূর্বে উল্লিখিত তুয়া হাই আক্রমণের প্রাক্কালে অনেক বিচার-বিবেচনা করে কুয়েত থান ও তাঁর দল যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রায় ১২ মাস আগে ফো মাক গিয়া দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন সশস্ত্র প্রতিরোধের স্বপক্ষে।

ফাম ভান দঙ'য়ের জন্মভূমি, কোয়াঙ নাই প্রদেশের সংগ্রামী ঐতিহ্য বহু পুরাতন। সেখানকার লোকেরা সহজে মাথা নত করে না। কিন্তু মনে হয় অন্ততঃপক্ষে সমতল অঞ্চলের ভিয়েতনামীরা ১৯৫৯ সালের শেষ নাগাদ হতাশার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। একটি ঘটনার কথা আমি শুনেছিলাম যাতে সমতলের কিছুসংখ্যক লোকের মনোভাব অন্ততঃ অনুমান করা যায়। দিয়েমীরা ১৯৫৯ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখটিকে 'জাতীয় দিবস' রূপে উদযাপন

করে। ছিম-ছাম, জাঁক জমকপূর্ণ পোশাকে সজ্জিত সেনাবাহিনী, ট্যাংক, কামান এবং মাথার উপরে বিমানবহর, এই সমস্ত দিয়ে একটি সামরিক কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করা হয়। প্রেসিডেন্ট নো দিন দিয়েমের চমৎকার সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সংগে ছিন্নবাস পরিহিত 'ভিয়েতকং' গেরিলাদের তুলনা করে স্থানীয় সামরিক গভর্নর দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেন। জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বক্তৃতারত সামরিক গভর্নরের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলেন :

"গভর্নর ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁর সংগে এক মত। 'জাতীয়তাবাদী'দের তুলনায় 'ভিয়েতকং'দের অবস্থা খুবই খারাপ। আলু আর ম্যানিওক ছাড়া তাদের আর কোনো খাদ্যের সংস্থান পর্যন্ত নেই। 'জাতীয়তাবাদী'দের রয়েছে প্রচুর পরিমাণে চাল, রুটি আর মাংস। 'ভিয়েতকং'দের পরনে ছিন্নবাস। এদিকে দেখুন, 'জাতীয়তাবাদী'দের পোশাক-আসাক কি চমৎকার! 'ভিয়েতকং'দের ভাল অস্ত্র-শস্ত্রও নেই। আর, এখানে দেখুন, কি চমৎকার সমস্ত মার্কিন বন্দুক, ট্যাংক আর বিমান। একটিমাত্র ব্যাপারে 'জাতীয়তাবাদী'দের অবস্থা ভাল নয়। তারা সেবা করছে বিদেশী সেনা বাহিনীকে। পক্ষান্তরে, যে-সমস্ত বিদেশীরা আমাদের দেশ আক্রমণ করছে, 'ভিয়েতকং'রা লড়ছে তাঁদেরই বিরুদ্ধে। কোনো যুদ্ধের শেষে 'ভিয়েতকং'রা জনসাধারণকে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু 'জাতীয়তাবাদী'রা কেবল আগুন লাগায় আর চুরি করে।"

ঠিক এই সময় সামরিক শাসনকর্তা তাঁকে বাধা দেন। সেখান থেকে তাঁকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বিকৃত হাস্যের সংগে চীৎকার করে বলেন, "এই বৃদ্ধটি পাগল।" তাঁকে গ্রেপ্তার করবার উদ্দেশ্যে পুলিশ ছুটে আসে। কিন্তু জনতা তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে পুলিশের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে চলে যায়।

বৃদ্ধ লোকটি তারপর চলে যান পার্বত্য এলাকায়। জনৈক ভিয়েতনামী ক্যাডার তাঁকে প্রশ্ন করে, "কেন আপনি এ কাজ করতে গেলেন?"

জবাবে বৃদ্ধ লোকটি বললেন, "দেখলাম, সবাই কেমন মনমরা হয়ে পড়েছে। ওই সমস্ত বন্দুক আর ট্যাংক দেখে ভয় পেয়ে গেছে। তাই ভাবলাম কয়েকটি সত্য কথা তাদের সোজা শুনিয়ে দিই। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার কিছু হলেও, যায়-আসে না। কিন্তু জনগণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে।"

ইতিমধ্যে 'কর' উপজাতীয় গোষ্ঠী কিন্তু আত্মরক্ষার প্রয়াসের মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখে নি। সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রতি অন্যান্য অঞ্চলে যে সমর্থন আরম্ভ হয়েছিল, তা তাদের মনোবল বহুলাংশে বর্ধিত করে। তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জোরদার করবার উদ্দেশ্যে দিয়েমীরা ইও ছিয়েন নামক স্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সৈন্যঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। নভেম্বরের শেষের দিকে 'কর' উপজাতীয় তরুণেরা ওই ঘাঁটিটি আক্রমণ করতে মনস্থ করে। এ বিষয়ে বৃদ্ধ ফো মাক গিয়াব মতামত চাইলে, তিনি সর্বাত্মক 'দৃঢ় সমর্থন' জানান। 'দৃঢ় সমর্থন' শব্দটি আমি এই প্রসংগেই প্রথম শুনি। পরে জেনেছিলাম গেরিলা অস্ত্রাগারে বর্তমানে এটি হল একটি প্রচলিত অস্ত্র। যাই হোক, আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য বৃদ্ধ তাঁকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেন। ঘটনার দিন মধ্যরাত্রি নাগাদ ঘণ্টা-ঢাক-শিংগা, বিরাট বিরাট বাঁশের টুকরো ইত্যাদি নিয়ে পুরো গোষ্ঠীটি একত্রিত হয়ে ঘাঁটিটিকে ঘিরে প্রচণ্ড হট্টগোল শুরু করে দেয়। এই মানসিক লড়াইয়ের পর আরম্ভ হয় আক্রমণ; কয়েকটি গুলি বর্ষণের পরই ঘাঁটির ভগ্ন-মনোবল সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করে। ঘাঁটিটিকে একেবারে বিনষ্ট করে ফেলা হয়। 'কর'দের হাতে আসে আরো অস্ত্র-শস্ত্র। তার থেকে কিছু অংশ ওরা দিয়ে দেয় ভিয়েতনামী ক্যাডারদের। এই অভিযানের ফলে চায়ের-বদলে লবণের কাফিলার পথে [illegible] বেশ খানিকটা কমে যায়।

দণ্ডাদেশ এবং হত্যা

সমতলের অধিবাসীরা এমন সন্ত্রাসিত হয়ে পড়েছিল যে, প্রথম প্রথম তারা কাউকে বিশ্বাস করত না। এই প্রসংগে সাও নাম আমাকে বলেন, "প্রারম্ভেই আমরা কয়েকজন ক্যাডারকে হারাই। এবং জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ করা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী সরকার জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকলে কোন কিছু করাই সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা স্থির করলাম, শত্রুর হাত ভেঙে দিতে হবে। তার জন্য কুখ্যাত কয়েকজন দিয়েমী দালালকে হত্যা এবং কয়েকটি নির্বাচিত শত্রু সৈন্য ঘাঁটি আক্রমণ করা দরকার। এবং এই কাজ শুরু করবার সংগে সংগেই মানুষের চোখে এক নতুন আলোর আভাস দেখা দিল। বিশ্বাস ফিরে এল তাদের অন্তরে। কুখ্যাত কোনো অত্যাচারীকে খতম করলেই, তাকে হত্যা করবার কারণগুলো আমরা লিখিতভাবে সেখানে রেখে দিতাম। ফলে, আমরা কাদের প্রতিনিধিত্ব করছি, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬০ সালের শেষভাগে 'জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্ট' প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত আমরা 'জনগণের আত্মরক্ষী বাহিনীর সশস্ত্র প্রোপাগাণ্ডা দল' এই নামে কাজ করেছি।"

দণ্ডাদেশ এবং সেগুলোকে প্রকৃতপক্ষে কি ভাবে কার্যকরী করা হত, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সাও নাম জানান যে, প্রতিটি গ্রামের পরিস্থিতি, স্থানীয় দালালদের কার্যকলাপ এবং তাদের অপরাধের পরিমাণ প্রথমে সযত্নে পর্যালোচনা করে দেখা হত। এই প্রসংগে তিনি আরো বলেন, "নিশ্চিত জানবেন, সর্বক্ষেত্রে একাধিক হত্যার জন্য দায়ী হল মাত্র গুটিকয়েক মুখ্য দালাল শ্রেণীর লোক। কিন্তু যতক্ষণ তাদের ব্যবহার পরিবর্তনের সামান্যতম সম্ভাবনাও দেখা গেছে, ততক্ষণ আমরা তাদের কিছুই করি নি। দালাল, গ্রামের মোড়ল এবং পুলিশ তথা নিরাপত্তা প্রধান ইত্যাদি লোকেরা সাধারণতঃ

একই বাড়িতে বাস করে। রাতের বেলায় আমরা একটি করে দল পাঠাতাম। তারা লাউডস্পিকারযোগে আমাদের নতুন প্রতিরোধ আন্দোলনের নীতি ব্যাখ্যা করত, দিয়েমী শাসনতন্ত্রের কুকার্যের বিবরণী সর্বসমক্ষে খুলে ধরত এবং সেই সমস্ত অপরাধের মোকাবিলা কি ভাবে করা যায়, তা জনসাধারণকে জানাত। সব শেষে স্থানীয় দালালদের বাসভবনের দিকে মেগাফোনের মুখ ঘুরিয়ে তাদের শেষ বারের মতো সাবধান করে দেওয়া হত। ব্যাপারটির গুরুত্ব যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ আকাশের দিকে কয়েকবার গুলি বর্ষণও করা হত।

"দালালেরা প্রথম প্রথম এ সমস্তকে আমল দিত না। বরং আরো বেশী করে চালাত তাদের সন্ত্রাসমূলক কাযকলাপ। সে ক্ষেত্রে আমাদের দলটিকে আরেকবার যেতে হত। সংগে তাদের থাকত হাতে লেখা দুই রকমের পত্র। একটিতে থাকত স্থানীয় দালালদের জানা, তাদের অপরাধের তালিকা এবং জনগণের আত্মরক্ষী বাহিনীর স্থানীয় সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ। অপরটি প্রায় একই ধরনের কেবল দণ্ডাদেশের পরিবর্তে তাতে থাকতো আর কোনো অপরাধ না করার জন্য সাবধান করে দিয়ে ক্ষমা করবার কথা। মুখ্য দালালটিকে বাড়িতে পেলে সংগে সংগে হত্যা করা হত। মৃতদেহের সংগে এঁটে দেওয়া হত দণ্ডাদেশের একটি কপি। আর একটি কপি লটকে দেওয়া হতো চারিদিকে কিন্তু মুখ্য দালাল অনুপস্থিত থাকলে তার এবং অন্যান্যদের জন্য ক্ষমা ও সাবধানবাণী সম্বলিত পত্রটি সেখানে রেখে আসা হত

"'ক্ষমাপ্রাপ্ত' অনেকেই যোগাযোগ করত আমাদের সংগে নতজানু হয়ে ধন্যবাদ দিত আমাদের, তাদের ক্ষমা করার জন্য শত্রুর চাকরি করবার আড়ালে আমাদের কাজকর্ম করতে চাইত অনেকেই। জানতাম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা শত্রুরই সেবা করে যাবে। কিন্তু জনসাধারণ যে তাদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে, সে ভরসা আমাদের ছিল। তাই তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতাম। কিন্তু যে

সমস্ত অপরাধী ব্যক্তির মনে কোনো রকম অনুতাপ হত না, তারা গ্রাম ছেড়ে নিকটবর্তী সৈন্য ঘাঁটি থেকে নিজেদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেত। গ্রামে আসত তারা কেবল দিনের বেলায়। কোনো ঘাঁটিতে এই ধরনের একাধিক ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছে জানতে পারলেই আমরা সেই ঘাঁটি আক্রমণ করতাম। উৎপীড়ক দালালেরা আশ্রয় নিয়েছে বলেই ঘাঁটিটিকে আমরা আক্রমণ করেছি—এই ব্যাপারটি ঘাঁটির অভ্যন্তরস্থ সৈনিক এবং বাইরের জনসাধারণ উভয়ের পক্ষেই হত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জনসাধারণের সমর্থন লাভ তথা তাদের মনোবল বলিষ্ঠ করাই ছিল প্রথম প্রথম আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

"কোন ঘাঁটি আক্রমণ করবার পূর্বে আমাদের মেগাফোনগুলো হয়ে উঠত সক্রিয়। জনগণের প্রতি কৃত অপরাধের জন্য দালালদের শাস্তি দেওয়াই যে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, একথাটা মেগাফোন মারফত সৈনিকদের জানিয়ে দেওয়া হত। বলা হত, 'যদি তোমরা গুলি না চালাও, আমরাও চালাবো না। কিন্তু তোমরা গুলি চালালে আমরাও চালাব, এবং তোমাদের একেবারে শেষ করে ফেলব।' এ কথার ফল হত দারুণ। প্রায়ই দেখা যেত, সৈন্যদের দালালদের ঠেলে বাইরে বার করে দিতে দিতে চীৎকার করে বলেছে, 'যাও, জনসাধারণের প্রতি যে অপরাধ করেছো, তার জবাব দাও গিয়ে।' এ ছাড়া, জনসাধারণের মনোবলের উপরও এই সমস্ত ব্যাপারের ফল হত দারুণ, এবং ছোট খাটো দালালেরা হয়ে পড়ত অত্যন্ত বিনয়ী। যে কোনো জেলায় গুটিকয়েক মাত্র দালালকে খতম করতে পারলেই, নিজেদের ইচ্ছামতো আমরা গ্রামে যাতায়াত করতে পারতাম। অতীতের প্রতিরোধ সংগ্রামের দিনে জনসাধারণের সংগে আমাদের যে ধরনের সম্পর্ক ছিল, সেই রকম সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হত।"

যে কোনো মাপকাঠিতেই বিচার করা যাক না কেন, সাও নাম হলেন অসাধারণ একজন মানুষ। আমার সংগে যে সময় তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি ছিলেন কোয়াঙ নাই প্রদেশের জাতীয় মুক্তি সেনা

বাহিনীর একজন মুখ্য স্টাফ অফিসার। পূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন একজন ভূমিহীন কৃষক। শিক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁর নিজের ভাষায়, 'বিপ্লবের দ্বারা।' অসাধারণ হলেও, কোম্পানি ও ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডার থেকে শুরু করে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত যে সমস্ত ব্যক্তির সংগে সেখানে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদের সংগে তাঁর মিলও লক্ষ্য করেছি প্রচুর। তাঁর প্রতিটি চাল-চলন ও কথাবার্তাতে স্ফুরিত হতে দেখেছি বলিষ্ঠতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। এমন একজন মানুষ, চরমতম পরিস্থিতির মধ্যেও যাঁর উপরে অসীম আস্থা স্থাপন করা যেতে পারে। বছরের পর বছর ধরে রোদ, বাতাস এবং খোলা জায়গায় থাকার ফলে তাঁর মুখের রঙ হয়ে পড়েছে গাঢ় বাদামী। ১৭ বছর বয়সেই তিনি প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন, এবং সেই থেকেই জড়িয়ে পড়েছেন বিপ্লবের মধ্যে। প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামে তাঁর দুই ভাই মারা যান। অন্য এক ভাই জাতীয় মুক্তি-সেনা বাহিনীতে একজন কোম্পানি কমাণ্ডার এবং এক বোন হলেন ফ্রন্ট নিয়ন্ত্রিত এলাকায় একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। অতীতে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ গ্রহণের অপরাধে তাঁর পিতা ১০ বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। তাঁর স্ত্রী, যদি এখনো জীবিত থাকেন, তবে রয়েছেন কারাগারে।

স্ত্রীর প্রসংগ উঠতেই, একটি বিরল দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাও নাম বললেন, "ঠিক সাতটি দিনের জন্য আমরা দাম্পত্য জীবনের স্বাদ পেয়েছিলাম। সেটা ছিল ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শেষ বৎসর। তারপর দিয়েমীরা তাকে ধরে নিয়ে গেল, অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের একটি দলিলে টিপসই দিতে বাধ্য করল বেচারীকে। জানি না সে এখনো বেঁচে আছে কি না। সত্যি বলতে কি, অনেক চেষ্টা করেও তার মুখখানা এখন আর মনে আনতে পারি না। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, আমার প্রতি সে ছিল অত্যন্ত কোমল এবং সহৃদয়; কিন্তু শত্রুর প্রসংগে ছিল ইস্পাতের মতো কঠিন। সময় সময় জীবনটাকে অত্যন্ত তিক্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যান্য কমরেডদের সংগে তুলনা করলেই দেখি আমি ভাগ্যবান। অন্ততঃপক্ষে

সাতটি দিনের জন্যও নারীর ভালবাসার মাধুর্য যে কি, তা আমি জেনেছি। কিন্তু আমার বহু কমরেডই যাঁদের বয়স ৪০ কিংবা তার বেশী হয়ে গেছে, এই সৌন্দর্যকে জানতেই পারেন নি।"

লেখা-পড়ায় সাও নামের হাতে খড়ি হয়েছিল ভিয়েতমিন সেনা বাহিনীতে। দিয়েন বিয়েন ফুর লড়াইয়ের সময় তিনি কোম্পানি কমাণ্ডারের পদ অবধি উঠেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর একজন সেনাপতি হবার মতো সমস্ত যোগ্যতাই তাঁর ছিল। অন্যান্য সহকর্মীদের মতো মানসিক যুদ্ধের বিষয়ে কখনো তিনি কিছু পড়াশোনা করেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু দৈনন্দিন কার্যকলাপে এই বিদ্যাটিকে তিনি অত্যন্ত সহজ এবং সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। তাঁদের মতো মানুষের পক্ষে এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। কারণ, যে জনসাধারণের মধ্যে বাস করে তাঁরা কাজ করেন এবং লড়াই চালান, সেই সাধারণ মানুষের তাঁরা হলেন আপন জন। সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের রয়েছে গভীর জ্ঞান: কোন্ জিনিসটিকে তারা পছন্দ করবে; কোন্‌টিকে ঘৃণা করবে; কোন্‌টিকে ভয় করবে, কি করলে তাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মানো যাবে অথবা কি করলে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে, এ সমস্তই তাঁদের খুব ভাল ভাবে জানা আছে। প্রতিরোধ সংগ্রামের কর্মতৎপরতার ফাঁকে-ফাঁকে যৎসামান্য লেখা-পড়া শিখলেও সাও নাম হলেন একজন মার্জিত ব্যক্তি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনধারা এবং আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান গভীর। উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষরা হল তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহোদরের মতো। রাতের পর রাত আমরা তাঁবুর বাইরে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে ম্যানিওকের দগ্ধ মূল চিবিয়েছি আর মশা মেরেছি। আর সাও নাম, উপজাতীয় মানুষদের মহত্ব, বীরত্ব ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা সম্বন্ধে আমার আগ্রহ উদ্দীপ্ত করবার উদ্দেশ্যে একের পর এক বলে গেছেন তাদের কত কাহিনী। ১২ বৎসরেরও অধিককাল ধরে সাও নাম তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছিলেন। তাঁর মতো কর্মীর প্রতি উপজাতীয়

গোষ্ঠীর মানুষদের অসীম বিশ্বাস না থাকলে, আমার ব্যক্তিগত চেষ্টায় কখনই তাদের সংগে যোগাযোগ করতে পারতাম না।

যাই হোক, ১৯৬০ সালের শেষ নাগাদ, সম্ভবপর সমস্ত স্থান থেকে দিয়েমী কর্তৃত্ব উৎখাত করবার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। নিজেদের জেলা থেকে দিয়েমী শাসন উৎখাত হবার পর, ফো নিয়া দৃষ্টি দিলেন সমতলের শত্রু সৈন্যদের দিকে। বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোয়াঙ নাই'য়ে যে কেউ সামরিক তৎপরতা চালাক না কেন, এবং আদেশনামা অথবা প্রচার পত্রে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টকিংবা স্থানীয় প্রতিরোধ সংগঠনের স্বাক্ষর থাকলেও, দিয়েমী সৈন্যেরা সেগুলোকে অবিসংবাদী নেতা ফো নিয়া'র পরিচালিত বলেই ধরে নেয়।

এর উত্তরে দিয়েমীরা ১৯৬০ সালের শেষের দিকে সমতলের গ্রামাঞ্চলের সমস্ত বাঁশঝাড়, ফলগাছ ও ছোট ছোট জংগল ধ্বংস করে সেই কাঠ ও বাঁশ দিয়ে গ্রামগুলোকে ঘিরে গড় তৈরী করতে শুরু করে। সেই হল 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট' এর সূত্রপাত। এর আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল স্বাভাবিক আত্মগোপনের স্থান থেকে গেরিলাদের বঞ্চিত করা। কিন্তু সাও নাম-এর কথায়, "শত্রুর হাতের মুঠি আগেই ভেঙে গিয়েছিল," এবং বাঁশের বেড়া ও পরবর্তী কালে কাঁটাতারের বেড়া ভেদ করে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬০ সালে, একমাত্র ফো নিয়া' এলাকাতেই দিয়েমীরা ২০০ সামরিক অভিযান চালায়। কিন্তু সশস্ত্র প্রতিরোধ যতই তারা 'নির্মূল করবার' চেষ্টা করে, ততই তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারিদিকে। মনে হয়, মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে এবং নির্দিষ্ট পথ ধরে এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছিল। একাধিক স্থানে খোঁজ-খবর করে এ বিষয়ে আমার ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে। ১৯৬১ সাল নাগাদ অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ফো নিয়ার জন্মভূমি সন তা জেলায় দিয়েমীরা আক্রমণ চালাবার প্রচেষ্টা অবহি পরিত্যাগ করে। একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত নিজের গ্রাম সন তিন'এ ফো নিয়া চলে গিয়েছিলেন। দিয়েমীরা ছয়বার সেই গ্রামে পৌঁছুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সন তিন

থেকে শুরু করে বিরাট একটি অঞ্চলকে ফো নিয়া দিয়েমী শাসন-মুক্ত করেন। সেই মুক্ত অঞ্চলে দিয়েমী সেনা বাহিনী কোনো দিন প্রবেশ করতে পারে নি। গ্রামের পর গ্রাম থেকে দিয়েমী দালালদের উৎখাত করা হয়। শেষ পর্যন্ত সন হা জেলা পরিণত হয় সম্পূর্ণ মুক্ত একটি অঞ্চলে, এবং আশ-পাশের জেলাগুলোও দ্রুত সেই পথ অনুসরণ করে।

লি কোয়াঙ বিন'এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই প্রসংগে একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, "পশ্চিমের পার্বত্য জেলাগুলোতে যা ঘটেছিল, তাতে দিয়েমীরা ভয়ানক আতংকিত হয়ে পড়ে। এবার তারা সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য কেন্দ্রীভূত করে সমতল অঞ্চলে। ফলে সমতলের অধিবাসীরাও গেরিলা লড়াইয়ের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্রসংগতঃ, তাদের প্রথম তৎপরতাগুলোর একটি ছিল, উপজাতীয় মানুষদের সর্বাত্মক হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং এই ধরনের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য দিয়েমী সৈনিকদের শিক্ষিত করে তোলা। পার্বত্য অঞ্চলে লবণ, কাপড়, চাষের সরঞ্জাম ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী সরবরাহের ব্যাপারেও তারা অদ্ভুত কাজ করে। ফলে, ভিয়েতনামী ও উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নতুন করে সুদৃঢ় সেতুবন্ধ রচিত হয়. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও জনস্বাস্থ্যের কিছু প্রাথমিক বিষয় প্রচলন করবার উদ্দেশ্যে তারা সমতল অঞ্চল থেকে পার্বত্য অঞ্চলে কিছু কিছু শিক্ষকও প্রেরণ করে।"

সশস্ত্র সংগ্রামের প্রসার

কোয়াঙ নাই'য়ের দক্ষিণে হল বিন দিন প্রদেশ কোয়াঙ নাই প্রদেশে সংগ্রামের যে স্ফুলিংগ জ্বলে উঠেছিল, তা কিভাবে প্রাদেশিক সীমান্ত অতিক্রম করে উড়ে গিয়ে শুষ্ক বারুদের স্তূপে পড়ে, তার বিস্তারিত তথ্য আমাকে জানিয়েছিলেন মুক্তিফৌজের প্রাদেশিক বাহিনীর অধিনায়ক, প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রাক্তন ঝানু সৈনিক

৪৬ বৎসর বয়স্ক হুয়েন ভ্যান হাও। ১৯৫৯ সাল অবধি সেখানকার পরিস্থিতি মধ্য ভিয়েতনামের অন্যান্য প্রদেশের মতোই ছিল। সেই প্রসংগে বলেন, "১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তন হয়। ততদিন পর্যন্ত সংগ্রামের ধারা ছিল নিষ্ক্রিয়। তদন্তের জন্য সমন জারি করলে, লোকেরা কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হতে যতদূর সম্ভব বিলম্ব করত। কিন্তু ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে পুলিশ 'সম্মিলনী'তে হাজির হবার আহ্বান জানালে, পার্বত্য অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা সমতলে নামতে স্পষ্ট অস্বীকার করে। সীমান্ত বরাবর 'কম' উপজাতি যে বিদ্রোহ করেছে, এ সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং আমাদের প্রদেশের প্রধান সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বাহনার ও হ্রী সম্প্রদায় পরিষ্কার জানিয়ে দিল: 'এখানে এসে আমাদের নিয়ে যাও। ভিয়েতনামীদের মতো প্রহার এবং অত্যাচার সহ্য করবার জন্য আমরা নিচে নামবো না।'

"নিম্নাঞ্চলে কিছু সংখ্যক ভিয়েতনামীকে জোর করে সৈন্য বিভাগে ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের কোনো প্রত্যাশা ছিল না, সে কথা আমরা বুঝেছিলাম। পরবর্তীকালে সশস্ত্র অবস্থায় তাদের সংগে সাক্ষাৎ হলে, আমাদের মনোভাব আরো কঠিন হয়ে পড়ে। যাই-হোক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা কিন্তু সৈন্য বিভাগে চাকরি করতে অস্বীকার করে। তারা স্পষ্ট বলে, 'পরিবার-পরিজন, ক্ষেতখামার ও পাহাড় ছাড়া আমরা থাকতে পারব না।' ফলে, বলপূর্বক তাদের আদেশ কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি নাগাদ দিয়েমীরা প্রথমে প্লেটুন এবং পরে কোম্পানি পর্যায়ের সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। সৈনিকের চাকরি করতে পারে এমন বয়সের একটি লোককেও তারা ধরতে পারল না। তখন, সমস্ত গোষ্ঠীগুলোকে গ্রেপ্তার করে সমতল অঞ্চলে এক জায়গায় এনে রাখবার চেষ্টা করল তারা। কিন্তু সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। কারণ, তার আগেই গ্রামকে গ্রাম খালি করে সবাই গিয়ে আত্মগোপন করেছিল জংগলের মধ্যে। যারা কোনো রকমে ধরা

পড়ে গিয়েছিল, তাদের প্রতি দিয়েমীরা চূড়ান্ত অত্যাচার করে। সেই অত্যাচারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়বার সংগে সংগে জনসাধারণও প্রস্তুত হতে শুরু করল লড়াইয়ের জন্য।

"সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে কয়েকটি ঘটনা ঘটল। তখন ছিল ফসল কাটার সময়। তার আগে, ভিন থান জেলার তাও লক ও তুলেক গ্রাম দুটির বাহনার উপজাতীয় গোষ্ঠীর সমর্থ পুরুষেরা সৈন্য বিভাগে চাকরি করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে, শত্রু-সৈন্য ওই গ্রাম দুটিতে হাজির হল পাকা ফসল নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে। ততদিনে 'কর' উপজাতীয়দের সফল বিদ্রোহ এবং প্রতিরোধের কথা সবাই জেনে গেছে। বাহনার উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা গ্রাম ছেড়ে জংগলে গা ঢাকা দিল; বিষ মাখানো তীর দিয়ে হত্যা করল তিন জন দিয়েমী সৈনিককে। এ ছাড়া ক্ষেত-খামারের চারিপাশে পেতে রাখা ফাঁদে আহত হল আরো আট জন সৈনিক। অবশেষে সৈন্যেরা যাতে নির্বিঘ্নে ওই অঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণ করতে পারে তার জন্য দিয়েমীরা গ্রামের উপর বোমা বর্ষণ করতে পাঠাল বিমান। বিন দিন-এ এইটাই ছিল প্রথম স্ফুলিংগ। মনে হল, বিদ্রোহের আগুন বুঝি সেখানেই নিভে গেছে। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল, এই উদাহরণ অন্যান্য গ্রামগুলোকেও বেশ উৎসাহিত করে তুলেছে। উপর থেকে সব কিছু শান্ত দেখালেও, ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হচ্ছিল চাপা উত্তেজনা। ইতিমধ্যে কোয়াং নাই-এর কমরেডদের কাছ থেকে আমাদের প্রাক্তন প্রতিরোধ কাডারদের কাছে সংবাদ এসে গেছে। সেই খবরে আমরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হল, পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে কোয়াঙ নাই প্রদেশে শত্রু যে সর্বশক্তি সংহত করবার চেষ্টা করছে, তা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার।"

কোয়াঙনাই'তে দিয়েমীরা বিরাটাকারে অভিযান শুরু করতেই আমরা কোয়ঙনাই-এর সীমান্তবর্তী আনলাও জেলার হোয়াইঙ্গন নামক স্থানের একটি শত্রু সৈন্য ঘাঁটি আক্রমণ করলাম। কাউকে

হত্যা করা হল না। সৈনিকদের কেবলমাত্র বেঁধে ফেলে ওদের অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত কেড়ে নিলাম। পাওয়া গেল ১৬টি রাইফেল, ৩০টি গ্রেনেড এবং এক হাজারেরও বেশী কার্তুজ। আজকের দিনে অবশ্য এগুলোকে খুব সামান্য বলে মনে হবে। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় সেটা ছিল বিরাট একটা ব্যাপার।" এমন একটি হাসির সংগে তিনি কথাটি বললেন যে, স্পষ্ট বোঝা গেল 'আজকের দিনে' শত শত রাইফেল ও হাজার হাজার কার্তুজের কথা ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। একটু থেমে আবার বললেন, "আক্রমণের আরেকটা ফল হল এই যে, সামান্তে অবস্থিত আমাদের দেশপ্রেমিক বন্দর দিক থেকে শত্রুর দৃষ্টি অনেকখানি সরে গেল অন্য দিকে। দিয়েমীরা বুঝল, বিন-দিনকে অবস্থিত অবস্থায় ফেলে যাওয়া খুবই বিপদজনক।"

উত্তর দিকে অবস্থিত কোয়াঙ নাম ও থুয়া থিয়েন প্রদেশ দুটিতেও অনুরূপ আক্রমণের ঘটনা ঘটে। ফলে, কোয়াঙ নাই-এর উপর বিনাটাক্তর অভিযান সমাপ্ত হবার আগেই, বাইরে থেকে আমদানি করা কিছু কিছু সৈন্য ও মিলিশিয়াকে দিয়েমী কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়, এবং তাদের নিজের নিজের অঞ্চলে বিদ্রোহের ধূমায়িত আগুন নিভিয়ে ফেলার জন্য দ্রুত প্রেরণ করে। কিন্তু কর্মপন্থা পরিবর্তন তথা অস্ত্র ও রক্ষার্থে দমনের ঢালাও আদেশের কথা ছড়িয়ে পড়বার সংগে সংগে সেই ধূমায়িত আগুন অনতিবিলম্বে বিরাট দাবাগ্নির রূপ পরিগ্রহ করে।

সায়গন দিয়েমের বিরুদ্ধবাদী অফিসারদের ব্যর্থ বিদ্রোহের পাঁচ সপ্তাহ পরে, ১৯৬০ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ছিল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ফলে, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহগুলো প্রতিষ্ঠিত হল একটি সুসংগঠিত ভিত্তির উপর; এবং বর্তমানে যে সামরিক সংগ্রাম চলছে, তার রাজনৈতিক কাঠামোও একটি সুসংহত আকার পরিগ্রহ করল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে।
বি. এম. থুয়োটের চতুষ্পার্শ্বস্থ সংগ্রাম।

বান মি থুয়োট হল ডাকলাক প্রদেশের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র; ফরাসীরা যাকে হাউতস্ প্লেটু বলত, সেই তে-নুয়েন এর (পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল) একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে তেনুয়েন-এর যতখানি গুরুত্ব রয়েছে, তার সংগে সম্ভবতঃ তুলনা করা যায় লাওসের জারস্ সমতল অঞ্চলের। বিরাট, বিস্তৃত মালভূমি; বিমান ক্ষেত্রের পক্ষে আদর্শ স্থান। কম্বোডিয়া এবং লাওস সামান্তের খুব কাছাকাছি হবার দরুণ, বান মি থুয়োটের গুরুত্ব হয়েছে আরো বেশী। এবং এই গুরুত্বটি সায়গনের মার্কিন সামরিক কর্তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রকৃত পক্ষে, সায়গনের পরে বান মি থুয়োট ই হল দ্বিতীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র। তা'ছাড়া এটা হল দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জাতিগত মিলনের সর্ববৃহৎ কেন্দ্রীয় অঞ্চল; বিশেষ করে রেড, জারাই এবং ম'নঙ উপজাতীয় গোষ্ঠীর।

ত্রান দিন মিন ছিলেন ভিয়েতনামী। কিন্তু ১৪ বৎসর বয়সে স্বেচ্ছায় তিনি তে নুয়েন-এ চাকরি করতে যান, এবং ১৪ বৎসর সেখানে বসবাস করেন। ১৩ বৎসর বয়সে 'যোগাযোগ-রক্ষাকারী প্রতিনিধি'-রূপে কাজ করলেও, ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স এত কম ছিল যে, অস্ত্রশস্ত্র বহন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রেসিডেন্ট হো চি মিন-এর তিনটি 'সংগ নীতি', "সংগে কাজ করা, সংগে বাস করা ও সংগে ভোজন করা" অনুশীলন করে উপজাতীয়দের রীতি-নীতি, খাদ্য, ভাষা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছু তিনি

পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। ওই অঞ্চলটি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং তথাকার অধিবাসীদেরও তিনি ভালভাবে জানতেন। তারাও তাঁকে যথেষ্ট বিশ্বাস করত। সাও নামের মতো তিনিও ছিলেন 'বিপ্লবের সন্তান'। ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম দিকে কোয়াঙ নাম প্রদেশে তাঁর পরিবারের সবাই নিহত হন। স্বেচ্ছায় ডাকলাক'-এ কাজ করতে যাবার পর তিনি পাঁচটি উপজাতীয় ভাষা শিক্ষা করেন এবং একাধিক উপজাতীয় গোষ্ঠী তাঁকে 'পুত্র' রূপে গ্রহণ করে। দিয়েমীরা তাঁর বাগদত্তা বধূকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করে; এবং তাঁর সংগে যে সময় আমার সাক্ষাৎ হয়, সেই সময় বহু উপজাতীয় গোষ্ঠী তাঁর জন্য উপযুক্ত একটি পাত্রীর সন্ধানে উঠে-পড়ে লেগেছিল।

যে ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করতে যাচ্ছি, তার জন্য মিন যে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একাকী, একটি মাত্র পিস্তলের সাহায্যে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের ঘাঁটী প্রতিষ্ঠিত করে দেন, কি পুরোটাকে ঘিরে ফেলার দাবি তাঁর কাছে করা অযৌক্তিক তবু, সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন তিনি। সেটা ছিল ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। ওই সময়েই জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল

মানচিত্রে স্থানটিকে সাধারণত সংক্ষেপে . এস. থুয়েট বলে উল্লেখ করা হয়। দিয়েমদের একটি ডিভিসন ও একটি রেজিমেন্টসহ ৮ নং আর্মি রেঞ্জার-এর সদর ঘাঁটি ছিল থুয়েটে। কয়েকদিনের মধ্যেই মিন জনকয়েক পুরনো বন্ধুকে যোগাড় করে ফেললেন। এঁদের তিন জন ছিলেন ভিয়েতনামী, এবং চার জন উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোক। অস্ত্রের মধ্যে প্রত্যেকের কাছে ছিল একটি করে খাপ-ঢাকা ছুরি।

ঘটনাটির কথা উল্লেখ করে মিন আমাকে বললেন, "আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল জনগণের হাতে অধিকার করা ভিত্তি স্থাপন করবার এইটাই একমাত্র পন্থা বলে আমরা মনে করি। কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া কোনো-কিছু করা অসম্ভব। তাই একদিন একটি দিয়েমী

লরি আটক করলাম। কিন্তু তার ভিতরে কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না; ছিল শুধু সেনাবাহিনীর কিছু পোশাক। বেশ হতাশ হয়ে পড়লাম সবাই। তবু যতগুলো সম্ভব পোশাক নিয়ে নিলাম সেখান থেকে। তারপর একটা মতলব মাথায় এলো। বি. এম. থুয়োটের চারিধারে ছিল 'কৃষি উপনিবেশ'। সমতল অঞ্চলের সন্দেহভাজন ভিয়েতনামীদের ওই উপনিবেশগুলোতে নির্বাসিত করা হয়েছিল। দিয়েমের পরিবারের লোকজনদের জন্য সেখানে তাদের দিয়ে রবার ও কফির আবাদ করানো হত। প্রত্যেকটি আবাদে ছিল একটি করে সৈন্য-ঘাঁটি। দিয়েমী সৈনিকের পোশাক পরে কোনো ঘাঁটির ভিতর ঢুকে অস্ত্রশস্ত্রগুলো কেড়ে নিলে কেমন হয়?"

একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় একটি 'কৃষি উপনিবেশ' থেকে বেরিয়ে এলো একটি ট্রাক; যাবে বি. এম. থুয়োটের দিকে। সংগে সংগে দিয়েমী অফিসারের ইউনিফর্ম পরিহিত ত্রান দিন মিন ও তাঁর সংগীরা ট্রাকটিকে থামালেন। চালক বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারই করল তাঁদের সংগে। সৈন্য ঘাঁটির সঠিক অবস্থান বলে তো দিলই, উপরন্তু [illegible] করে তাঁদের ভিতরে নিয়ে যেতেও সম্মত হল। দিয়েমী সৈনিকের পোশাক পরিধানে থাকায় গেটের সান্ত্রীরাও কোনো রকম বাধা দিল না। সেই প্রসংগে ত্রান দিন মিন বললেন, "গাড়ি চালিয়ে সোজা আমরা গিয়ে হাজির হলাম ক্যাপ্টেনের আবাসে। একটা বিছানার উপর বসে ক্যাপ্টেন সে সময় গীটার বাজাচ্ছিল আর কয়েকজন সৈনিক সেই সুরের সংগে পাশ্চাত্য নৃত্য করছিল। ওদের বন্দুকগুলো জড়ো করে রাখা ছিল এক কোণে। একই সংগে আমরা ওদের এবং ক্যাপ্টেনকে ঝাপটে ধরলাম। আমরা যে জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্টের লোক সে কথা জানিয়ে দিয়ে ক্যাপটেনকে আদেশ করলাম, তার সমস্ত লোকজনদের সেখানে একত্রিত করে প্রত্যেকের অস্ত্রশস্ত্র তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করাতে এবং তারপর মুক্তিফ্রন্টের নীতি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য তাদের শোনবার ব্যবস্থা করতে। নইলে যে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হবে সে কথাও জানিয়ে দিলাম।

"প্লেটুনের বাকি লোকগুলোও অবিলম্বে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এল। নিজের-নিজের অস্ত্রশস্ত্র সব জমা করে রাখল এক জায়গায়। তারপর গিয়ে জমায়েত হল গ্যারিসনের মাঠে। সংগে সংগে আমাদের লোকেরা সেই অস্ত্রগুলো নিয়ে উপযুক্ত স্থানে মোতায়েন হয়ে গেল। আমি শুরু করলাম ওই সৈনিকদের সংগে কথা বলতে। আমার বক্তৃতা শেষ হবার অনেক আগেই দেখা গেল সবাই আমাদের দলে যোগদান করছে।"

অধিবাস দিলেন সৈনিকদের [illegible]। এই গ্যারিসনের সৈন্যদেরও বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছিল কাজেই, তাদের দিন [illegible] এর প্রতিটি কথা সাড়া জাগালো তাদের অন্তরে। ১৯ জন সৈনিক সবাই যোগ দিল তাঁদের সংগে। মাইল খানেক দূরে আরেকটি সৈন্য-ঘাঁটি থাকা সত্ত্বেও তারা 'কৃষি উপনিবেশে'র বাসিন্দাদের একটা সভার আয়োজন করে ফেলল। সভায় হাজির হল সবসুদ্ধ ১,৭০০ জন মানুষ।

[illegible] বললেন, "আমাদের লোকের এর কথাবার্তা শুনেও যেন তারা নিজেদের চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। [illegible] নিশ্চই অনেকে সত্যি সত্যিই আনন্দে কাঁদতে লাগল। চাষীরাও দেশী সুরে পীড়াপীড়ি করতে লাগল আমাদের বাহিনীতে তাদের গ্রহণ করার জন্য। ওই ঘাঁটি থেকে [illegible] টি [illegible] অস্ত্র ছিল আমাদের দখলে। তাছাড়া, সংগ্রহ [illegible] টি [illegible] ব্যবস্থা বলতে আমাদের কিছুই ছিল না। তাই [illegible] ৭৫ জনকে [illegible] বাহিনীতে নিলাম। আমার সঙ্গে নতুন [illegible] নতুন [illegible] গুলোকে দিলাম তাদের অধীনে। উপনিবেশে [illegible] প্রবেশ করবার সময় একটি পিস্তল ও সাতটি ছুরি নিয়ে মোট আমরা ছিলাম আট জন মানুষ। যখন বেরিয়ে এলাম, তখন আমাদের সংগে রয়েছে ১১১ জন লোক, একটি সাব মেশিনগান ও ২৮টি রাইফেল।"

বি. এম. থুয়োটের চারিধারে দাবার ছকের মতো পর্যায়ক্রমে রয়েছে জংগল ও আবাদ। মিন যে সময় তাঁর তৎপরতা শুরু করেন, তখন শহরের চারিপাশে ছিল ৫০০০ ভিয়েতনামী শ্রমিকসহ এগারটি ফরাসী আবাদ এবং সমতলের ২৫,০০০ ভিয়েতনামীদের নিয়ে গঠিত ছয়টি 'কৃষি উপনিবেশ।' এগুলোর প্রত্যেকটিতে মিন একটি করে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রসংগত একটা কথা জানানো দরকার। এই 'কৃষি-উপনিবেশ'গুলো ছিল দিয়েম এবং তাঁর মার্কিন 'পরামর্শদাতা'-দের মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভট একটি পরিকল্পনা। এর উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মারা। প্রথম, সমতল অঞ্চল থেকে 'সন্দেহ ভাজন' অথবা সম্ভাব্য 'গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী'দের সেখানে নির্বাসিত করা। দ্বিতীয়, ভিয়েতনামী ও উপজাতীয় লোকদের পরস্পরের প্রতি লেলিয়ে দেওয়া। কারণ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্রামগুলোকে বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে এবং উপজাতীয় মানুষদের তাদের শিকার-ভূমি থেকে বিতাড়িত করে 'কৃষিউপনিবেশ'গুলো স্থাপন করা হয়েছিল। তৃতীয়, তে ন্যুয়েন এর উর্বর ভূমিকে কফি, চা ও রবার বাগিচায় পরিণত করবার উদ্দেশ্যে সুলভে মজুর সরবরাহ করা। এবং চতুর্থ, বিশেষ করে বি. এম. থুয়োটের বেলায়, গুরুত্বপূর্ণ ওই কেন্দ্রটির চারিপাশের নিরাপত্তামূলক মনুষ্য-বসতিরূপ ব্যূহের মধ্যে-মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা ছিল, সেগুলো ভরাট করা। কিন্তু নির্বাসিত ভিয়েতনামী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস যে মাত্র একটি—সায়গনের মার্কিন-দিয়েম চক্র, এই সত্য, উৎপীড়িত ব্যক্তিরা যদি স্বচক্ষে নাও দেখে থাকতো, তবু তাদের কাছে প্রমাণ করতে মিন-এর মতো একজন সুদক্ষ প্রচারকের খুব বেশী দিন লাগত না। মিন, এবং তাঁর গঠিত 'সশস্ত্র প্রোপাগাণ্ডা দল' অনতিবিলম্বেই এক সর্বজনীন উৎপীড়কের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষদের নিয়ে অভিযান শুরু করে দিলেন। এবং, নির্বাসিত ভিয়েতনামী ও উপজাতীয়দের মতোই, বাগিচা শ্রমিকদেরও সংগঠিত করতে খুব

একটা বেগ পেতে হল না। মিন ছিলেন অত্যন্ত কৌশলী। ফরাসী বাগিচা মালিক ও ম্যানেজারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ব্যবহার করতে কসুর করলেন না তিনি। ফরাসীরা দুর্ব্যবহার না করলে কোনো রকম শ্রমিক অসন্তোষ হবে না, এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে শীঘ্রই সায়গনের পরিবর্তে জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্টের তরফ থেকে মিন বাগিচা মালিকদের কাছ থেকে কর আদায় করতে শুরু করলেন। ১৯৬১ সালের শেষ ভাগে 'কৃষি উপনিবেশ'-গুলোর উপর থেকে দিয়েমী নিয়ন্ত্রণ খসে পড়ল। নিশ্চিহ্ন হল সমস্ত সৈন্যঘাঁটি। উপনিবেশগুলোর বাসিন্দারা ফ্রন্টে যোগদান করে স্ব-প্রশাসন কমিটি নির্বাচিত করল। রবার বাগিচার শ্রমিকেরাও নিজেদের ইউনিয়নগুলোর মাধ্যমে সংযুক্ত হল ফ্রন্টের সংগে।

অবস্থার গতিক দেখে আমেরিকানরা এবার প্রমাদ গুনলো। বি এম. থুয়োটের জন্য তখনো তাদের বড়-বড় সমস্ত পরিকল্পনা ছিল। গেরিলারা যে সমস্ত কাগজপত্র আটক করে তাতে সায়গন বিপদাপন্ন হলে এই স্থানটিকেই শেষ-পরিখা-প্রাচীররূপে গড়ে তোলবার ইংগিতও পাওয়া যায়। মাটির নিচে অস্ত্রভাণ্ডার এবং জটিল সমস্ত সাজসরঞ্জাম ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণের সর্ব রকমের চেষ্টা করা হয়েছিল। 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' গুলোতে সর্বাধিক সংখ্যক উপজাতীয় লোকদের কেন্দ্রীভূত করে মানব-রক্ষ সম্পূর্ণ একটি বলয়, অর্থাৎ 'ভিয়েতকং' আক্রমণের 'প্রথম আঘাত' সামলাবার উদ্দেশ্যে আর একটি প্রাচীর নির্মাণের নতুন একটি পরিকল্পনার কথাও জানা গেছে অধিকৃত কাগজপত্র থেকে। সেই সংগে 'কৃষি উপনিবেশ'গুলোকে আবার নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে, সেখানকার বাসিন্দা তথা—স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট-এর উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা যাতে ভিয়েতকংদের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করবার পরিকল্পনা ছিল। ১৯৬১ সালের শেষভাগে খোলাখুলি মাকিন হস্তক্ষেপের সংগে-সংগে এই সমস্ত নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছিল।

'নতুন' আমেরিকান

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের কেন্দ্রীভূত করে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে তাদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে প্রধান ঘাঁটিরূপে নির্বাচিত করা হয়েছিল বি. এম. থুয়োটের মাইল দুয়েক দূরে অবস্থিত বুওন ইয়া নাও নামক গ্রামটিকে। প্রতিটি গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষা গ্রহণের জন্য, এবং গ্রাম প্রতি দশ জন করে সমর্থ পুরুষ 'জানোয়ার'দের কবল থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সামরিক শিক্ষা লাভের জন্য সেখানে যাতে যায়, সেই নির্দেশও জারি করা হয়েছিল। তে নুয়েন প্রদেশের ৩৭টি সংখ্যালঘু দলের অবিসংবাদী নেতা ইবি 'আলেও'র জন্মস্থান ছিল বি. এম. থুয়োট জেলায়। ফরাসী শিক্ষিত অভিজ্ঞ সৈনিক, ধূসরবর্ণ, পক্বকেশ এই ব্যক্তিটি হলেন জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সহ-সভাপতি। তাঁর কাছে শুনেছি, আমেরিকানদের বিশেষ পরামর্শক্রমে দিয়েমীরা সংখ্যালঘুদের পারতপক্ষে বলতে চাইত না যে, মুক্তিফ্রন্ট অথবা 'ভিয়েতকং'দের বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে। কারণ এই ধরনের বিরূপ মন্তব্য যে উপজাতীয় লোকদের আরো বিরোধী করে তুলবে, এ কথা তাদের জানা ছিল। এই প্রসঙ্গে ইবি আলেও আমাকে বলেছিলেন, "কথাবার্তা চালাত পাদ্রীর পোশাক পরা একজন মার্কিন অফিসার। বোঝাত, তাদের শুয়োর, মুরগি প্রভৃতি যে সমস্ত 'অনধিকার প্রবেশকারীরা' চুরি করে, তারা 'দিয়েমী সৈনিক' হলেও ওদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রগুলো দেওয়া হচ্ছে তাদের। কৌশলটি ছিল খুবই চাতুর্যপূর্ণ। কারণ, জনসাধারণের প্রতি দুষ্কার্যের কারণে দিয়েমী সৈনিকদের সুনাম হানি হয়েছে, সে কথাটা স্বীকার করে নেওয়া হত।"

এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত বিবরণ আমি পেয়েছিলাম জনৈক বর্ষীয়ান গ্রামবাসীর কাছে। গ্রামের, অথবা তাঁর নাম আমি উল্লেখ

করতে পারব না। কারণ তাঁর গ্রাম বর্তমান রয়েছে সায়গনের নিয়ন্ত্রণাধীনে, এবং এখনো তিনি সেখানেই বসবাস করছেন। চমৎকার, গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা ভদ্রলোকের। প্রতিটি কথা বলেছিলেন বেশ ভেবে-চিন্তে:

"সেই আমেরিকানটি রেড উপজাতীয় ভাষা জানত; এবং নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে (ফাদার) ভিও বলে। বলত, সে হল 'নতুন' আমেরিকান; এবং 'পুরনো' আমেরিকানরা আমাদের উপর অত্যাচার করতে দিয়েমীদের সহায়তা করে বলে, 'নতুন' আমেরিকানরা না কি 'পুরনো' আমেরিকানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আরো বলত, 'তোমরা যাতে সত্যিকারের স্বাধীনতা পাও, তার জন্য আমরা তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু তোমরা দিয়েমী অথবা ভিয়েতকং কাউকেই সাহায্য করতে পারবে না। তোমাদের যা দরকার সব আমরা দেব, এবং তোমাদের নতুন ঘর-বাড়ি তৈরী করতেও সাহায্য করব। কাপড়, চাল, লবণ, সাইকেল সব-কিছু দেব তোমাদের। এমনকি দুর্বৃত্তদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র অবধি।' এ সমস্ত শুনে আমরা কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। জানতাম, আমেরিকানরা দিয়েমকে সাহায্য করে; এখন হঠাৎ কতগুলো লোক এসে বলছে, তারা দিয়েম বিরোধী। এই 'নতুন' আমেরিকানটি দেখতে ছিল ঠিক 'পুরনো' আমেরিকানদের মতোই। দেখে তাকে মনে হত সেনাবাহিনীর লোক বলে; অথচ পোশাক ছিল ফরাসী ধর্মযাজকদের মতো। কিন্তু নিজেই বলত সে ক্যাথলিক নয়। বলত, 'যীশু আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাদের সাহায্য করতে; কিন্তু আমার ধর্ম হল 'নতুন' আমেরিকানদের 'নতুন' ধর্ম।

"এই প্রসঙ্গে বেশ মজার একটা উপমা দিত সে। বলত, 'ব্যাপারটা হল, 'পুরনো' আমেরিকান আর 'দিয়েমীরা' হল বিড়াল, আর ভিয়েতকংরা হল ইঁদুর। ইঁদুর অলক্ষ্যে তোমাদের ধানক্ষেতে ঢুকলেই, বেড়াল তাদের মারতে আসে। এবং তাদের মারতে গিয়ে

তোমাদের ফসলেরও ক্ষতি করে তারা। সুতরাং, ধানক্ষেতে ইঁদুর ঢোকবার পথ তোমরা বন্ধ করে দিলেই বিড়াল আসবার পথও বন্ধ হয়ে যাবে। আর বিড়াল কিংবা ইঁদুর কেউই তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ওদের উভয়কেই শায়েস্তা করবার জন্য আমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র দেব।

"ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের লোকেরা নিজেদের ভিতরে আলাপ-আলোচনা করল। কিন্তু মন থেকে আমাদের সন্দেহ গেল না। বন্দী-শিবিরে বাস করতে আমরা রাজি নই; ওদের অস্ত্রশস্ত্রও আমরা চাই না। তাই, ইয়ে তিওর প্রস্তাবে স্পষ্ট না করে দিলাম। চিরকাল আমরা পুরনো পদ্ধতিতেই নিজেদের রক্ষা করে এসেছি।

"আমাদের জবাব শুনে ইয়ে তিও ভয়ানক রেগে গেল। বলল, 'অস্ত্রধারণ করতে রাজি না হলে, 'পুরনো' আমেরিকান ও দিয়েমীরা এসে যদি তোমাদের হত্যা করে, তা হলে নিজেদের দোষেই কিন্তু তোমরা মারা পড়বে।'

"কয়েকদিনের মধ্যেই এক হাজারেরও বেশী সৈন্য এসে হাজির হল আমাদের এলাকায়। পাঁচটি গ্রাম ওরা জ্বালিয়ে দিল। হত্যা করল ২০ জনকে; তাদের বেশীর ভাগই শিশু ও বৃদ্ধ। আমাদের উপজাতীয় লোকদের বি. এম. থুয়োটে আবার বন্দীশিবিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করা হল। সেই মতো আমরা হাজার খানেকেরও বেশী লোক ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জড়ো হলাম। প্রত্যেকেরই পিঠের উপর বন্দুক উঁচিয়ে ধরে দিয়েমী সৈন্যরা আমাদের ঘিরে ফেলল। প্রাদেশিক গভর্নর এবং জেলা শাসকের সংগে ইয়ে তিও নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে-ই আমাদের বলল, 'হয় এই মুহূর্তেই বন্দী শিবিরে যেতে সম্মত হও; নইলে আগামী কাল তোমাদের সবকটি গ্রামেই সৈন্য পাঠানো হবে।'

"গভীর দুঃখে সবাই আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম মাথা নিচু করে। কোথাও কোনো আশার আলো নেই। এমন সময়, বুয়োন জু গ্রামের প্রায় সত্তর বৎসর বয়সের সর্বজন পরিচিত বৃদ্ধ আই ক্র একটি চালা

ঘরের বারান্দায় উঠে বলতে শুরু করল, 'আমরা উপজাতীয় মানুষেরা চিরদিন নিজেদের ক্ষেত-খামার, বন-জংগল, নদী-নালা এবং গাছ পালার মধ্যে বস-বাস করে এসেছি। আজ আপনারা আমাদের এ সমস্ত ছেড়ে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে আবদ্ধ করে রাখতে চাইছেন। এটা করা হলে, আমরা তিল-তিল করে মারা যাব। এই মুহূর্তে আমাদের ঘিরে রয়েছে আপনাদের সৈন্য আর বন্দুক। সব চাইতে ভাল হল, বন্দুকের ঘোড়াগুলো এখনি টেনে দিন; সবাই এক সংগে এখনি মরে যাই।'

"কথাটা শেষ হতে না হতেই জেলা শাসক এগিয়ে গেল তার দিকে: নির্বোধ বৃদ্ধ! সরকার তথা আমেরিকানদের কথা না শুনলে তোমাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। আর, ওই ভাবে যদি কথা বল, তা হলে আগে তোমাকে এখনই হত্যা করা হবে।

'জেলা শাসকের হুমকি শুনে বৃদ্ধ আই ক্রু চীৎকার করে উঠল 'আপনি মারা গেলে হারাবেন আপনার বাড়ি, আবাদ, সুন্দর গাড়ি, সুন্দরী সব স্ত্রীলোক। আর আমি মারা গেলে হারাবো শুধু এইটি', কথাটি বলেই সে পরনের ন্যাকড়াটাকে একটানে খুলে জেলা-শাসকের মুখের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর উলংগ অবস্থায় বুক চিতিয়ে দাঁড়াল বন্দুকের সামনে। চারিদিকে জেগে উঠল প্রচণ্ড উত্তেজনা। বৃদ্ধকে বাঁচাবার জন্য সবাই ছুটে গেল সামনের দিকে। সবাইয়ের মুখে এক আওয়াজ, 'বন্দীত্ব নয়; বন্দীত্ব নয়'। প্রচণ্ড ধাক্কা-ধাক্কিতে অফিসারেরা কে কোথায় ছিটকে পড়ল। বন্দুক তুলে সৈন্যেরা দাঁড়াল প্রস্তুত হয়ে। সেই সময় ইয়ে তিও শুকনো মুখে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'এত গোলমাল কেন? এত উত্তেজনাই বা কেন? তোমাদের মতামত জানবার জন্য ডাকা হয়েছিল। এবার বাড়ি ফিরে যেতে পার।'

"সেই রাতেই নিকটবর্তী এক ঘাঁটি থেকে সৈন্যেরা এসে বৃদ্ধকে টেনে বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। পরের দিন কুড়িটি গ্রামের মানুষ এসে জড়ো হল বৃদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাতে। উপজাতীয় মানুষেরা

প্রতিজ্ঞা করল, আই ক্রু'র মতো তারাও লড়াই চালিয়ে যাবে। সমস্ত বন-জংগল যেদিন শেষ হয়ে যাবে এবং নদী-নালা যাবে শুকিয়ে, কেবল সেই দিনই রেড উপজাতি সম্মত হবে বন্দীশিবিরে যেতে। তার আগে নয়। দিয়েমীরা কিন্তু হাল ছাড়ল না। বি. এম. থুয়োটের আশ-পাশের কয়েকটি গ্রামকে বেড়া দিয়ে ঘিরে পরিণত করল 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-এ। গ্রামগুলোকে ওরা ঘিরল বেড়া দিয়ে; কিন্তু ঘিরতে পারল না আমাদের হৃদয়। কারণ, তা ছিল বিপ্লবের প্রতি উৎসর্গ করা।"

বন্দী জীবন

আই ক্রু-র হত্যার যে ঘটনাটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি সেটা ঘটেছিল ১৯৬১ সালের শেষের দিকে। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ দিয়েমীরা আংশিকভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেয় ওদের উপর। প্রথমেই বন্ধ করে দেয় লবণের সরবরাহ। উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা যাতে ধানের বদলে পাটের চাষ করে সেই মর্মে স্থানীয় আমলারা আদেশ জারি করে; কারণ আমেরিকানরা আরো সস্তায় চাল দিতে পারবে। 'হবি আলেও'র বক্তব্য অনুসারে এই সময়েই দিয়েমীরা সংখ্যালঘুদের গ্রামে 'গিবস্' এবং 'ফাউনটেনপেন' বোমা পেতে রাখতে শুরু করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও চাষ-আবাদ রক্ষার জন্য ফাঁদ পেতে রাখত। এরই প্রতিশোধ হিসাবে দিয়েমীরা ওই দুই ধরনের বোমা পাততে শুরু করেছিল। 'গিবস' বোমাগুলো ছিল এক ধরনের ছোট্ট প্রেশার মাইন। আকারে এবং দেখতে অনেকটা 'গিবসে'র দাঁতের মাজনের কৌটোর মতো। 'ফাউনটেনপেন' বোমাগুলো ছিল পার্কার কলমের মতো দেখতে। হানাদারেরা কোনো বসতিতে হাজির হয়ে কাউকে না দেখতে পেলেই 'গিবস' বোমা লুকিয়ে পেতে রাখত চারিদিকে; বিছানা, টেবিল, রান্নার পাত্র অথবা বাঁশের মাচার মেঝে, কোনো

জায়গাই বাদ দিত না। 'ফাউনটেন পেন' বোমাগুলো ঘাসের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রেখে দিত। খেলা করতে করতে শিশুরা সেগুলো ছুঁতেই বিস্ফোরণে উড়ে যেত তাদের হাত অথবা মাথা। ইবি আলেও বলেছিলেন, "শত্রু হানা দেবার পর, লোকেরা বাড়িতে ফিরে আসার সংগে সংগেই শুরু হয়ে যেত বিস্ফোরণ, কান্না এবং গোঙানি ; এবং তা চলত গভীর রাত অবধি।" ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস থেকেই দিয়েমীরা ঢাক অথবা মাদল বাজানো নিষিদ্ধ করে দেয়। কারণ, ওগুলোকে ওরা ভিয়েতকংদের প্রতি এক ধরনের সংকেত বলে সন্দেহ করত।

ত্রান দিন মিন আমাকে বলেছিলেন, ওই সময়ে বহু যুবক তাঁদের ঘাঁটিগুলোতে এসে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট বাহিনীতে নাম লেখায়। "এমনও হয়েছে, গ্রামকে গ্রাম এসে বসতি স্থাপন করেছে আমাদের কাছাকাছি জায়গায়। কিন্তু আমাদের নিজেদেরই রসদাদি যোগানোর সমস্যা ছিল তীব্র। তাই বহু লোককে আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। ক্রমে সংগ্রাম আরো কঠিন হয়ে উঠল। গ্রামগুলোকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলবার পরই দিয়েমীরা বাসিন্দাদের 'রক্ষা' করবার অজুহাতে শুরু করল সৈন্য ঘাঁটি স্থাপন করতে। উপজাতীয় মানুষদের সশস্ত্র সংগ্রামে পূর্ণরূপে নেতৃত্ব দেবার মতো প্রস্তুতি তখন আমাদের ছিল না। সুতরাং সে রকম কোনো চেষ্টা করতে গেলে [illegible]দের শুধু নির্মম প্রতিহিংসার মুখেই ঠেলে দেওয়া হত। কোনো রকমেই তাদের আমরা রক্ষা করতে পারতাম না। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অন্যান্য অঞ্চলের মতো, সেখানে পাহাড়-পর্বতও ছিল না যাতে প্রয়োজন হলে সেখানে যেয়ে তারা আত্মগোপন করতে পারে। তার উপর, সেখানে শত্রুর সামরিক শক্তি ছিল আমাদের চাইতে অনেক বেশী। তাই আমরা রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির দিকেই সব[illegible] মনোযোগ দিয়েছিলাম।"

এক শত বৎসর পূর্বে আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ানদের সর্বাত্মক হত্যাকাণ্ডের পর অবশিষ্ট রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্য আমেরিকানরা যে

'পৃথকীকরণের' কৌশল উদ্ভাবন করেছিল, ভিয়েতনামে উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষদের জীবন-যাপন প্রণালীও ক্রমশঃ সেই ধরনের হয়ে পড়ে। অবরুদ্ধ গ্রামগুলো থেকে তাদের বাইরে বেরুতে দেওয়া হত কেবলমাত্র দিনের বেলায়। ফলে, তাদের চাষ-বাসের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুতঃ গ্রামের এক কিলোমিটার পরিধির মধ্যে অবস্থিত ক্ষেত-খামার ছাড়া অন্য কোথাও তাদের কাজ করতে দেওয়া হত না। সাধারণতঃ উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা এমন সময় গ্রাম থেকে বেরোয় যাতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, পুরো দিনটা তারা চাষ-আবাদের কাজ করতে পারে। জংগলের মধ্যে ভিয়েতকংদের সাথে তারা যাতে কোনো রকম সংযোগ স্থাপন না করতে পারে, তার জন্য নতুন সমস্ত আদেশ বলবৎ করা হয়। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা অতটুকু জায়গার ভিতরে গৃহপালিত পশুর স্থান সংকুলান হত না। ফলে সেগুলোকে জংগলে ছেড়ে দেওয়া হয়; এবং তারা বাঘের খাদ্যে পরিণত হয়। উপজাতীয়দের সামাজিক মেলামেশার সব চাইতে জনপ্রিয় পন্থা হল এক গ্রামের আনন্দ উৎসবাদিতে অন্য গ্রামের অংশ-গ্রহণ করা। সেটিও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। পুরুষদের একফালি ছেঁড়া ন্যাকড়া ও মেয়েদের গোড়ালি অবধি লম্বা স্কার্ট, এই হল উপজাতীয়দের একমাত্র পোশাক। কিন্তু বেড়ার বাইরে বেরুবার অথবা ভিতরে প্রবেশ করবার সময় ওই সামান্য পোশাকও তাদের তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে অসম্মান করা হত। শিকার করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের। গ্রামের এক কিলোমিটার পরিধির মধ্যে কী-ই বা শিকার পাওয়া যেতে পারে?

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সংগে ভিয়েতনামের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর যে তুলনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে, তা মর্মান্তিকভাবে সত্য। পুরাতন পদ্ধতিতে ওদের সমূলে ধ্বংস করবার অভিযান শুরু করেছিল দিয়েমীরা; এবং এখন পরবর্তী পর্যায়ের জন্য চলছে পৃথকীকরণ। তাদের জমি-জমা গেছে, শিকার গেছে, রীতি-নীতি পদদলিত হয়েছে। এক কথায়, তাদের সম্পূর্ণ জীবন-যাত্রাই হয়ে গেছে

বিপর্যস্ত। হয়তো শেষ পর্যন্ত তারা শেষই হয়ে যাবে। কিন্তু উপজাতীয় লোকেরা এত সহজে ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি নয়। জনৈক উপজাতীয় বৃদ্ধের কথা এর আগে উল্লেখ করেছি। এই প্রসংগে তিনি বলেছিলেন: "আমাদের জীবন-যাত্রা দেখবার জন্য গ্রামে গেলে যা দেখতে পাবেন, তা হল ছাইয়ের মতো। কিন্তু সেই ছাইয়ের নিচে চাপা রয়েছে জ্বলন্ত অংগার। যে দিন ঝড় এসে ছাইগুলো উড়িয়ে নিয়ে ওই আগুনকে জীবন্ত করে তুলবে, সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি।"

অবরোধের ভিতরে দিনের বেলায় নিয়ন্ত্রণ করে বেড জাতির লোকেরা। অনেকদিন আগে এদের বেছে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ফিলিপিনে এদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এবং, 'নতুন' আমেরিকানদের 'নতুন' ধর্মের প্রতিভূরূপে এদের পরিচিত করা হয়েছে। বেড'দের ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি, তা হল, তারা ক্যাথলিক ধর্মে শিক্ষিত; কিন্তু যাজক-পুরোহিতরা এদের ক্যাথলিক বলে স্বীকার করে না। ওদের মতে "ওটা ছিল ফরাসী ঔপনিবেশিক-দের ধর্ম। আমাদেরটা হল 'নতুন' ধর্ম।" ধর্মীয় কাজের সংগে ওরা মিশিয়েছে রাজনৈতিক কার্যকলাপ। অবরোধগুলোর ভিতরে রাত্রে থাকতে সাহস করে না ওরা; তাই ফিরে যায় বি. এম. থুয়োটে। এদের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত উপজাতীয় বৃদ্ধ আমাকে বলেছিলেন, "এদের মধ্যে সব চাইতে বেশী হিংস্র লোকগুলো পথ-দুর্ঘটনায় পতিত হয়। মনে হয় বাঘে ধরে নিয়ে যায় ওদের; কারণ মৃতদেহগুলো কোনো দিনই পাওয়া যায় না।"

১৯৬২ সালে বিনাটাকার এক অভিযানের পর দিয়েমীরা 'কৃষি-উপনিবেশ'-গুলো'সহ বি. এম. থুয়োটের চারপাশের অঞ্চল পুনর্বার সায়গনের নামেমাত্র নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। কিন্তু অবস্থা দেখে-শুনে 'জ্বলন্ত অংগার' পরিস্থিতির কথাটি যে খাঁটি, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

১৯৬৩ সালের শেষ নাগাদ দিয়েমীরা আবার বি. এম. থুয়োটের

মাইল ছয়েক পরিধির মধ্যে পিছিয়ে আসে এবং শহরটিকে চারিধারে নয় ফুট উচ্চ তিন সারি বেড়া দিয়ে ঘিরে মধ্যযুগীয় এক দুর্গে পরিণত করে। বাইরের এবং দ্বিতীয় সারির বেড়ার মধ্যে দূরত্ব ছিল কুড়ি গজ, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির দূরত্ব ছিল দশ গজ। শহরের ভিতরের অংশটিকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি ভাগকে আবার পৃথক পৃথক ভাবে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়েছিল। বেড়াগুলোর মধ্যের খালি অংশে পরিখা খনন করে তার মধ্যে বসানো হয়েছিল তীক্ষ্ণাগ্র সমস্ত বর্শাফলক। শুধু তাই নয়; প্রত্যেকটি বাড়ির চার পাশেই বর্শাযুক্ত খাদের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। যাওয়া-আসার জন্য খাদগুলোর উপর পাতা থাকত তক্তা। রাত্রিবেলা সেই তক্তাগুলোকে তুলে রাখা হত। এ সমস্ত ব্যবস্থার প্রধান শিকার অবশ্য হত সাধারণ মানুষ; তাদের শিশুরা আর কুকুর, শুয়োর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু। সূর্যাস্তের পরই বর্শাগুলোকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হত; এবং ঢেকে দেওয়া হত আবার সেই ভোরছ'টার ঘণ্টা বাজবার পর।

বি. এম. থুয়োটোর জন-জীবনের আংশিক চিত্র মাত্র উপরে উল্লেখ করা হল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য আমাকে প্রদান করেছিলেন জনৈক সাংবাদিক ভদ্রলোক। বিশেষ করে আমার সংগেই সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি গোপনে পালিয়ে এসেছিলেন শহর থেকে। বলেছিলেন, "এ শহর হল আতংক আর সন্ত্রাসের। কর্তৃপক্ষ সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। কারণ, তারা জানে যে শহরের চারিপাশে ঘিরে রয়েছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সশস্ত্র বাহিনী; এবং সর্বরকম সাবধানতা সত্ত্বেও, শহরের ভিতরে রয়েছে গেরিলাদের ঘাঁটি। জনসাধারণ আতংকিত; কারণ চতুর্দিকে গিজ-গিজ করছে পুলিশ আর গুপ্তচর। যে কোনো মানুষকে ভিয়েৎকং বলে সন্দেহ হলেই গ্রেপ্তার অথবা হত্যা করার অবাধ অধিকার দেওয়া আছে তাদের। একবার কেউ গ্রেপ্তার হলে, আর তার খোঁজ কখনো পাওয়া যায় না। এই হল পরিস্থিতি। পথ-চলতি কেউ জাতীয়

মুক্তি-ফ্রন্টের কোনো পরিচিত ব্যক্তির দেখা পেলেই সমূহ বিপদ। উভয়ে যে পরিচিত, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ইংগিত না দেখালেও, সেই রাতেই হয় সে গ্রেপ্তার হবে ; নইলে পরিবারবর্গকে নিয়ে পালিয়ে যাবে মুক্ত এলাকায়। কেন? কারণ দালাল আর গুপ্তচরেরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; এবং পরিচিত একজন ভিয়েতকং-এর দেখা পেয়েও তাকে ধরিয়ে না দেবার অপরাধে সে বেচারির ভাগ্যে গ্রেপ্তার অথবা হত্যা যে কোনোটাই ঘটতে পারে। আজকাল আবার সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সরাসরি মেরে ফেলা হয়। আগে তাদের উপর অত্যাচার করা হত ; তারপর কিছুদিনের জন্য পাঠানো হত হাজতে বর্তমানে, অত্যাচার চালিয়ে যতটুকু সংবাদ তার কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া যায়, তাই নিয়ে, তারপর তাকে হত্যা করা হয়। এই হল আজকের দিনের একমাত্র নিয়ম। শত্রুর মানসিক অবস্থা, ভয় এবং দুর্বলতা যে কতখানি, তা এতেই বোঝা যায়।”

ত্রান দিন মিন সম্ভবতঃ মনে করেন যে, প্রথম বৎসরে তিনি তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যে নিজের দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ডাক-লাক-এর প্রায় ৯০ ভাগ এলাকা এবং জনসংখ্যার ৭০ ভাগ থেকে ৮০ ভাগ অংশকে বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত করছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। তা ছাড়া মুক্তিফৌজের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বান থি থুয়োটেরই চারিপাশে। এবং সব দেখে-শুনে একথা মানতেই হবে যে, এ সবের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অর্থাৎ ‘জনতার হৃদয়ে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা’র ব্যাপারে সফলকাম হয়েছেন মিন।

জারাই বিদ্রোহ

বি. এম. থুয়োট ছাড়া, পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতীয়দের অন্যতম সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হল জিয়া-লাই প্রদেশের প্লেইকু শহর : এবং জিয়া-লাই নামেরই আরেকটি প্রদেশের বানটান নামক স্থান। আমি

যতদূর জানতে পেরেছি, তে-হুয়েন-এ প্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে জিয়া-লাই প্রদেশের জারাই উপজাতীয়দের ভিতরে, ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে। এই বিদ্রোহের বিষয় আমি শুনলাম রাচেম হ'বান নামক জনৈক জারাই রমণীর কাছে। ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল ১৭ বৎসর।

মহিলাটিকে দেখলে বরং অসুস্থ বলেই বোধ হয়। ফ্যাকাশে গোল মুখখানার দুই পাশে কান দুটোতে বড় বড় ছিদ্র। আগে সেগুলোতে ছিল কর্ণাভরণ। পরনে হাতে-বোনা কাপড়ের হাঁটু ঝুলের ঘাগরা। নিচের দিকটা ছয় ইঞ্চি চওড়া লাল ও সাদা রংয়ের সুঁচের কাজ করা। লি থান জেলার সাঙ সো গ্রামে তাঁর জন্ম। বর্তমানে সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাঁর নাম সুপরিচিত।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন, "আমাদের গ্রামে নতুন একজন অঞ্চল-প্রধান নিযুক্ত করতে এসেছিল দিয়েমীরা; আর তাই থেকেই শুরু হল গণ্ডগোল। ওদের মতলব ছিল আশেপাশের গ্রাম-গুলোকে আমাদের অঞ্চলের সংগে জুড়ে দিয়ে, সমস্ত অঞ্চলটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলবে; আর আমাদের গ্রামটাকে করবে 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-এর কেন্দ্র। আগে থেকেই আমরা এ ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছিলাম। দিয়েমীরা তখন শুরু করল সন্ত্রাসমূলক অভিযান; কেবলমাত্র আমাদের বিরুদ্ধেই নয়, আমাদের জেলার সমস্ত জারাইদের বিরুদ্ধে। প্রথমে তারা হঠাৎ একদিন এসে আমাদের চারজন যুবককে ধরে নিয়ে গেল। একজনকে হত্যা করল তারা। একজনকে হাজতে আটকালো। অপর দুই জনকে ছেড়ে দিল কি জানি কি কারণে। কিন্তু ওই দুই জনের উপরে এমন প্রচণ্ড অত্যাচার করা হয়েছিল যে, ফিরে আসবার পর ওদের আর চেনবারই জো ছিল না। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে সেই রাতেই সবাই 'রুঙ'-এ (সর্বসাধারণের মিলনের স্থান) মিলিত হলাম। জীবন আমাদের অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। জারাইদের উপর অকথ্য অত্যাচারের সংবাদ একের-পর-এক আসছিল অন্যান্য সমস্ত গ্রাম

থেকে। নির্বিচার হত্যা, বলাৎকার, ঘর-বাড়ি পোড়ানো, শুয়োর-মোষ চুরি। আলোচনার পর স্থির হল, বাঁচতে হলে পালটা আঘাত হানতে হবে।"

দুই দিন পর, ১১ জন দিয়েমী সৈনিক গভীর রাতে এসে উপস্থিত হল সেই গ্রামে। এসেই আদেশ দিল যাতে কেউ গ্রাম ছেড়ে না যায়। তার পর বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছুরি, গুলতি সমস্ত আটক করে, সমস্ত যুবকদের তাদের সামনে হাজির হতে হুকুম করল। সবাই হাজির হল আদেশ মতো। দিয়েমীরা তাদের ভিতর থেকে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে বেঁধে ফেলল। সবাই প্রাণপণ বাধা দিল; অনেকক্ষণ ধরে। সারা গ্রামের লোক বেরিয়ে এসে ওই সৈনিকদের ঘিরে ফেলল। কারো হাতেই কোনো রকম অস্ত্রশস্ত্র ছিল না।

সৈন্যদলের সর্দারটি ছিল একটি জানোয়ার বিশেষ। বন্দী যুবকদের একজনের পায়ে হঠাৎ গুলি করে বসল। আহত যুবকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল; পা বেয়ে পড়তে লাগল রক্তের ধারা। এবং তাই দেখেই সকলে হয়ে উঠল মারমুখি। জারাই ভাষায় রাছেম কিছু একটা আদেশ দিতেই, জ্বলন্ত কাঠ হাতে নিয়ে মেয়েরা হঠাৎ লাফিয়ে পড়ল সৈন্যদের উপর। রাছেম এবং আরো দুটি মেয়ে এগিয়ে গেল সর্দারটির দিকে। প্রথম আঘাতেই সর্দারের হাত থেকে খসে পড়ল তার অটোমেটিক রাইফেল। প..ক্ষণেই তিন জনে তার গলা টিপে ধরল। মুগুরের আঘাতে ৫ জন সৈনিক আগেই মারা পড়েছিল। ব্যাপার বেগতিক দেখে, বাকিরা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করল। জারাইদের হাতে এবার এলো ৫টি কারবাইন, ১টি হালকা মেশিনগান, ১টি পিস্তল এবং একগাদা কারতুজ।

দুপুরের আগেই গ্রামের সবাই গিয়ে আত্মগোপন করল জংগলের ভিতরে। সংগে নিয়ে গেল চাল, কাপড়, রান্নার বাসন-পত্র; এমন কি শুয়োর মুরগি পর্যন্ত। নিতে পারল না কেবল গরু-মোষগুলোকে। খানিক পরেই শ'দুয়েকের মতো শত্রু সৈন্য এসে হাজির হল সেই গ্রামে। সম্পূর্ণ গ্রামটাকে তারা আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিল।

গরু-মোষগুলোকে হত্যা করল। সংগে তারা এনেছিল বড় বড় কামান। জংগল লক্ষ্য করে সেই কামানও দাগা হল; কিন্তু একজনও আহত হল না। দিন দশেকের ভিতরেই জারাইরা আরেকটি নতুন গ্রামের পত্তন করে ফেলল।

নতুন বসতিতে এসে প্রথমেই তারা নজর দিল নিরাপত্তার দিকে। প্রায় ১৮ মাস আগে কোয়াঙনাই'য়ের 'কর' ও 'হ্রী' উপজাতীয় গোষ্ঠী যেমন দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল, 'জারাই'রাও তেমনি তা.দর নতুন বসতিটি স্থাপন করে ছিল দুর্গম অঞ্চলে। কিন্তু দিয়েমীরা নতুন বসতির কথা জানতে পারবেই। সুতরাং যুবকেরা সবাই মিলে একটি 'আত্মরক্ষী' দল গঠন করে লেগে পড়ল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায়। অস্ত্র বলতে ছিল তাদের একমাত্র আড়ধনু। কিন্তু খাদ খনন করে সেগুলোর ভিতরে বর্শা বসিয়ে এবং গ্রামের সমস্ত প্রবেশ-পথে নানা ধরনের ফাঁদ পেতে এলাকাটিকে তারা সুরক্ষিত করে তুলল। বয়োবৃদ্ধদের কাজ হল কেবল মাত্র ফাঁদের সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করা। অবসর সময় সবাই বর্শাগুলোকে ধারালো করতে লেগে পড়ল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে গ্রামের সমস্ত প্রবেশ পথে পাতা হল অসংখ্য ফাঁদ। বসতিটি ছিল খুবই ছোট; মাত্র ৪৫ ঘর। মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩০০। কিন্তু দিয়েমীরা কোনো দিন তাদের বশীভূত করতে পারে নি। বিষাক্ত তীরের আঘাতে কিংবা ওই সমস্ত ফাঁদে পড়ে আক্রমণকারীদের বহু লোক হতাহত হয়েছে। ফলে, দিয়েমীদের উৎসাহ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি ঘটে, তা হল এই ঘটনার অনুপ্রেরণায় লি থান ও তৎপার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে জারাই খণ্ডজাতির মধ্যে সর্বাত্মক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এর দ্বারা আরেকবার প্রমাণিত হয় যে, কোনো অঞ্চলে উৎপীড়ন অত্যাচারের তীব্রতা বিশেষ এক মাত্রায় পৌঁছে গেলে, সেখানে বিদ্রোহের সর্বগ্রাসী আগুন জ্বালাবার জন্য প্রয়োজন হয় একটিমাত্র স্ফুলিংগের।

পূর্বে যেগুলো ছিল দিয়েমী নিয়ন্ত্রিত 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'

সেগুলো রাছেম হ'বান'-এর গ্রামের মতো ধীরে ধীরে 'প্রতিরোধ' বসতিতে পরিণত হয়ে যায়। রাছেম বর্তমানে হলেন জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের লিথান জেলা কমিটির একজন সদস্য ; এবং জারাই খণ্ডজাতির তথা সম্পূর্ণ মুক্তি-সংগ্রামের একজন নেতৃস্থানীয় মহিলা। কারণ, সামান্য একটি প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে তিনি এত বড় এক বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিলেন।

'স্বয়ং পরিচালনা'

অন্য আরেক ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় মহিলা হলেন বাহনার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছি (ভগিনী) কিন। চওড়া নাক, ঘাড়ের কাছ থেকে চুলগুলো ছাঁটা, কোমল মুখশ্রী, স্পষ্টবাদী এই মহিলার মুখের অকৃত্রিম হাসি তাঁর গম্ভীর মুখখানাতে এক কমনীয় ভাব এনে দিয়েছে। মুক্তিফ্রন্টের মহিলা সমিতির জিয়া লাই প্রাদেশিক কমিটির তিনি সভানেত্রী। জিয়া লাই প্রদেশের প্রধান সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হল বাহনার এবং জারাই। সামান্যতম শিক্ষা, সহযোগিতা এবং নির্দেশ একবার পেলে, উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা যে কত দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে, তার জীবন্ত উদাহরণ হলেন ছি কিন। তাঁর প্রশ্নোত্তরের ভংগী এবং স্পষ্ট বিবৃতি, বিশ্বে যে-কোনো দেশের যে কোনো কমিটির সুদক্ষ মহিলা সদস্যের মতো। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি ছিলেন নিরক্ষর একজন খণ্ডজাতীয় তরুণী। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর সীমাবদ্ধ ছিল আদিম ধরনের চাষ-বাসের কাজের মধ্যে।

শুনেছিলাম, মাত্র ২৪ বৎসর বয়স হলেও, ছি কিন হলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সংগঠক এবং স্বীয় খণ্ড জাতি তথা ওই অঞ্চল সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। মুক্তিফ্রন্ট নিয়ন্ত্রিত খণ্ডজাতি অধ্যুষিত এলাকায় প্রকৃতপক্ষে কি ভাবে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়, সে সম্বন্ধে কিন-এর নিজস্ব বক্তব্য শোনবার আগ্রহ আমার ছিল। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন, ১৯৪৫ সালের আগে ভিয়েতমিনরা

যখন জাপানীদের কাছ থেকে শাসনক্ষমতা দখল করে নেয়, সেই সময় তেহুয়েন-এর আলোচ্য এলাকায় প্রকৃত পক্ষে চলছিল দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা। 'একটি ছিল ফরাসীদের দ্বারা নিযুক্ত; অপরটি ছিল জনগণের দ্বারা গোপনে নির্বাচিত।' শহরাঞ্চলের কাছাকাছি এলাকায় প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিল ফরাসীদের নিযুক্ত ব্যক্তিরা; এবং দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে ছিল জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ।

১৯৫৪ সালের যুদ্ধ-বিরতির সময় জিয়া লাই-এর অধিকাংশ এলাকা ছিল ভিয়েতমিনদের দখলে। দিয়েমী শাসন কায়েম হবার পর প্রশাসনে নিযুক্ত নির্বাচিত ব্যক্তিদের খতম করবার অভিযান যথারীতি শুরু হয়। সেই সংগে প্রাক্তন প্রতিরোধ সংগ্রামের কর্মীদেরও। অত্যাচারের মাত্রা বিশেষভাবে তীব্র করা হয় সংখ্যালঘু 'বর্বর'দের ক্ষেত্রে। এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু দেখা গেল প্রতিরোধ সংগ্রাম ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করেছে শত্রুর নিজেরই প্রতিষ্ঠান-গুলোতে; বদলে দিয়েছে তাদের চরিত্র; এবং আক্রমণ করতে আরম্ভ করেছে ভিতর থেকেই, শত্রুর একেবারে নাকের ডগায় বসে। এবং, শত্রুপক্ষ ভালো করে ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই, সব-কিছু তাদের হাতের মুঠো থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল। এই অঞ্চলে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় কেবলমাত্র প্রাদেশিক পর্যায়ে, ১৯৬১ সালেব ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই দিয়েমী শাসন সংকুচিত হতে হতে এসে ঠেকে প্রাদেশিক রাজধানী প্লেকুই এবং ১৪ ও ১৯ নং—এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি সামরিক সড়ক বরাবর গুটিকয়েক 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-এ। ১৯৬২ সালের শেষ নাগাদ বিরাট এই প্রদেশের অবশিষ্ট অংশ এবং জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ চলে আসে মুক্তিফ্রণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে। এই সময়ের ঘটনাবলীই ছি কিন আমার কাছে বলছিলেন।

গ্রামাঞ্চলের প্রশাসন প্রকৃতপক্ষে কি ভাবে চালানো হয় এইটাই ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন। শুনেছিলাম, ছি কিন-এর মা হলেন তাঁর

গ্রামের 'স্বয়ং পরিচালনা' কমিটির সভানেত্রী। এ সম্বন্ধেও আমার মনে কৌতূহল ছিল।

আমার প্রশ্নের জবাবে ছি কিন বললেন, "হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। আমার মা হলেন অতি সাধারণ, সাদাসিধে একজন উপজাতীয় নারী। একমাত্র রান্না বান্না এবং গরু মোষের পরিচর্যা ছাড়া আর কিছুই তিনি আগে জানতেন না। কিন্তু আজ তিনি গ্রামের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করেন; এবং সমস্ত মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন। শুধু তাই নয়, মুক্তিফ্রন্টের মহিলা সমিতির স্থানীয় শাখার সহ-সভানেত্রীর কাজও তাঁকে পরিচালনা করতে হয়। বর্তমানে পুরুষেরা সবাই প্রধানতঃ সামরিক কার্য কলাপের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাই নারীরা দায়িত্ব নিয়েছে উৎপাদন অব্যাহত রাখা তথা গ্রাম্য প্রশাসনের অধিকাংশ শাখার কাজকর্ম চালাবার। আমার মায়ের কর্ম-শক্তি খুব বেশী, কাজের প্রতি তাঁর আগ্রহ জনসাধারণ পছন্দ করে। তাই তারা তাঁকে নির্বাচিত করেছে। কোনো গ্রামকে মুক্ত করবার পর দিয়েমী দালালদের উৎখাত করবার সংগে সংগে যুবক, নারী, কৃষক এবং অন্যান্যদের সমস্ত গুপ্ত সংগঠন প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে। 'স্বয়ং পরিচালনা' কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবার উদ্যোগ তারাই গ্রহণ করে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে সবাই। এবং এরাই আত্মরক্ষা, সাধারণ নিরাপত্তা, জন-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি, কৃষি উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদির জন্য কর্মিদল নিযুক্ত করে। এই সমস্ত কর্মিদলের কার্যকলাপ পরিচালনা তথা সমন্বয়ের কাজ করে এই 'স্বয়ং পরিচালনা' কমিটি।"

আমার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে। কারণ, কয়েকদিন আগেই মনঙ দের এক গ্রামে একটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছিলাম। বিদ্যালয়ের গৃহ বলতে তিন দিকে মুলী বাঁশের বেড়া ও উপরে চালা দেওয়া একটি ঘর সামনের দিকটি খোলা এবং সেখানে টাঙানো ছিল একটি ব্ল্যাকবোর্ড। অল্প বয়স্ক জনৈক তরুণী পড়াচ্ছিলেন। চকের বদলে একটুকরো শুকনো ম্যানিওক দিয়ে

অতি পরিশ্রম সহকারে ব্লাকবোর্ডে তিনি কিছু লিখছিলেন। আর নগ্নপদ, গোল মুখ ছাত্র-ছাত্রীরা কাঠের বেঞ্চিতে সার-সার বসে, বাঁশের সূচালো কলম ও কাঠকয়লার গুঁড়ো জলে গুলে তৈরী করা কালি দিয়ে সেইগুলোকে দেখে দেখে লিখছিল আর ম নঙ ভাষার অক্ষর পরিচয় করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। পাঠ্যপুস্তকাদি কারা সরবরাহ করে এবং পাঠ্যক্রম কোনো সাধারণ নীতি অনুসারে চলে কি না, আমার এই প্রশ্নের জবাবে শিক্ষিকা যা বলেছিলেন, তাতে কিছুই স্পষ্ট হয় নি।

আমার সেই প্রশ্নেরই বিশদ জবাব দিলেন ছি কিন। জানালেন পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষানীতি তথা কর্মসূচীর বিষয়টি তাঁদের প্রদেশে এখনো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। মুখ্য প্রচেষ্টা চলছে বয়স্ক ব্যক্তিদের সান্ধ্যকালীন ক্লাশে বাহনার ও জারাই অক্ষরে লিখতে ও পড়তে শেখানোর, এবং দিবাভাগের ক্লাশে ছয় থেকে উনিশ বছর পর্যন্ত বয়সের বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবার। সেই প্রসংগে বললেন, "উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবার মতো সুযোগ-সুবিধা বর্তমানে আমাদের নেই; এবং সে রকম শিক্ষা গ্রহণ করবার মতো ছাত্র-ছাত্রীরও অভাব। ভুলবেন না, মাত্র বছর দুয়েক আগে সবে আমরা যখন আরম্ভ করি, তখন প্রায় সবাই ছিল নিরক্ষর। তবে শিক্ষকদের জন্য প্রাদেশিক পর্যায়ে আমাদের একটি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় রয়েছে।"

এই বিষয়ে তিনি আরো জানালেন যে, উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তকাদি সরবরাহ করে থাকে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রাদেশিক শিক্ষা কমিটি। এই কমিটি স্বয়ং-শাসিত কি না, এবং সারা প্রদেশের জন্য তারা কোনো সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে কি না, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে ছি কিন জানালেন, জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কেন্দ্রীয় তথা শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটির, শিক্ষা-বিষয়ক সাব-কমিটি নামে একটি দপ্তর রয়েছে। এই সাব কমিটিই তে দুয়েন অঞ্চলের জন্য একটি কর্মসূচী অনুসারে, এবং বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠার জন্য সেই

কর্মসূচীর কিছু অদল-বদল করে কার্য পরিচালনা করে। ফ্রন্ট-নিয়ন্ত্রিত সমস্ত অঞ্চলের জন্য সার্বিক একটি শিক্ষা-নীতির দায়িত্বও রয়েছে উক্ত কমিটির উপর। তবে, তে হুয়েন-এর জন্য ইবি আলেং-এর স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনের সংগে সামঞ্জস্য রেখে, তে হুয়েন-এর ক্ষেত্রে এই নীতিরও কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

বুনিয়াদি পাঠ্যপুস্তকগুলো মুদ্রণ করে কেন্দ্রীয় সংস্থা; আর প্রাদেশিক কমিটিগুলো তার মুদ্রিত প্রতিলিপি যথাসাধ্য সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া, তারা সংযোজিত বিষয়বস্তুও হস্তলিখিত আকারে অথবা টাইপ করে সরবরাহ করে। এই প্রসঙ্গে ছি কিন জানালেন, "আমাদের কোনো কোনো অঞ্চলে কাগজের সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। তাই বড় বড় বাঁশের ছাল শুকিয়ে কাগজের বদলে আমাদের ব্যবহার করতে হয়।"

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক দলগুলোও অনুরূপ ভাবেই কাজ করে। এই বিষয়ে সার্বিক নীতি নির্ধারণ করে জন-স্বাস্থ্য বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সেই নীতি অনুসারে নির্দেশ যায় প্রাদেশিক এবং জেলা স্বাস্থ্য কমিটির মারফত। "কিন্তু এমন অনেক সংস্থা রয়েছে যেগুলোকে চালায় জনসাধারণ নিজেরাই," অসাধারণ এই উপজাতীয় তরুণী বলে যান, "শিক্ষাসূচী সংগঠিত করবার ব্যাপারে উপর তলার নির্দেশের অপেক্ষা আমাদের করতে হয় না। সামান্য অক্ষর পরিচয়ও যার আছে, সেই শুরু করতে পারে একেবারে নিরক্ষরদের শিক্ষা দেবার কাজ। ঠিক সেই ভাবেই তারা নিজেরা শিক্ষা লাভ করতে পারে তাদের চাইতে অধিক যে জানে তার কাছে। এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণা, যেমন বাড়ি-ঘর এবং জামা কাপড় পরিষ্কার রাখা, পানীয় জল ফুটিয়ে ব্যবহার করা, শৌচস্থান বাড়ির পিছন দিকে করা ইত্যাদি যার রয়েছে, সেও জেলা অথবা প্রাদেশিক স্বাস্থ্য কমিটির নির্দেশের অপেক্ষা না করেই, এ সম্বন্ধে কিছু কিছু কাজ শুরু করে দিতে পারে। পরে, ব্যাপারটি একটু গুছিয়ে নেবার পর প্রতি গ্রাম থেকে দু-একজন করে ব্যক্তিকে জন-স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে

প্রশিক্ষণের জন্য জেলা ও প্রাদেশিক কেন্দ্রে পাঠানো হয়। জন-নিরাপত্তা, আত্মরক্ষা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। এগুলো হল এমন জিনিস, যা, আপনা থেকেই কাজ করে যায়। এবং এই কারণেই আমাদের কমিটিগুলোকে 'স্বয়ং পরিচালনা' কমিটি বলা হয়। দূরবর্তী গ্রাম থেকে পদব্রজে অথবা ঘোড়ায় চড়ে জেলা কেন্দ্রে যেতে যে সময় লাগে, তাতে অন্য কোনো উপায়ে এই সমস্ত কাজকর্ম চালাবার চেষ্টা করা হবে বোকামি।"

একটু মিষ্টি হেসে আবার বললেন, "সব কটা শহর ও সড়ক আমাদের দখলে এসে গেলে অন্য ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। যেমন ধরুন—জন-স্বাস্থ্য, আর্থিক বিষয়, কৃষি উৎপাদন তথা ক্রয়-বিক্রয়ের পরিকল্পনা, শিশু-মঙ্গল এবং কেবলমাত্র মহিলাদের ব্যাপারে আমাদের মহিলা সমিতিগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। এ সমস্ত আমাদেরই করতে হয়; কারণ সামরিক ব্যাপারে প্রায়ই পুরুষদের থাকতে হয় বাইরে।"

ছি কিন লেখা-পড়া শেখেন কৈশোরের শেষ ভাগে, এবং তাও নিজে-নিজে। আপন গ্রাম ছেড়ে প্রায়ই তাঁকে বাইরে থাকতে হয়। সব সময়েই ঘুরে বেড়াতে হয় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। সারা প্রদেশে মহিলা সমিতি গঠনের দায়িত্বও হল তাঁর; এমনকি প্রাচীর-বেষ্টিত 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'গুলোর ভিতরেও। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁকে যেতে হয় সেখানে। আমি যখন তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করি সে সময় তিনি মুক্তিফ্রণ্টের মহিলা সমিতির স্থায়ী কমিটির প্রাদেশিক পর্যায়ে নির্বাচন সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে একটি প্রচার কমিটির সভা-নেত্রীরূপে পদব্রজে গ্রামাঞ্চলে সফর করছিলেন। সে কথা উল্লেখ করে বললেন, "বর্তমানে আমাদের সমিতি কেবলমাত্র প্রাদেশিক কমিটিরূপেই রয়েছে। কিন্তু জেলা পর্যায় অবধি সমস্ত কমিটিই সংগঠিত হয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে।"

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

কনটাম প্রদেশের ১২টি সংখ্যালঘু উপজাতীয় গোষ্ঠীর অন্যতম হল 'জেহ' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়; এবং এই গোষ্ঠীর আর একজন অনন্যসাধারণ তরুণী হলেন চি বার। এই বিশিষ্ট মহিলা একাধারে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কনটাম প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য, মুক্তিফ্রন্ট মহিলা সমিতির প্রাদেশিক কমিটির সভানেত্রী এবং তে মুয়েন স্বায়ত্ত-শাসন আন্দোলনের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যরূপে কার্য পরিচালনা করছেন। শেষোক্ত সংস্থাটি তে মুয়েন অঞ্চলের জন্য স্ব-শাসিত প্রশাসনের কিছু কিছু কাজকর্ম ইতিমধ্যেই করতে শুরু করেছে। কারণ, মুক্তিফ্রন্ট আগেই তে মুয়েন অঞ্চলে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিল। কনটাম অঞ্চলে মুক্তি সংগ্রাম সম্বন্ধে চি বার যা কিছু বললেন, তার অধিকাংশই পূর্বে উল্লিখিত ঘটনাগুলোর মতোই। তাঁর সংগে যে সময় আমার সাক্ষাৎ হয়, সেই সময় কনটাম প্রদেশের মোট ৬টি জেলার ভিতরে ৫টিই চলে এসেছিল ফ্রন্টের দখলে। সায়গনের নিয়ন্ত্রণ সংকুচিত হতে হতে এসে ঠেকেছিল মাত্র কনটাম শহর এবং ১৩ ও ৫ নম্বর সড়কে। ৫ নং সড়কটি লাওসের এট্টোপেউ'র সংগে কনটামকে যুক্ত করেছে।

তরুণী চি বার। শক্ত সমর্থ দেহ, গম্ভীর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। আপন গোষ্ঠীর ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান প্রচুর। শুরুতেই তিনি কনটাম-এর 'জেহ' এবং 'কোয়াংনাম'এর সীমান্তে বসবাসকারী 'ক'তুন উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৬০ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের ইতিহাস প্রসংগে বললেন, "১৯৫২ সাল অবধি এই সামন্ততান্ত্রিক ধরনের লড়াই চলতে থাকে। প্রতিশোধ নেবার ঘটনাগুলোকে মনে রাখার জন্য কোন লতায় গিঁট দিয়ে রাখাটা ছিল আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত একটি প্রথা। ভিয়েতমিন কর্মীরা এসে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর

মধ্যে সংহতিমূলক সভার অনুষ্ঠান শুরু করবার পরই আমরা বুঝলাম, এই ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহে লাভবান হয় কেবল মাত্র ঔপনিবেশিকরাই। তারপর থেকে ওই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে গেল। এর আগে পর্যন্ত প্রতি বৎসর হাজার হাজার উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোক নিজেদের মধ্যে অকারণ লড়াই করে মারা পড়ত।"

কনটামের অধিকাংশ অঞ্চলেই দিয়েমী শাসকগোষ্ঠী কোনো দিনই নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারে নি বলে মনে হয়। বস্তুতঃ, ওই সমস্ত অঞ্চলের জীবন-যাত্রা প্রাক্তন প্রতিরোধ প্রশাসনের অধীনে এমনভাবে চলতে থাকে যেন, সায়গনের দিয়েমী শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব কোন কালেই ছিল না। এই প্রসংগে চি বার বললেন, "যেমন ধরুন, কনটাম শহরের উত্তরে আমার গ্রাম নঙ কন-এ আমরা উত্তর ভিয়েত-নামের অনুকরনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। 'কাকা হো'কে সবাই গভীর শ্রদ্ধা করে। হ্যানয় বেতারে যখন সেখানকার কর্মযজ্ঞের কথা শুনলাম, তখনই আমরা সবাই, বিশেষ করে নবীনেরা স্থির করলাম, আমাদের এখানেও তাই করতে হবে।" অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা একটা বাস্তব সত্য যে, দিয়েমী সৈন্য ও পুলিশ যন্ত্র যে সময় দেশের অবশিষ্ট অংশে প্রচণ্ড পীড়ন চালাচ্ছে, সেই সময় সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতির এক বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল দেশের সব চাইতে অনগ্রসর একটি অঞ্চলে। সর্বদং উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর অন্যতম সেদাঙ সম্প্রদায় মাত্র এক পুরুষ আগে সে সময় প্রস্তর যুগের সমাজব্যবস্থা ছাড়িয়ে এসেছে।

"কৃষিকার্যের জন্য শ্রমশক্তি আমাদের ছিল মাত্র ১৫০ জন লোক। জীবন-যাত্রার মানও ছিল খুবই নিচু। মোট কথা, বছরের মাত্র চার মাসের মতো খোরাকী ধান আমরা উৎপন্ন করতাম নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে। বছরের বাকী দিনগুলো জংগলের মধ্যে মাটি খুঁড়ে গাছের মূল ও পাতা যোগাড় করতাম। তাই, ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠা করলাম একটি সমবায় সমিতি। সমস্ত কৃষিজমি গ্রামের সাধারণ সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হল। নির্বাচিত একটি

পরিচালনা কমিটির উপর দায়িত্ব দেওয়া হল কৃষিকার্যের। উৎপন্ন ফসল শ্রমশক্তির মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেবার ব্যবস্থা হল। প্রথম বছরে সব কিছু চলল বেশ ভালভাবে। কৃষিকার্যে যথেষ্ট মনোযোগ দেবার ফলে উৎপাদন হল বিগত অন্যান্য বছরের চাইতে অনেক বেশী। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে উৎপাদন ভাল হল না। কারণ সেই শ্রমশক্তিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার মতো কেউ ছিল না আমাদের মধ্যে। তার উপর আবহাওয়াও বাদ সাধলো ফলে, সে বৎসরে ফসল হল সত্যিই খারাপ।

"বয়োবৃদ্ধেরা পুরনো প্রচলিত কৃষি-প্রথায় ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু বাধা এল নবীনদের কাছ থেকে। ফলে, পারিবারিক কলহ ও তর্কাতর্কি হল অনেক। আমরা নবীনেরা তখন একটি সভা করে সেখানে আমাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমান জীবনের তুলনামূলক সমালোচনা করলাম। ফসল খারাপ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু একথাও সত্যি যে আমাদের জীবন যাপন এখন হয়ে পড়েছিল অনেক ভাল; পূর্বের চাইতে অনেক বেশী সচ্ছন্দ এবং আনন্দময়। সবাই মিলে এক সঙ্গে কাজ করার মধ্যে বেশ একটা আনন্দের আস্বাদ তো ছিলই; তার উপর একে অন্যের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম সবাই। অবশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, পরিচালনা ব্যবস্থার ত্রুটির কারণেই ফসল খারাপ হয়েছে সুতরাং, মোট শ্রমশক্তিকে ৫০ জন হিসাবে পাঁচটি দলে বিভক্ত করা সাব্যস্ত হল। স্থির হল, প্রতিটি দল নিজের নিজের দলপতি নিবাচিত করবে, এবং নির্বাচিত ওই পাঁচজন দলপতিই সম্পূর্ণ সমবায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিরূপে কাজ করবে। গুরুজনেরা অবশ্য এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। একই কথা তাঁরা বারংবার বললেন। পূর্বেকার প্রথাই ছিল ভাল। আমরা কিন্তু তৎসত্ত্বেও দলগতভাবে কাজ করবার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম। বৃদ্ধেরা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন। আমাদের নীতিবাণী হল, 'দ্রুত কাজ কর, কঠিন পরিশ্রম কর, মিতব্যয়ী হয়ে কাজ কর।' উৎপন্ন 'ফসলের কি পরিমাণ

সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং কি পরিমাণ বাজারে বিক্রি করা হবে তা নির্ণয় করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও কায়েম করা হল। এই সমস্তর ফলে, ১৯৫৬ সালে প্রচুর শস্য উৎপাদন হল। এবং উৎপাদনের এই হার বজায় রইল ১৯৬১ সাল অবধি। এই সময়ের ভিতরে, কোনো বৎসরেই ফসল উৎপাদন খারাপ হয় নি। এবং এই সমস্ত দেখে-শুনে, বয়োবৃদ্ধেরা ততদিনে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"১৯৬১ সালে ফসল হল সর্বাধিক। সেই বৎসরেই আমরা নবীনেরা চিন্তা করলাম, উৎপন্ন ফসল ভাগাভাগির ঝঞ্ঝাট করে লাভ কি? পরিশ্রম যখন সবাই একসংগে করছি, তখন উৎপন্ন ফসলই বা একসংগে ভোগ করি না কেন? সুতরাং সমস্ত ফসল নিয়ে গিয়ে জমা করা হল বিরাট এজমালী শস্যভাণ্ডারে। শিশুরা সহ আমাদের মোট লোকসংখ্যা ছিল ৩৫০ জন। প্রতিটি পরিবার এবং শস্যক্ষেতগুলোকে যে ভাবে ভাগ করা হয়েছিল, সেই অনুসারে ৬০, ১২০ এবং ১৫০ জনের মতো তিনটি বিরাট রন্ধনশালাও স্থাপন করা হল। পাঁচটি কর্মীদলকে ভেঙে করা হল তিনটি। প্রত্যেক দলের সংগে দেওয়া হল একটি করে রন্ধনশালা ও ভোজনালয়। সেই ব্যবস্থাই আজ অবধি চলে আসছে চমৎকারভাবে। সারা গ্রাম একটি; বরং বলতে গেলে তিনটি পরিবারের মতো হয়ে গেছে। ফসল উৎপাদন বেড়ে চলেছে প্রতি বৎসর। কেবলমাত্র বিগত ফসল একটু খারাপ হয়েছে খরার কারণে। তবুও ফ্রন্টকে আমরা ৮৪৮ কে. জি. চাল সাহায্য হিসাবে দিতে পারব। চালের সংগে ম্যানিওক মিশিয়ে অবশ্য খেতে হবে; কিন্তু তবু, বৃদ্ধদের আমলে সব চাইতে ভাল ফসল যে বৎসর হয়েছে, তার চাইতে বিগত ফসল হয়েছে অনেক ভাল। সারা বৎসরের খাদ্যের সংস্থান সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত। আমাদের নবীনেরা কামারের কাজ শিখে নিয়েছে। চাষ-বাসের জন্য প্রয়োজনীয় লোহার যন্ত্রপাতি এখন তারাই তৈরী করে।"

খণ্ডজাতিদের মধ্যে লবণের মতো, লোহা, ইস্পাত এবং চাষের

যন্ত্রপাতির অভাব যে কত বড় সমস্যা, তা আমার জানা ছিল। তাই প্রশ্ন করলাম, "চাষের যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য কাঁচামাল আসে কোথা থেকে ?"

চি বার জবাব দিলেন, "গ্রামের নিজস্ব গেরিলা বাহিনী রয়েছে। ট্রাক ইত্যাদি আক্রমণ করলে অথবা কোনো সেতু বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিলে, যতখানি সম্ভব লোহা ও ইস্পাত তারাই নিয়ে আসে। যেমন ধরুন, ৫নং সড়কটিকে অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ৫নং সড়কের সেতুগুলো থেকে অনেক লোহা পাওয়া যায়। পুলের রেলিংগুলো দিয়ে খুব ভাল লাঙলের ফলা হয়। যে সমস্ত জিনিস আমাদের কাজে লাগে না, সেগুলোকে আমরা দূরবর্তী পাহাড়ী গ্রামগুলোতে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে দিই।"

একটু থেমে আবার বললেন, "আমাদের নঙকন সমবায়িকার অনুকরণে আরো বহু সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানটির মতো এত সুসংগঠিত সমবায়িকার সংখ্যা কম হলেও, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে; এমন কি আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে কোয়াঙনাম-এও।"

লক্ষ্য করলাম, কথা প্রসংগে প্রতিবারই চি বার 'আমরা' কথাটি ব্যবহার করছেন। অথচ 'আমি' কথাটি তিনি অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারতেন। কারণ আমি জানি, শেষের দিকে এই আন্দোলনকে নঙকন গ্রাম ছাড়িয়ে দূর-দূরান্ত অঞ্চলে ছড়িতে দিতে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে—এক কথায়, যা কিছু নতুন তথা প্রগতিশীল, সে সবের পশ্চাতে তিনিই ছিলেন প্রধান অনুপ্রেরণা। এই কারণেই ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিনি এত সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত। এবং একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায়, অদূর ভবিষ্যতে খণ্ডজাতীয় জনগণের অসাধারণ এক নেত্রীরূপে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর কথাতেই, 'বিপ্লবের সংস্পর্শে তিনি প্রথম আসেন সমবায় শিশুপালন প্রতিষ্ঠানে শিশুদের দেখাশোনার কাজের মাধ্যমে; লিখতে ও

পড়তে শেখেন নিজে নিজে; তারপর বয়স্থা মেয়েদের লেখা-পড়া শেখাবার ভার নেন, এবং এই ভাবে ক্রমে ক্রমে অধিকতর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

উঁচু খুঁটির উপরে তৈরী একটি কুঁড়ে ঘরের মেঝের উপরে বসে সেদিন গভীর রাত অবধি আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম। আর মেঝের নিচে শুয়োর ও মোষগুলো ঘোঁত-ঘোঁত, ফোস-ফোঁস করে বেড়াচ্ছিল। ঘরের ভিতরে জ্বলছিল অপরিশোধিত বনজ তেলের একটি কালি-পড়া বাতি। চি বার-এর সুন্দর, কমনীয় আনন; এবং চারপাশ ঘিরে উপবিষ্ট তাঁর কয়েকজন বন্ধুর মর্যাদাপূর্ণ, উজ্জ্বল, ইস্পাত-কঠিন অথচ সমবেদনায় সুষমামণ্ডিত মুখগুলো সেই ম্লান আলোয় জ্বল জ্বল করছিল। সেই মুখগুলো ছিল এমন সমস্ত মানুষের যারা পুরুষানুক্রমে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে এবং সেই দুর্দশার কারণ নিয়ে দিনের পর দিন চিন্তা করেছে। এই সমস্ত মুখ অধ্যয়ন করতে কখনো ক্লান্তি আসে না; কারণ সেখানে খোদিত রয়েছে অপরিহার্য সমস্ত সত্য, এমন সমস্ত মানবিক গুণাবলী, যেগুলোকে পাশ্চাত্য দেশে আমরা শুধু তত্ত্ব হিসাবেই মুল্যবান মনে করি, কিন্তু খণ্ডজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা সেগুলোকে এখনো শুদ্ধ, মৌলিক রূপে রক্ষা করে আসছে। নাপাম বোমা যখন তাদের পাকা শস্যক্ষেত জ্বালিয়ে দেয়, এবং তাদের নদীর মধ্যে বিমান থেকে যখন বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য নিক্ষেপ করা হয়, তখনই বর্বর তথা বর্বরতা সম্বন্ধে মানুষের সমস্ত ধ্যান-ধারণা পাল্টাতে শুরু করে।

জাতিগত গোষ্ঠী-নীতি

খণ্ডজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষের রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু জিনিস জানবার আছে। এবং, সায়গন শাসকগোষ্ঠীর চিন্তাধারা নিয়ে কেউ কখনো এই সমস্ত খণ্ডজাতীয়দের আস্থা অর্জন করতে পারবে কি না, অথবা, ভিয়েতনামী মুক্তি ক্যাডারেরা এদের জানবার তথা

বোঝবার জন্য যেমন সহৃদয়তাপূর্ণ ঐকান্তিকতা নিয়ে চেষ্টা করেছে, সে রকম চেষ্টা করবার ক্ষমতাও সায়গন মনোভাবাপন্ন কোনো মানুষের আছে কি না সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। আমার বিশ্বাস সায়গন শাসনতন্ত্রের কোনো লোক অথবা মার্কিন উপদেষ্টা, উভয়ের পক্ষেই এ কাজ করা অসম্ভব। তা করতে হলে, চিন্তাধারা তাদের আমূল পাল্টাতে হবে, এবং অন্য কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক মাপকাঠির আশ্রয় নিতে হবে। সামান্য কয়েকজন সর্দার শ্রেণীর মানুষকে ঝকমকে তুচ্ছ কিছু সামগ্রী অথবা পদাধিকারের শক্তি উপহার দিয়ে তাদের বশীভূত করবার কৌশলের উপর আমেরিকানরা ভরসা করে রয়েছে। কিন্তু, খণ্ডজাতির লোকেরা হল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কোন্‌টা মেকি, আর কোন্‌টা খাঁটি, এ সম্বন্ধে তাদের গভীর, সহজাত ধ্যান-ধারণা রয়েছে। যে সমস্ত ভিয়েতনামীদের তারা সর্বাধিক বিশ্বাস করে, তাদের কাছেও তারা একদিনে হৃদয় উন্মুক্ত করে নি। করেছে বছরের পর বছর ধরে একত্রে বসবাস তথা কাজ করবার পর:

১৯৪৫-৪৬ সালে হো চি মিন, যুব শ্রেণীর মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবককে তে ন্‌গুয়েন অঞ্চলে গিয়ে অবশিষ্ট জীবন সেখানেই অতিবাহিত করতে আহ্বান জানান। যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ত্রান দিন মিন এবং ন্‌গুয়েন হান্ ্‌ এর মতো মানুষ। এঁদের অনেকের সংগেই আমার সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হয়েছে। হো চি মিনের এই আহ্বান জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের পক্ষে বিরাট সুবিধাজনক হয়েছিল। এই সমস্ত স্বেচ্ছা-কর্মীরা শুধুমাত্র যে খণ্ডজাতীয় মানুষদের হৃদয় তথা চিন্তার গভীরে আসন করে নিয়ে ছিলেন তাই নয়, প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নাম এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্যাদিও সংগ্রহ করে তাঁরা নথিভুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তে ন্‌গুয়েন অঞ্চলে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রভাব বিস্তারের কাজে এই সমস্ত তথ্য প্রভূত সহায়ক হয়।

ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় খাস ভিয়েতনামী এবং

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সম্পর্কের এক নতুন যুগের সূচনা হল। কারণ, 'সেই প্রথম খণ্ডজাতির লোকেরা এমন ধরনের বহিরাগতদের সংস্পর্শে আসে, যারা ভিয়েতমিনদের পরিকল্পিত নীতি অনুসারে খণ্ডজাতীয় মানুষদের নিজেদের সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে। এর আগে পর্যন্ত সর্বদাই তাদের 'বর্বর' রূপে গণ্য করা হত। বস্তুতঃ এই সমস্ত খণ্ডজাতীয় মানুষদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীদের যে একটিমাত্র শব্দ আমি ব্যবহার করতে শুনেছিলাম, তা ছিল 'মোই'। আমার ধারণা ছিল, সাধারণভাবে সমস্ত খণ্ডজাতীয় লোকদের বোঝাতেই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পরে আবিষ্কার করেছিলাম যে, ভিয়েতনামী ভাষায় 'মোই' শব্দের অর্থ হল 'বর্বর'।

খাস ভিয়েতনামী হুয়েন হান চুঙ তাঁর জীবনের অধিকাংশই অতিবাহিত করেছেন খণ্ডজাতীয় লোকেদের মধ্যে। কথা প্রসংগে তিনি একদিন আমাকে বলেন, "সাধারণতঃ অদ্যাবধি আমরা খণ্ডজাতীয় মানুষদের রীতি-নীতির ভিতরে মাথা গলাই না। কিন্তু আমাদের জীবন-যাপনের ধারা দেখে ওরা নিজেরাই প্রভাবিত হয়ে পড়ে; ওদের মনে প্রশ্ন জাগে; অনেক কথা জানতে চায়। খুব বেশী ক্ষতিকারক রীতি-নীতিগুলো এই ভাবে ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ওদের জন্য আমাদের শ্লোগান হল, 'তল্পিবাহক বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী'; এবং এই ব্যাপারে ওরা আমাদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। আমাদের যদি ওরা ভ্রাতা বলে গ্রহণ করে থাকে তবে তার কারণ হল, বছরের পর বছর ধরে খণ্ডজাতিদের মধ্যে বাস করে আমরা ওদের রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদিকে বোঝবার এবং উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি; এবং কোন ক্রমেই সেগুলোকে অবমাননা করবার প্রয়াস নিই নি।

"একমাত্র যা করি তা হল, সুযোগ পেলেই বোঝাবার এবং দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করি কেন ওরা অসুখী এবং কেনই বা ওদের জীবন এত দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ। জবাবে, প্রথমে ওরা 'ভগবানের ইচ্ছা'র দোহাই দিত। কিন্তু একটু একটু করে আমরা ওদের দেখিয়ে

দিলাম যে ব্যাপারটি আসলে তা নয়। ওদের বক্তব্য হল 'ভগবান খণ্ডজাতীয় মানুষদের সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনিই নির্দেশ দিয়েছেন যে খণ্ডজাতীয় মানুষেরা কোনো দিন সুখী হবে না; চিরদিন তাদের দাসত্বই করতে হবে।' সুতরাং, ফসল তোলবার পরই উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্ত চাল খেয়ে ফেলা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে গরু-মোষগুলোকে বলি দেওয়া, ও তারপর সারা বছর অনাহারে থাকা হল ওদের কপালের লিখন। এ সম্বন্ধে ওদের যুক্তি হল 'এগুলো জমিয়ে রাখলে কর আদায়কারীদের পেটে যাবে। তার চাইতে খেয়ে ফেলাই ভাল। কারণ, ভগবান হয়ত তাতে সদয় হবেন।'

"আমরা বোঝাতাম যে, ভগবান নয়, ওদের দুঃখ-দুর্দশার আসল কারণ আগে ছিল ফরাসীরা, এবং বর্তমানে মার্কিন তল্পিবাহকেরা। ফরাসীরা কর আদায়ের মাধ্যমে ওদের পরিশ্রমের সমস্ত ফল আত্মসাৎ করত, অথবা মাসের পর মাস ধরে বেগার খাটাত। বর্তমানে মার্কিন-আজ্ঞাবাহীরা সেই একই কাজ করছে। কথাগুলো নিয়ে ওরা চিন্তা করত। তারপর আবার আসত কয়েক সপ্তাহ পরে। জিজ্ঞাসা করত অনেক কথা। তারপর একটি দিন আসত যেদিন হয়ত চীৎকার করে উঠত: 'ঠিক, আপনারা যা বলেছেন তা ঠিক। জমি আমাদের ভাল, মাটি উর্বর, জংগলে রয়েছে প্রচুর হাতী। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র প্রাচুর্য; অথচ আমরা পড়ে রয়েছি পুরনো, ছেঁড়া, ন্যাকড়ার মতো। অনেক ভালভাবে আমরা বাঁচতে পারি।' প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করবার পরেই, প্রথমে ওরা বেশ খানিকটা কাঁদত; তারপর জ্বলে উঠত প্রচণ্ড ক্রোধে। 'দেখুন, কেমন করে ওরা আমাদের ঠকায়। এক বাটি লবণের বদলে ওরা আমাদের কাছ থেকে ৩০ কিংবা ৪০ কে. জি. চাল আদায় করে। একটি পিতলের ঘণ্টার বদলে ওরা নেয় একটি মোষ অথবা হাতী। একমাস ধরে বাগিচার কাজ করিয়ে ফরাসীরা আমাদের দিত একটি পুরনো জামা অথবা ছেঁড়া একজোড়া প্যাণ্ট। এবং সারা দিন শ্রমিকের কাজ করিয়ে, মার্কিন-দিয়েমীরা হয়ত দেবে এক শিশি

সুগন্ধি দ্রব্য অথবা একখানা সাবান। আমাদের মেয়েদের কয়েকটি পুঁতি কিংবা একটুকরো নাইলন কাপড় দিয়ে ওয়া নেয় একপাল শুয়োর আর মোষ।”

অতীতে পুরুষানুক্রমে এদের দুঃখ-দুর্দশার একটি প্রধান কারণ ছিল চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্যমূলক কাজের সম্পূর্ণ অভাব। বসন্ত এবং আমাশয় এই দুটি মারাত্মক অভিশাপ কখনো কখনো সম্পূর্ণ গোষ্ঠীকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ভিয়েতনামী ক্যাডারদের কাছে শুনেছি, বহু গ্রামে মৃতদেহগুলোকে সমাধিস্থ করবার মতো মানুষও পাওয়া যেত না। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন হয়ত রক্ষা পেয়েছে, তারা বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ করে জংগলে পালিয়ে গেছে। জারাই, রেড এবং ম'নঙ গোষ্ঠীর একাধিক ব্যক্তির সংগে এই বিষয়ে আমি আলাপ করেছি। অতীতের এই ধরনের বিপর্যয়ের কাহিনী বলতে বলতে তারা কেঁদে ফেলেছে; দোহাই দিয়েছে ‘দেবতাদের’। আর, এই কুসংস্কারের সুযোগ নিয়েছে ওদের শত্রুরা। অন্ধসংস্কারে আরো উৎসাহিত করেছে ওদের। প্রথমে ফরাসী এবং পরে দিয়েমীরা অবাধ্য গ্রামগুলোর উপরে নাপাম নিক্ষেপের জন্য বিমান ব্যবহার করেছে। স্থানীয় দালাল শ্রেণীর লোকেরা অজ্ঞ গ্রাম-বাসীদের বোঝাত যে, ওগুলো হল ‘কিম ফিয়ার’—অর্থাৎ আগুনে পাখি। উপজাতীয় মানুষদের অবাধ্যতার কারণে ভগবান অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে ওই পাখিগুলো গ্রামের উপর বিষ্ঠা ত্যাগ করছে। কথাগুলো ওরা বিশ্বাস করত। অবশেষে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সৈন্যেরা কয়েকটি বিমান গুলি বিদ্ধ করে নামাবার পর ওরা দেখেছে, ওগুলো ‘আগুনে-পাখি’ নয়; ওগুলোর ভিতরে রয়েছে মার্কিন এবং ভিয়েত-নামী বিমানচালক। কিন্তু পুরুষানুক্রমিক প্রথা এবং কুসংস্কার দূরীভূত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ভিয়েতনামী ক্যাডারেরা অতি সতর্কতা সহকারে যে ভাবে এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করেছে তা সত্যিই মনে দাগ কাটবার মতো। এই অঞ্চলে পরিভ্রমণকালে, খণ্ডজাতীয় মানুষদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে আমাকে যে সমস্ত অতি সতর্ক উপদেশ

দেওয়া হয়েছিল, তাও আমার উপর্যুক্ত মন্তব্যকেই সমর্থন করে।

জনৈক অভিজ্ঞ ভিয়েতনামী ক্যাডারকে খণ্ডজাতীয় লোকেরা বহু বৎসর ধরে আশ্রয় প্রদান করেছিল। কথা প্রসংগে তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, "খণ্ডজাতীয় মানুষেরা এত সরল; চিন্তায় এবং কথায় এত সৎ, যে ওদের সংগে কথা বলবার সময় আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। একবার যদি ওরা কথা দেয়, তা দেবে চির জীবনের মতো। ওরা এত উদার ও সৎ যে, কোনো বন্ধুর সংগে বিশ্বাস ঘাতকতা করার চাইতে মৃত্যু অথবা ভয়ংকরতম অত্যাচারও বরণ করে নেওয়াটাকে শ্রেয় জ্ঞান করে।"

ত্রী খণ্ডজাতীয় গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট সর্দার একবার আমাকে বলেছিলেন, "নিদারুণ অন্ধকারের ভিতরে আমাদের জীবন এবং আলোক এনে দিয়েছেন কিন্ ভ্রাতারা। কোন দিন আমরা তাঁদের পরিত্যাগ করব না।" এই ধরনের বক্তব্য বিভিন্ন ভাবে আমি তে ঙুয়েন অঞ্চলে বারংবার শুনেছি। ১৯৪৫-৪৬ সালে কিছু সংখ্যক কর্মীকে যে তে ঙুয়েন-এ গিয়ে সেখানে বসবাস তথা কাজ করবার জন্য পাঠানো হয়েছিল, তা কম্বোডিয়া ও লাওসের সংগে সাধারণ সীমান্তযুক্ত, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ গেরিলাযুদ্ধের ওই স্বাভাবিক স্বর্গে কেবলমাত্র গেরিলা ঘাঁটি স্থাপনের জন্যই নয়। সেই উদ্দেশ্যই শুধু থাকলে, ওই ব্যবস্থা করা হত সামরিকভাবে। আমার ভিয়েতনামী বন্ধুদের বক্তব্য অনুসারে, প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল 'বৈপ্লবিক মানবিকতাবাদের' নীতি অনুযায়ী খণ্ডজাতীয় মানুষদের অনুন্নত জীবনে জ্ঞানালোকের খানিকটা রশ্মি নিক্ষেপ করা। তাই কষ্টসহিষ্ণু কৃষকদের ভিতর থেকে ইস্পাতের মতো কঠিন পাকস্থলী, স্নায়ু এবং বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন কর্মীদের বাছাই করে নেওয়া হল বেশ কয়েক বৎসরের মতো: এমন কি হয় তো সারা জীবনের মতো তারা খণ্ডজাতীয় মানুষদের রীতি-নীতি গ্রহণ করে তাদের সংগে বসবাস তথা কাজ করবার জীবন বেছে নিয়েছে। তার অর্থ হল, ক্ষেত্র বিশেষে নিজেদের দাঁতগুলোকে ঘষে ঘষে মাড়ি পর্যন্ত সমান করে দিতে হয়েছে; পরতে

হয়েছে ছেঁড়া এক ফালি বস্ত্র; চুলগুলোকে বাড়তে দিয়ে মাথার উপর খোপার মতো করে বাঁধতে হয়েছে; বিরাট বিরাট কর্ণভূষণ পরবার জন্য কান দুটোতে ছিদ্র করতে হয়েছে; এবং এমন খাদ্যাভ্যাসে রপ্ত হতে হয়েছে যা কয়েক বৎসরের ভিতরেই পাকস্থলীকে নিশ্চিতভাবে জরাজীর্ণ করে দেবে।

প্রথম দিকে ক্যাডারদের অন্যতম কাজ ছিল বিভিন্ন খণ্ডজাতীয় গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে 'সংহতি সম্মেলনে'র ব্যবস্থা করা। এই ধরনের সম্মেলনে সভাপতিত্বও করত তারাই। সেই সংগে দোভাষীর কাজও। নিজেদের জীবন এবং দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকদের উৎসাহিত করা হত। পুরুষানুক্রমে যে সমস্ত উপজাতীয় গোষ্ঠী নিজেদের ভিতরে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেছে, তারাও যোগদান করত এই ধরণের সম্মেলনে। প্রতিটি গোষ্ঠীর লোকেরাই নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করতেই স্পষ্ট হয়ে যেত যে, সেগুলোর উৎস হল একই। সেই উৎস, নদীর অপর তীরস্থ কোনো গোষ্ঠী নয়। তা হল একই অত্যাচারী শোষক; করভারে জর্জরিত করে তাদের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে; বেগার খাটাবার জন্য শ্রমিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হামলা করেছে তাদের গ্রামে এবং উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছে পরস্পরের প্রতি। ফলে, ধীরে ধীরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হল এবং স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অত্যাচারীদের লীলা-খেলা। পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল, আরো বিস্তৃত ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উপজাতীয় গোষ্ঠী এবং সংখ্যাগুরু ভিয়েৎনামীদের মধ্যে 'সংহতি সম্মেলন' অনুষ্ঠিত করা।*

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে এর পূর্বে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিতভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। ক্যাডারেরা একটু একটু করে জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা, উন্নত ধরনের চাষ-বাস ও পশু প্রজনন, এবং আরো যুক্তিসম্মত উপায়ে ভূমিজসম্পদ তথা শিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ওদের ওয়াকিবহাল করে তুলল। জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট গঠিত হবার

সংগে সংগে এই সমস্ত কাজ আরো ত্বরান্বিত করা হয়। প্রধান প্রধান খণ্ডজাতীয় ভাষাগুলোর জন্য সেই প্রথম উন্নততর লিখিত লিপিরও প্রচলন করা হয়। প্রতিটি বসতি থেকে যুবকেরা ফ্রন্টের প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষালাভ করে, শিক্ষা তথা জনস্বাস্থ্য কর্মীরূপে গ্রামে ফিরে আসতে থাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ কয়েক বৎসরে, নগণ্য কয়েকটি গোষ্ঠী বাদে, সব কটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিরোধ সংগ্রামী শক্তির অটল বন্ধুরূপে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। দিয়েমী দমন-পীড়নের চরমতম দিনগুলোতে যখন হাজার হাজার প্রাক্তন প্রতিরোধ-কর্মী সমতল অঞ্চল ত্যাগ করে পাহাড় জংগলে পালিয়ে আসতে থাকে, তখন কেন যে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের ভ্রাতা ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিল, তা এইতেই বোঝা যায়। আপন আপন গ্রাম ও পরিবারের প্রতি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষদের অপরিসীম অনুরাগের কারণে, তারা সহজেই অনুভব করতে পেরেছিল যে, বিধ্বংসী কোনো বিপর্যয় উপস্থিত না হলে, মানুষ কখনো এই ভাবে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করে নিতে পারে না। সমতলবাসী অনেকেরই খণ্ডজাতীয় মানুষদের সংগে পূর্বে কোনো যোগাযোগ ছিল না। তথাপি তাদের আতিথেয়তা এবং আন্তরিকতার কোনো অভাব হয় নি। এবং এতে সমতলবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে। একথা বললে এতটুকুও অত্যুক্তি করা হবে না যে, দমন-পীড়নের চরমতম দিনগুলোতে প্রকৃত-পক্ষে সমস্ত বিপ্লবী শক্তি এবং মধ্য ভিয়েতনামের মুক্তিফ্রন্টের সমস্ত ভবিষ্যত কর্মতৎপরতা এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে। যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের আহার্য জুগিয়েছে, রক্ষা করেছে, লুকিয়ে রেখেছে। এই ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতার একটিও ঘটনার কথা আমার কানে আসে নি।

প্রায়শই দোভাষীদের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির সংগে আলাপ-

আলোচনার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা আমার এই ব্যক্তিগত অভিমত হয়ত অনেক ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভিয়েতনামী ক্যাডার ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা একটি বাস্তব সত্য ঘটনা। কোনো রকমের সাহায্য অথবা ভাষাগত বাধা এই সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না। তা না হলে, উপজাতীয় সর্দারেরা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করা সত্ত্বেও, এবং তাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক তথা ওয়াকিবহাল করে দেওয়া সত্ত্বেও, বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ কালে আমাকে যে হত্যা করা হত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রতিরোধ সংগ্রামী ভিয়েৎনামীরা উপজাতীয় মানুষেব 'অন্তবে আসন লাভ' করেছে বলেই, প্রতিটি স্থানে আমাকে তারা ভ্রাতা বলে গ্রহণ করেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সরাসরি আক্রমণ
ব-দ্বীপ অঞ্চলের ভূমি সমস্যা

জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা কে, এই ছোট্ট প্রশ্নটির একটিমাত্র জবাব হল দিয়েম এবং ডালেস। তাঁদেরই চাপে পড়ে বিভিন্ন শক্তি আত্মরক্ষার তাগিদে মরিয়া হয়ে পরস্পরের বাহুবন্ধনে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে নো-দিন-দিয়েম দেশের প্রধান প্রধান ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয়তাবাদী তথা অর্থনৈতিক শক্তিগুলোকে নিজের বিরুদ্ধবাদী করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রতিটি কার্যের পশ্চাতে মার্কিন সমর্থন থাকার ফলে সব কিছু নীতি-নিয়মকে তিনি পদদলিত করেন। দেশের অধিকাংশ মানুষ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও, নিজে তিনি ক্যাথলিক বলে, সর্বোচ্চ পদ থেকে শুরু করে প্রাদেশিক ও জেলা পর্যায়ের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদেই নিজ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যান। শক্তির ভিত্তি যে বিশেষ কোনো একটি শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল, একথা সাধারণতঃ সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু দিয়েম নিজের শক্তির ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন বিশেষ একটি শ্রেণীর বিশেষ একটি অংশের উপরে। সেই অংশ ছিল, উত্তর ভিয়েতনাম থেকে পলাতক ক্ষমতাচ্যুত জমিদার এবং কেন্দ্রের তাঁর জমিদার বন্ধুবর্গ তথা অবশিষ্ট প্রাক্তন মান্দারিনগণ:

দিয়েমী শাসনের দমন-পীড়নের ফলে সমস্ত রাজনৈতিক দল, এমন কি চরম প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোও আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। রেহাই পেয়েছিল শুধু যে দলগুলোকে তৈরী করেছিলেন

দিয়েম নিজে এবং তাঁর শয়তান ভ্রাতা নু। জাতীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো দেশের অতীব সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। নিজেদের আমলে ফরাসীরা তাই তাদের আপন দলে টানবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। দিয়েম কিন্তু এই সমস্ত সংখ্যালঘুদের জাতির পক্ষে অনাবশ্যক বাড়তি অংশ মনে করে, যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের নিশ্চিহ্ন করতে সর্বতোমুখী চেষ্টা চালান। দেশের শিল্পোৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে অবহেলা তথা বিনষ্ট করে, সাহায্যপ্রাপ্ত মার্কিন ডলার দিয়ে বিদেশী মাল আমদানি করা হতে থাকে; এবং সেই ব্যবসাও চলতে থাকে 'নো' পরিবারের হাত দিয়েই।

যে শ্রেণী, অর্থাৎ যাদের উপরে দিয়েম নিজের শক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তারা ছিল দেশের বাইরে। দেশের ভিতরের সমস্ত প্রকৃত শক্তিকেই বিরোধীপক্ষে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। সব চাইতে মারাত্মক ভুল দিয়েম করেছিলেন ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থাকে চেষ্টাকৃতভাবে পণ্ড করে দিয়ে। প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় কৃষকদের মধ্যে যে সমস্ত জমি বিলি বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোকে তিনি আবার কেড়ে নেন। এবং এই কাজটি করতে গিয়েও কোনো প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর উপর তিনি ভিত্তি স্থাপন করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ, সমৃদ্ধ মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলের কেড়ে নেওয়া জমি দক্ষিণের প্রাক্তন জমিদারদের দেওয়া হয় নি। দেওয়া হয়েছিল মধ্য ভিয়েতনামের জমিদার কিংবা দিয়েমের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের; রাজনৈতিক, সামরিক ও পুলিশী 'সাহায্যে'র পুরস্কার স্বরূপ। দিয়েমের পাশে দাঁড়িয়ে মার্কিন সরকার সর্বদাই তাঁর প্রতিটি কাজকে সমর্থন ও প্রশংসা করেছে। ভাল-মন্দ বিচার করেনি। প্রকৃতপক্ষে নিজেরা উদ্যোগীও হয় নি। এশীয় সমস্যার প্রতি মার্কিন সরকারের সম্পূর্ণ মনোভাব যে কতখানি চরম হাস্যকর এবং কৌশল-বর্জিত, তা এতেই প্রমাণিত হয়। তাই, সাহায্যপ্রার্থী সরকারকে সমর্থন করবার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থার প্রতিকল্প হিসাবে দেওয়া হয়েছিল দিয়েমের জন্য ডলার, ও ডালেসের জন্য বোমা।

জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে হুয়েন হু থো'কে প্রশ্ন করলে, তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, "১৯৬০ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে সরকারিভাবে ফ্রন্ট গঠিত করা হলেও, প্রকৃতপক্ষে এর অস্তিত্ব আগেই ছিল। কিন্তু ১৯৬০ সালের শেষের দিকে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসূচীসহ এটি একটি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। জেনিভা চুক্তিতে অধিকাংশ মানুষ আনন্দিত হয়েছিল; এবং চুক্তির ধারাগুলো যাতে যথাযথ প্রতিপালিত হয় তা দেখাশুনা করবার জন্য গঠিত হয়েছিল আমাদের সায়গন-চোলোন কমিটি। বস্তুতঃ, সেই সময় থেকেই, অর্থাৎ ১৯৫৪ সাল থেকেই ফ্রন্টের অস্তিত্ব আমাদের কল্পনায় স্থান লাভ করে।

"ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে দমন করবার উদ্দেশ্যে দিয়েম যখন উঠে-পড়ে লাগলেন, এবং বিন স্যুয়েনদের * বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সায়গন শহরতলির বিরাট এলাকা পুড়িয়ে দেওয়া হল, সেই সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে একাধিক কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিগুলো ছিল জনসাধারণের বৃহত্তম অংশের প্রতিনিধি। কিন্তু দিয়েম এই কমিটিগুলোকে সংগে সংগে দমন করেন, এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে তাঁদের উপর অত্যাচার চালানো হয়। নিজের শক্তি সংহত করে নিয়েই দিয়েম জনসাধারণের প্রতিটি অংশের উপরে আঘাত হানতে শুরু করলেন। সব রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং গ্রামীণ কৃষক—কেউ বাদ গেল না। কৃষক সম্প্রদায় কিন্তু প্রতিরোধের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে, প্রথম দিকে সর্বাধিক আঘাত এসে পড়ে তাদেরই ওপরে। প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় কৃষকদের মধ্যে ৫০০, ০০ হেক্টর জমি বিলি করা হয়েছিল। তার থেকে মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ বাদ সমস্ত জমি দিয়েম কেড়ে নিলেন। যে সমস্ত উপদল ও

---

* বিনস্যুয়েনটি সশস্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়। দিয়েম যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখন এই সম্প্রদায়ই ছিল সায়গনের পুলিশবাহিনীতে।

রাজনৈতিক দলগুলোর জনসাধারণের মধ্যে কোনো ভিত্তি ছিল না, সেগুলো দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। চীনা এবং খ্মের (কাম্বোডিয়ান) জাতিগোষ্ঠীর মতো ছোট-বড় দলগুলো বাধ্য হয়ে ভিয়েতনামী ভাষা, নাম তথা রীতি-নীতি গ্রহণ করল। খ্মেরদের সমস্ত বিদ্যায়তন বন্ধ করে দেওয়া হল। মোট কথা, দিয়েমের নীতির সারমর্ম ছিল বৃহত্তর সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে বর্বরোচিত উপায়ে অঙ্গীভূত করা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা। কোনো শ্রেণী অথবা কোনো ধর্মীয় তথা জাতীয় দল, কেউ রেহাই পেল না।"

মার্কিন-দিয়েমী নীতির সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল ছিল কৃষকশ্রেণীর উপর হামলা। মধ্য ভিয়েতনামে যা ঘটল, তার চাইতে বহুগুণ বেশী এবং ব্যাপকতর অত্যাচার চালানো হল দক্ষিণে; বিশেষ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সব চাইতে সমৃদ্ধ এবং ঘন বসতিপূর্ণ মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মোট ১৪,০০০,০০০ জনসংখ্যার ভিতরে ৫,৭০০,০০০ জনই বসবাস করত ব-দ্বীপের ১৩টি প্রদেশে। এর সঙ্গে সায়গন-চোলোন অঞ্চলের আনুমানিক ১,০০০,০০০ লোক সংখ্যা যোগ করলে ব-দ্বীপ অঞ্চলের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে মোট জন সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী; প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৬ জন করে।

মেকং ব-দ্বীপ ছিল বড় বড় সমস্ত জমিদারীর এলাকা। পুরাতন ইউরোপীয় চাল-চলনে অভ্যস্ত জমিদারেরা বিলাস-প্রাচুর্যের মধ্যে সায়গনে বসবাস করত। তাদের আবাদের ম্যানেজারেরা বিদেশ ভ্রমণ করে বেড়াত, সন্তান-সন্ততিদের ফ্রান্সে পাঠাত লেখাপড়া শেখার জন্য, এবং আবাদের খাজনা জমা দিত জমিদারের ব্যাংকে। কিন্তু মধ্য ভিয়েতনামের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় পর্যন্ত সেখানে ১০০ হেক্টর জমির মালিক ছিল মাত্র আটটি পরিবার। কোনো জমিদারের ১০ হেক্টর (১ হেক্টর = ১'৪৭ একর) জমি থাকলেই তাকে 'ধনী' বলে গণ্য করা হত। তারা বসবাস করত নিজেদের জমিদারীতেই এবং খাজনা বাবদ পাওনা প্রতি পাউণ্ড চাল তথা প্রতিদিনের বেগার খাটুনির জন্য কৃষকদের সংগে

তাদের বিবাদ লেগেই থাকত।

কিন্তু ব-দ্বীপ অঞ্চলে কোনো জমিদারের ৫০ হেক্টর জমি থাকলে, তবেই তাকে গণ্য করা হত 'ধনী' বলে। প্রথম প্রতিরোধ লড়াইয়ের সময় ১০০ হেক্টরের অধিক জমির মালিক ছিল ১.৭০০ জন জমিদার। এই হিসাবের মধ্যে ৫০০ হেক্টরের অধিক জমির মালিক ১৪৪ জন জমিদারকেও ধরা হয়েছে। এই চিত্রের অপর পৃষ্ঠায় ছিল এক হেক্টরেরও কম জমির মালিক ৮৬,০০০ কৃষক পরিবার এবং ভূমিহীন হাজার হাজার মানুষ যাদের একেবারে কিছুই ছিল না। ব-দ্বীপ অঞ্চল হল দেশের চালের ভাণ্ডার। এই অঞ্চল নিজের ও সায়গনের প্রয়োজন মিটিয়েও কয়লার বিনিময়ে উত্তর অঞ্চলে চাল রপ্তানি করে এবং গড়পড়তা প্রায় ১০ লক্ষ টন চালের যোগান দেয় বিদেশে রপ্তানির জন্য। এছাড়া অন্যান্য জিনিসের মধ্যে রয়েছে ফল, নারকোল, মাছ এবং বাৎসরিক ১০ লক্ষ টনেরও বেশী মূল্যবান কাঠকয়লার ব্যবসা, যা হল সায়গন ও অন্যান্য শহরগুলির জ্বালানী যোগানের এক প্রধান সূত্র।

ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় প্রবাসী জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে দরিদ্র অথবা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন ফ্যাশন অনুসারে এই সমস্ত জমিদারদের অনেকেই ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আপন জমিদারীতে বসবাসকারী যে সমস্ত জমিদার ফরাসীদের সংগে সহযোগিতা করে নি, তাদের জমি কেড়ে না নিয়ে খাজনা বহুলাংশে কম করে দেওয়া হয় এবং বকেয়া ঋণও মকুব করে দেওয়া হয়। মোট ১,৬৮৪,০০০ হেক্টর ধানী জমির মধ্যে, বিলি করে দেওয়া হয় প্রায় ৩৫০,০০০ হেক্টরের মতো। বড় বড় জমিদারদের ভিতরে মাত্র পাঁচ শতাংশের মতো জমিদার খাজনা পেতে থাকে।

দিয়েম তাঁর 'ভূমি সংস্কার' সংক্রান্ত মার্কিন পরামর্শদাতা ল্যাডেজিন্সকি'র পরামর্শক্রমে, সেই জমি ফিরিয়ে নেবার এক পরিকল্পনা রচনা করেন। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সায়গনে

অনুষ্ঠিত 'জমিদার-কৃষক'দের এক-সম্মেলনে, জমিদারেরা আপন আপন জমিদারীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার দাবি জানায়। উৎপন্ন ফসলের ৩৩ শতাংশ খাজনা ধার্য করার দাবিও তারা করে। পরবর্তীকালে অনুমোদিত এই পরিকল্পনা অনুসারে বিলি-প্রাপ্ত জমির কৃষকদের এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক করা হল, যে চুক্তি মাফিক তাদের উৎপন্ন ফসলের ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ মূল্য খাজনা হিসাবে দিতে হবে। কিন্তু দিয়েমের পক্ষাবলম্বী সায়গনের দৈনিক পত্রিকা তুদো (স্বাধীনতা) '১৯৬০ সালের ৩রা মার্চ তারিখে মন্তব্য করল: "চুক্তি অনুসারে ২৫ শতাংশ খাজনা ধার্য করা হলেও, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু জমিদারেরা আগেকার মতোই ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ খাজনা ধার্য করছে এবং ফসল খারাপ হলেও কিছুমাত্র রেহাই দিচ্ছে না।" এর উপর, বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্যও তারা চাপ দিতে থাকে এবং কৃষকদের আবার পুরুষানুক্রমিক ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে।

স্বভাবতই কৃষকেরা এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করে। দলিলের উপর টিপসই দিতে গররাজি হয়। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিতে বাধ্য হলেও, অত্যধিক খাজনা অথবা কর প্রদানে অসম্মত হয়। ফলে খাজনা-আদায়কারীদের সংগে দেওয়া হতে থাকে পুলিশ অথবা সেনাদল। অন্যান্য যে সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তার একটি ছিল ভূম্যধিকারীদের ১০০ হেক্টরের অতিরিক্ত জমি বিক্রী করতে বাধ্য করা। এই ব্যবস্থা মধ্য ভিয়েতনামে দিয়েমের ভূম্যধিকারী বন্ধুদের মোটেই স্পর্শ করে নি। ভূমিহীন কৃষকদের কাছে বিক্রয়ের জন্য জমি সংগ্রহ করাই ছিল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কিন্তু জমির বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়েছিল অস্বাভাবিক বেশী, এবং প্রতি হেক্টর জমির জন্য বাৎসরিক এক টন চাল হিসাবে ছয় বৎসর ধরে সেই মূল্য পরিশোধের শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। কৃষকদের পক্ষে এই মূল্য প্রদান করা ছিল অসম্ভব। অথচ জমিদারদের পাওনা পত্র সংগে সংগে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল নগদে অথবা সরকারী ঋণপত্রে, এবং সেই টাকা ব্যবসায়ে খাটাতেও তাদের উৎসাহিত করা হয়েছিল। ১০০

হেক্টরের অতিরিক্ত জমি বিক্রয় বাধ্যতামূলক করে আদেশ জারি হবার চার বৎসর পর, ১৯৬০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত মাত্র ৪১,০০০ কৃষক পরিবার ক্রয় করেছিল মাত্র ৯০,০০০ হেক্টর জমি। এবং সায়গনের পত্রিকাগুলোর ঘোষণা অনুসারে উক্ত সময়ের মধ্যে ১৮ জন বড় জমিদার ব্যবসা ক্ষেত্রে লগ্নী করেছিল প্রায় ৭০ লক্ষ পিয়াস্ত্রা।

খাজনা, কিস্তি ব্যবস্থা, সুদ অথবা বকেয়া ঋণ, শোষণের রূপ যাই হোক না কেন, কৃষকদের কাছে তার ফল হয়েছিল একই রকমের। আগেকার সেই ভয়ংকর দিনগুলো যেন আবার ফিরে এসেছিল। খাজনা ও কর আদায়কারীদের ইংগিতমাত্র তাদের সংগে হাজির হত আবার সেই পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী। খাজনা তথা কর প্রদানে অসম্মতি—কৃষকবিদ্রোহের সেই চিরাচরিত রূপের বীজবপন করেছিল মার্কিন-দিয়েম ভূমি-নীতি। আর সেই বীজকে সতেজ করেছিল প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষকে খতম করবার বর্বর অভিযান। দিয়েম সঠিক অনুমান করেছিলেন যে, ব-দ্বীপ অঞ্চলে যারা ফরাসী ঔপনিবেশিক তথা স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করেছিল, তারাই সম্ভবতঃ তাঁর নিজের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-নীতি ও মার্কিন সমর্থকদের বিরুদ্ধে আরেকটি সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করবে।

বর্তমানে মুক্তি ফ্রন্টের আন জুয়েন (মেকং ব-দ্বীপের সর্ব দক্ষিণস্থ পূর্বতন কা মাউ) প্রাদেশিক শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হুয়েন তু কোয়াঙ, তাঁর এলাকায় ফ্রন্ট গঠন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে একদিন আমাকে বলেছিলেন, "১৯৫৯ সন নাগাদ জনসাধারণ মরিয়া হয়ে ওঠে। জাতীয় সভা এবং প্রাদেশিক তথা জেলা অধিকর্তাদের কাছে দরখাস্ত আবেদন-নিবেদন ইত্যাদি আইনানুগ সংগ্রামের সব কটি পথই তারা পরখ করে দেখেছিল। ওসবে কেউ কর্ণপাতও করত না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকার ফলে, শুরু হল সমবেত সংগ্রাম। সারা বসতির মানুষ অথবা একাধিক বসতির সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যেত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের

কাছে। কিন্তু দেখা গেল প্রতিবাদ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, দমন-পীড়নও ততই হচ্ছে তীব্রতর। শেষ পর্যন্ত এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হল যে, দেশপ্রেমিক মানুষ কেউ আর ঘরে থাকতে পারল না। সংগ্রামের অন্য কোনো পন্থা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে তারা জংগলে গা ঢাকা দিল। এদের মধ্যে ছিল হস্তশিল্পের শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী, স্কুলের শিক্ষক, অন্যান্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, কৃষক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। কর্তৃপক্ষের শাস্তি এড়িয়ে যারা আত্মগোপন করেছিল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই জংগলের ভিতরেই তাদের একটি জাতীয় মোর্চা আত্মপ্রকাশ করল। তারপর সবাই মিলে বসে কিভাবে প্রত্যাঘাত হানতে হবে, তা নিয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম।"

নুয়েন তু কোযাঙ নিজে ছিলেন একজন দরজি, এবং তিনিও জংগলে পালিয়ে যান। একটু থেমে আবার বলেছিলেন, "১৯৬০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ভোর ৩টার সময় কাই নউক জেলা সদরের বাজারে একের পর এক জাংক ও সামপান এসে জড়ো হতে শুরু করে। সাধারণতঃ এগুলোতে আসে শুয়োর, মুরগি, ছাগল ইত্যাদি। কিন্তু সেদিন এই সমস্ত পণ্য ব্যতীত ছিল সারা জেলা থেকে আসা অসংখ্য মানুষ। জেলার কমিশনার ছিল 'থু' নামে এক নরপিশাচ। তার দপ্তর ছিল বাজারের সামনেই। ভোর বেলায় বাজারে অত বড় বিশাল জনতাকে একত্রিত হতে দেখেই সে সরে পড়ল। পুলিশ কমিশনার সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে পাঠাল ঘটনাস্থলে। ব্যাটন হাতে ওই পুলিশবাহিনী এসেই জনতাকে চলে যেতে আদেশ করল। ততক্ষণে আমরা প্রায় চার হাজারের মতো লোক জড়ো হয়ে গেছি। পুলিশের আদেশ অমান্য করলাম সবাই। এবং পুলিশবাহিনী আক্রমণ তথা গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হতেই ওদের ঘিরে ফেললাম। ফলে ওরা ডেকে আনল শ'দুয়েক সৈন্য। এবং সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ মিলে তখন গ্রেপ্তার করতে শুরু করল। বন্দীদের যখন তারা নিয়ে যাচ্ছে, তখন সেই জনতা এবং স্থানীয় বাজারের সমস্ত মানুষ পিছু পিছু জেল পর্যন্ত গিয়ে জেলের ফটক ভেঙে

বন্দীদের এবং অন্যান্য সমস্ত কয়েদীদের মুক্ত করে দিল। ব্যাপার দেখে সৈন্যদের আদেশ দেওয়া হল বেয়নেট আক্রমণ চালাতে। কিন্তু অত লোকের ভীড়ে বেয়নেট আক্রমণ চালাতে তারা পারল না। তবু সামনের সারির মেয়েদের পায়ে বেয়নেট নিয়ে আক্রমণ করল ওরা। কয়েকজন মেয়ে গুরুতর আহত হল; কিন্তু তবু ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত পা নিয়েই এগিয়ে চলল তারা। অবশেষে পুলিশ কমিশনার সৈন্যদের আদেশ দিল গুলি চালাতে। কিন্তু সৈন্যরা আমাদের চীৎকার করে বলল: 'সবাই মাথা নিচু করে থাকো; আমরা উপরে গুলি চালাব।' আমরা তাই করলাম। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম সবাই। আমাদের মাথার উপর দিয়ে ওরা গুলি চালাল। কিছুক্ষণের জন্য সব কিছু যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। চীনা ব্যবসায়ী ও রেস্তোরাঁর মালিকেরা আমাদের এনে দিল চা ও খাবার। খু'র সংগে সাক্ষাতের দাবি জানিয়ে আমরা চীৎকার করতে থাকলাম; সৈন্যেরা আমাদের আক্রমণ করতে ক্রমাগত অস্বীকৃত হওয়ায় খু'কে অবশেষে আসতে হল। রাগে তখন সে কাঁপছিল। তবু, সেই বিশাল জনতার সামনে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হল যে, আমাদের দরখাস্তগুলো সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবে।

"অবশ্য সত্যিই পাঠাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। তবু জনসাধারণের মনোবল দৃঢ় করবার ব্যাপারে ঘটনাটি ছিল খুবই সার্থক। কিছু লোক আমাদের আহত হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু বন্দীদের আমরা কারাগার থেকে মুক্ত করেছিলাম, খু'র সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল, এবং আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিলটির কথা অনতিবিলম্বেই যে সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়বে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। তা ছাড়া, সৈনিকদের উপরেও এই ঘটনার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। ঘটনাস্থলেই প্রায় ২৪ জন সৈনিক চাকরি ছেড়ে আত্মগোপন করে; এবং নিজেদের লোকজনের সংগে নৌকাযোগে ঘরে ফিরে যায়। মোট কথা, ছোট্ট একটি গণ-প্রতিরোধ দিয়ে কি করা যেতে পারে, এই ঘটনাটি ছিল তারই প্রমাণ। বস্তুতঃ, এই

ধরনের আন্দোলন প্রদেশ অথবা সারা দেশব্যাপী সংগঠিত করলে কি হতে পারে তা নিয়ে আমরা কয়েকজন এই ঘটনার পরই চিন্তা করতে আরম্ভ করি। বৃহত্তর একটি জাতীয় মোর্চার কল্পনা সেই সময় কেবলমাত্র যে আমাদের মনেই রূপায়িত হয়ে উঠেছিল তাই নয়। পরে জেনেছিলাম, সারা দেশব্যাপী আমাদের সমস্ত দেশপ্রেমিক বন্ধুদের মনেই সে প্রশ্ন জেগেছিল।

"রাজনৈতিক-সামরিক সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়ে গিয়েছিল। সৈন্যদল বলপূর্বক কোনো গ্রামে প্রবেশের চেষ্টা করলেই তাদের সাবধান করে দেওয়া হত: 'ভিয়েতকংরা এসে গ্রাম এবং বাগানগুলোর চারিপাশে ফাঁদ পেতে রেখে গেছে। তাই, কাছে যাবে না।' এটা হত রাজনৈতিক কার্যকলাপ। এবং শত্রুসৈন্য বলপূর্বক গ্রামে প্রবেশ করতে গিয়ে কোনো ফাঁদে পড়ে গেলে, তা হত সামরিক কার্যকলাপ। সে ক্ষেত্রে, গ্রামের লোকদের বক্তব্য হত: 'আপনাদের আগেই বলি নি?' এই বাক্যটি হত আর একটি রাজনৈতিক তৎপরতা। পরবর্তী রাজনৈতিক কৌশল হত আহতদের ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়া, তাদের চা খাওয়ান ইত্যাদি। ফ্রন্ট গঠিত হবার পর সংগ্রামের এই রাজনৈতিক-সামরিক কৌশলের আরো প্রচুর উৎকর্ষ সাধন করা হয়।"

ধর্মীয় সম্প্রদায়

ফ্রন্ট, বিশেষ করে ফ্রন্টের সামরিক অংশ গঠনের ব্যাপারে সশস্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর অবশিষ্ট সমস্ত অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিন জুয়েনদের সায়গন থেকে বহিষ্কৃত করে দেবার পর দিয়েম নজর দিয়েছিলেন কাও দাই সম্প্রদায়ের প্রতি। সামরিক চাপ সৃষ্টি করে এবং মার্কিন অর্থে কাওদাই সর্দারদের ঘুষ দিয়ে তাদের তিনি বশীভূত করবার চেষ্টা করেন। ইতিপূর্বে দিয়েমী সেনাবাহিনীর সংগে নিজেদের সেনাবাহিনীকে মিলিত করবার এক প্রস্তাব

কাওদাইরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। দিয়েম এবার তারই শোধ নিলেন। বিন জুয়েনরা জংগলে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল। কাওদাইদের প্রধান সেনাপতি ত্রান মিন থি'কে দিয়ে দিয়েম বিন জুয়েনদের উপরে অতর্কিত এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ এক আক্রমণ চালালেন। এবং সেই লড়াইয়ের মধ্যেই দিয়েমী চরেরা থি'র মাথার পিছন দিকে গুলি করে হত্যা করল। লড়াইয়ে পর্যুদস্ত হয়ে প্রধান হোয়া হাও সামরিক নেতৃদ্বয় বা-কাত ও নাম লুয়া, দিয়েমের পক্ষে যোগদান করতে স্বীকৃত হল। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করবার জন্য নির্ধারিত স্থানে যাবার পথে, দিয়েমী দালালেরা তাদের গ্রেপ্তার করে মাথা কেটে ফেলল। দিয়েম ভেবেছিলেন তিনি খুব একটা চাল চেলেছেন। কিন্তু সমস্ত ধর্মীয় দলগুলোর সাধারণ মানুষের কাছেই ব্যাপারটি একটি বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়াল। রাজনীতি তারা ভাল বুঝত না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা নামক ব্যাপারটিকে তারা বুঝত ভাল করেই। আর, এই ধরনের দ্বিমুখী বিশ্বাসঘাতকতাকে আরো ভাল করে। দিয়েমের সেনাবাহিনীর সংগে তাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে, গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের কোনো মতামত নেওয়া হয় নি। কিন্তু নেতৃবৃন্দ যেভাবে তাদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তার ফলে নিজেরাও সেই বিশ্বাস-ঘাতকতার শিকার হয়েছিল, তাতে গোষ্ঠীগুলোর সাধারণ মানুষেরা নিজেদের পুরুষানুক্রমিক সর্দার তথা দিয়েমের প্রতি হয়ে পড়ল ভয়ংকর বিরূপ।

ততদিনে সশস্ত্র দলগুলোর অবশিষ্ট অংশ গিয়ে জড়ো হয়েছে মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে; কাও দাই ও বিন জুয়েনরা কম্বোডিয়া সীমান্তে রীডস-এর সমতল এলাকায় এবং হোয়া হাও'রা আরো দক্ষিণে। প্রাক্তন প্রতিরোধ সংগ্রামী ক্যাডারেরা সেই সময় যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের সংগে। সশস্ত্র দলগুলোর অধিকাংশই বলতে গেলে দস্যুবৃত্তি করে জীবনধারণ করত। তাদের না ছিল অর্থবল, না ছিল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ। থাকার মধ্যে একমাত্র ছিল অস্ত্রশস্ত্র;

এবং সেগুলোকে তারা ব্যবহার করত গ্রামীণ কৃষকদের উপরে লুঠতরাজ চালাবার জন্য। প্রতিরোধ ক্যাডারেরা প্রথমে তাদের আশ্রয় ও খাদ্যদ্রব্য এবং পরে বস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করে, এবং ক্রমশঃ তাদের ছত্রভঙ্গ শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তোলে। সেই সংগে, জনতার বিরুদ্ধাচরণ না করে সর্বদা জনতার সংগে মিলে-মিশে বাস করবার প্রয়োজনীয়তার উপর মুখ্য গুরুত্ব আরোপ করে তাদের বোঝাতে থাকে। অবশেষে, তিনটি গোষ্ঠীর সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ যোদ্ধাদের একত্রীকরণের উপর আংশিকভাবে ভিত্তি করে এবং প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামের বিশ্বস্ত, পোড়খাওয়া কর্মীদের নেতৃত্বে মুক্তি ফৌজ গঠিত হয়।

প্রাক্তন প্রতিরোধ সংগ্রামীদের মধ্যে যারা দিয়েমী দমন-পীড়নের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তারা ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে প্রাক্তন প্রতিরোধ সদস্যদের একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত করে। এই সংঘটি ছিল জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। উক্ত সংগঠনই পরবর্তীকালে বিপ্লবী জনতার দলে পরিণত হয়। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের এক জনের সংগে আমার সাক্ষাৎকারের সুযোগ হয়েছিল। বিশালদেহী, মধ্যবয়সী, ঝানু বিপ্লবী সেই ভদ্র লোকের নাম ত্রান্‌ নাম ত্রুঙ। বর্তমানে তিনি হলেন জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সহ-সভাপতি এবং বিপ্লবী জনতা দলের সহ-সম্পাদক। এছাড়া তিনি ফ্রন্টের প্রেসিডিয়ামে মুক্তি ফৌজের প্রতিনিধিত্বও করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হলেন মুক্তি ফ্রন্টের সেনা বাহিনীর প্রধান।

মুক্তি ফ্রন্ট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে তিনি আমাকে বলেন, "শত্রুর নির্বাধ হিংস্রতার প্রতিরোধে যতদিন আমরা শক্তি প্রয়োগ করি নি, ততদিন মার্কিন পুতুলেরা তাদের সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে এবং প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করেছে। কিন্তু সংগ্রামের সঠিক রূপ আবিষ্কার করে সেটিকে ব্যবহার করতেই বুঝলাম, যতখানি শক্তিশালী এবং অপরাজেয় বলে তাদের মনে হত, আসলে ততখানি নয়। জাতীয় ফ্রন্ট গঠন তথা সশস্ত্র পালটা

আঘাত হানবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সংগে সংগেই আমাদের ক্ষতির পরিমাণও অনেকখানি কমে গেল। শত্রুপক্ষ যতদিন পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় নিরস্ত্র মানুষদের উপর অবাধে সীমাহীন হিংস্র আচরণ করতে পেরেছে ততদিন তারা সত্যিই ছিল দুর্জয়।

"বুঝলাম, এবার আমাদের নতুন এক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তা'হল, পয়লা নম্বরের মার্কিন সমরতত্ত্ববিদ, জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর উদ্ভাবিত 'বিশেষ ধরনের যুদ্ধ।' এবং এই সত্যটি উপলব্ধি করবার সংগে সংগেই আর একটি সিদ্ধান্তেও আমরা উপনীত হলাম। এর আগে যেমন শুধুমাত্র রাজনৈতিক পন্থায় লড়াই করে আমরা এঁটে উঠতে পারি নি, এবারও তেমনি শুধুমাত্র সামরিক পন্থায় লড়াই চালানো যাবে না। এবার সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন হবে সামরিক-রাজনৈতিক সম্মিলিত এক পন্থার। মার্কিন দিয়েমী শাসনকে উৎখাত করবার ব্যাপারে ১৯৫৯ সালের শেষ নাগাদ জনগণের অধিকাংশই সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে উৎখাত করবার প্রচেষ্টা চালাবার মতো পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যে সময় আমাদের অনুকূলে ছিল না, সেই সময়েই, ১৯৬০-৬১ সালে কৃষক-জনতা বিদ্রোহী হয়ে কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিদের হাত থেকে গ্রামাঞ্চলের শাসনক্ষমতা কেড়ে নেয়। স্থানীয় তথা আংশিক ভাবে হলেও, সেটা ছিল প্রকৃতই গণ বিদ্রোহ।"

কথাগুলো বলতে বলতে ত্রাঙ-এর কঠিন, বিষণ্ণ মুখের উপর দিয়ে এক ঝলক হাসি ভেসে যায়; " 'সশস্ত্র সংগ্রাম' কথাটা এখন আমরা হামেশা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু জনগণ যখন বিদ্রোহ করেছিল, সে সময় তাদের কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। অস্ত্র বলতে ছিল কেবলমাত্র নিড়ানি, ছুরি, চাষ-বাসের সরঞ্জাম, জংলী অস্ত্র, এমন কি ছোট ছোট কাঠের টুকরো এইসব। কিন্তু যে জনতার হৃদয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন সর্বক্ষণ দাউ দাউ করে জ্বলছে, তাদের হাতে এই সমস্ত তুচ্ছ বস্তুই শক্তিশালী অস্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সশস্ত্র ধর্মীয় দলগুলোর হাতে যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ছিল, সে

সমস্ত মিলিয়ে সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে ১৯৬০ সালে আমাদের হাতে ছিল এক হাজারেরও কম আগ্নেয়াস্ত্র। তবু, বিমান ও ট্যাংক বহর, গোলন্দাজ বাহিনী ইত্যাদি সব মিলেও সেই বিদ্রোহ দমন করেতে পারে নি। যদিও কেবলমাত্র কৃষক সম্প্রদায়ই বিদ্রোহ করেছিল, তবু জনগণের অন্যান্য অংশের সমর্থন ছিল তাদের পিছনে।"

একটু থেমে আবার বলেছিলেন, "একটি বিষয় বিশেষ করে লক্ষ্য করবার মতো। আমাদের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী, তথা সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দিক থেকে খুব পরিপক্ক; আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণীর চাইতে অনেক বেশী। পাশ্চাত্যের মানুষের পক্ষে ব্যাপারটি অনুধাবন করা বোধ হয় কঠিন। কারণ পাশ্চাত্য দেশের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে রাজনৈতিক তথা সাংগঠনিক বিষয়ে সাধারণ মানুষের চাইতে বুর্জোয়া শ্রেণী অনেক বেশী অভিজ্ঞ। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বুর্জোয়াশ্রেণী নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এখনো ভাল করে সংগঠিত হয় নি। বহু দলে তারা বিভক্ত। আদর্শ ও সংগঠনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তারা অনেক নিচু স্তরে রয়েছে। এটা যে কেবলমাত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামেরই বিশেষত্ব তা আমাদের মনে হয় না। আমাদের ধারণা, যে সমস্ত উন্নতিশীল দেশ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ করেছে এবং সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব পেয়েছে, তাদের সবারই চিত্র এক। কথাটা বলছি এই কারণে যে, কৃষকশ্রেণী ছিল সংগ্রামের পুরোভাগে এবং শহুরে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা অংশ তাদের সমর্থন করেছিল, এ ব্যাপারটা আপনার কাছে আশ্চর্য মনে হতে পারে। কিন্তু ভুলবেন না, বহুদিন ধরে আমাদের দেশে ছিল দুটি মাত্র শ্রেণী; কৃষক ও জমিদার। এবং মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে জমিদার-নন্দনদের ভিতর থেকে একটি মান্দারিন শাসকশ্রেণী জন্মলাভ করেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কথা ধরলে, আমাদের বর্তমান সময়ে এই ধরনের পরিস্থিতির সমাধান করা যেতে পারে দুটি মাত্র উপায়ে।

দেশ যদি প্রধানতঃ গণতান্ত্রিক হয়, তা হলে সাধারণ মানুষ ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। অন্যথায় হবে ফ্যাসিবাদের জন্ম। এবং ঔপনিবেশিক অথবা নব্য-ঔপনিবেশিক কোনো শক্তি এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করলে, সমাধান সর্বদাই হবে ফ্যাসিস্ত কায়দার অনুকূলে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমরা এই ব্যাপারই দেখেছি।”

আলোচনার সমাপ্তি টেনে ক্রুঙ আবার বলেছিলেন, “কিন্তু এখানকার সংগ্রামের সব চাইতে লক্ষণীয় বিষয় হল, আমেরিকা এখানে এক অতি বিশেষ ধরনের যুদ্ধ শুরু করেছে ; এবং আমরাও সেটাকে প্রতিহত করতে এক অতি বিশেষ ধরনের সংগ্রামের আশ্রয় নিয়েছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোধ হয় দুর্ভাগ্য যে, এই অতি বিশেষ ধরনের যুদ্ধের প্রথম পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে সে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে বেছে নিয়েছিল। বিগত কুড়ি বছর ধরে আমরা লড়াই করেছি। কিভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে হয় এবং কি ভাবে রাজনৈতিক-সামরিক সংগ্রামকে যুক্ত করা যায়, তা আমরা জানি।”

প্রাক্তন প্রতিরোধ সদস্যদের সংগঠন যে সময় স্থাপিত হয়েছিল, মোটামুটিভাবে সেই সময়েই আরো বহু সংগঠনও গড়ে ওঠে। যেমন কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন এবং যুবক, মহিলা, ছাত্র, লেখক, থিয়েটার কর্মচারী প্রভৃতির প্রতিনিধিত্বমূলক একাধিক সংস্থা। ততদিনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে এবং দিয়েমের মনস্তাত্বিক-যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শদাতাগণ ক্যাথোলিক কৃষক ও ধীবর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচিত্র এক ধারণার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। সেটা হল, কুমারী মেরী উত্তর ভিয়েতনাম ত্যাগ করে দক্ষিণে চলে এসেছেন, এবং যে সমস্ত ‘অবিশ্বাসী’ সেখানে রয়ে গেছে, তারা সবাই আণবিক বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ক্যাথোলিক কৃষক ও ধীবর সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে উত্তর ভিয়েতনাম পরিত্যাগ করে ১৯৫৪-৫৫ সালে দক্ষিণে চলে আসে। এই সমস্ত বাস্তুত্যাগীদের ভিতরে যারা পুনরায় উত্তর ভিয়েতনামে প্রত্যাবর্তনের দাবি করে অথবা বাসগৃহ, জমি এবং চাকরি দেবার

প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি জানায় তাদের হয় গুলি করে মারা হয়, নয়তো কারারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু একটি বিষয় ছিল লক্ষ্য করবার মতো। বিভিন্ন ধর্মীয় দল, সংখ্যালঘু খণ্ডজাতীয় গোষ্ঠী, ক্মের ও ভুঁইফোঁড় সংস্থাগুলোর মতো, বৌদ্ধ ও বাস্তুত্যাগী ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের লোকেরাও গণতান্ত্রিক মৌল-অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক মোর্চা গঠনের ব্যাপারে ছিল সমান উৎসাহী।

ফ্রণ্টের প্রকৃতি

এই ভাবে ফ্রণ্ট গঠিত হল; এবং সেই সংগঠনেব মধ্যে প্রতিফলিত হল দক্ষিণ ভিয়েতনামী সমাজের সর্ববিধ শক্তি। এই শক্তিকে বিরোধী করে তুলেছিলেন দিয়েম এবং ডালেস। শুধু তাই নয়, এমন অনেক উপাদানকেই তাঁবা বিরোধী করে তুলেছিলেন, যেগুলোকে তাঁরা নিজেদের পক্ষে পেতে পারতেন ন্যূনতম বাস্তবোধের পরিচয় দিলে।

হুয়েন হু থো'র কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ফ্রণ্ট যখন গঠিত হয়, সে সময় তিনি ছিলেন দিয়েমী কারাগারের অন্তরালে। ফ্রণ্ট গঠন বিষয়ে আলোচনা প্রসংগে একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, "সমস্ত রকমেব রাজনৈতিক চিন্তাধারা, সর্ব-ধর্ম, এক কথায় জনসাধারণেব সমস্ত অংশ তথা শ্রেণী এসে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে ফ্রণ্টের ভিতরে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে রয়েছে বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব। আর রয়েছে সায়গনের নিজস্ব গোপন প্রতিনিধি এমন কি বিদেশে নির্বাসিত ব্যক্তিরাও।" থোর সংগে প্রথম যেদিন আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে দিন তাঁর সংগে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জনৈক ক্যাথোলিক পুরোহিত; বৌদ্ধ ও কাওদাই ধর্মের অতি-সম্মানিত ব্যক্তিগণ; এক জন স্থপতি; এক জন ভেষজ রসায়নবিদ; জনৈক সাংবাদিক; বিন জুয়েন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং একজন কৃষক। অপর এক সাক্ষাৎকারে থোর সংগে

উপস্থিত ছিলেন জনৈক উকীল, একজন বেতার যন্ত্রশিল্পী, জনৈক লেখক ও নাট্যকার, একজন সাংবাদিক, একজন স্কুল শিক্ষিকা, একজন পেশাদার বিপ্লবী এবং তেন্সুয়েন-এর খণ্ডজাতীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে জনৈক সংখ্যালঘু রেড উপজাতীয় সর্দার। ফ্রন্টের অন্যতম সহ-সভাপতির সংগে আমার দেখা হয় নি। আর দেখা হয় নি যাঁদের সংগে, তাঁরা হলেন জনৈক চিকিৎসক, কারণ তিনি সে সময় অসুস্থ ছিলেন; ক্মের সম্প্রদায়ের দুইজন প্রতিনিধি, কারণ তাঁরা সে সময় ক্মের সংখ্যালঘু এলাকায় সফর করছিলেন এবং একজন অতি সম্মানিত নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, কারণ তিনি সে সময় ছিলেন বিদেশে। ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী ও শান্তি রক্ষার্থে গঠিত সায়গন-চোলোন কমিটিতে ছিলেন।

যে সর্বজনীন কারণ এঁদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছিল, তা হল, সায়গন শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ ও তার বদলে এমন এক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, যা বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করবে এবং ন্যূনতম গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত করবে। এ ছাড়া আশু করণীয় ছিল অনেক কিছু। স্বতঃস্ফূর্ত এবং বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিরোধাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল চারিদিকে। সেগুলোর সমন্বয়সাধন করা ছাড়াও, সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে সংগঠিত করে তাদের সামরিক তৎপরতাকে একটি কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের অধীনে আনা এবং একটি জা[illegible]য় আন্দোলন অনুপ্রাণিত তথা পরিচালিত করাও ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রথম কংগ্রেসে আরো বিশদ একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করা হয়। সেই কর্মসূচীতে স্থির হয় যে, বৈদেশিক ব্যাপারে স্বাধীন তথা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে; সমস্ত দেশের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে; নিঃসর্ত বৈদেশিক সাহায্য যে দেশই [illegible] না কেন, তা গ্রহণ করা হবে, এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপ[illegible]র সীমিত সংস্কারের নীতি অনুসরণ করা হবে।

হুয়েন হু থো আরো বলেছিলেন, "ফ্রন্টের নীতি যে কত উদার

এবং কোন্ কোন্ ধরনের শক্তি এর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করছে তার প্রতিফলন পাওয়া যাবে আমাদের কর্মসূচীতেই। যেমন, কৃষককে জমি দেবার সপক্ষে থাকলেও, নিয়মাবদ্ধভাবে জমি বাজেয়াপ্ত করায় আমাদের সম্মতি নেই। জমির কর হ্রাস করা হল আমাদের নীতি; কিন্তু দেশদ্রোহীদের, জমি ছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পত্তির উপর বর্তমান যে অধিকার, তা আমরা বহাল রাখতে চাই। যে সমস্ত জমিদার মার্কিন পুতুলদের সমর্থন করে নি, তাদের ভয় পাবারও কোনো কারণ নেই। শিল্প তথা অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলোর আর্থিক স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির উপর বিদেশীদের বৈধ অধিকার আমরা স্বীকার করি। সেই সংগে কিছুটা পরিমাণে বিদেশী লগ্নীতেও আমাদের আপত্তি নেই। সব চাইতে বড় কথা, মুক্তি ফ্রন্ট হল বাক-স্বাধীনতা, সমাবেশ-স্বাধীনতা ও চলাফেরার স্বাধীনতা—এই সমস্ত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতীক। এবং আমাদের মুক্তাঞ্চলগুলোতে এই সমস্ত মৌল স্বাধীনতা সত্য-সত্যই রয়েছে। বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের জনসাধারণ নির্বাচিত করে এবং সর্বাধিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের কাজ-কর্ম পরিচালনা করে। আসল কথা, জন্মলগ্ন থেকেই দেশপ্রেমিক সমস্ত শক্তির কাছ থেকে মুক্তিফ্রন্ট সমর্থন পেতে শুরু করেছিল।"

ফ্রন্টের সশস্ত্র বাহিনী হল তিন ধরনের: স্ব-প্রতিরক্ষী গেরিলা দল, আঞ্চলিক গেরিলাদল ও নিয়মিত সেনাবাহিনী। স্থানীয় ভিত্তিতে গ্রামের লোকদের নিয়ে স্ব-প্রতিরক্ষী গেরিলাদল গঠিত হয়। সাধারণতঃ দিবাভাগে তারা হল কৃষক এবং রাত্রে গেরিলা সৈনিক। নিজেদের গ্রামগুলোকে রক্ষা করা এই দলের প্রাথমিক কাজ হলেও, পথঘাট ধ্বংস করা এবং গ্রামের সন্নিকটস্থ শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধ করাও তাদের কাজের আওতার ভিতরে পড়ে। বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ও আদিম অস্ত্রশস্ত্রের উপরেই এরা প্রধানতঃ নির্ভরশীল।

আঞ্চলিক গেরিলা দল হল কিছুটা স্থায়ী ধরনের। বিশেষ কোনো অঞ্চল কিংবা এক বা একাধিক প্রদেশ থেকে এই দলের সৈন্য সংগ্রহ

করা হয় ; এবং সেই অঞ্চলের রক্ষার দায়িত্বও ন্যস্ত থাকে এই দলের উপরে। এদের প্রধান কাজ হল নিজ নিজ অঞ্চলে অবস্থিত শত্রু-বাহিনীর মোকাবিলা করা, শত্রুবাহিনীকে অকেজো করে দেওয়া ও নাজেহাল করা, শত্রুর সামরিক তৎপরতা ব্যর্থ করে দেওয়া ইত্যাদি।

শুরুতে নিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল প্রধানতঃ সশস্ত্র ধর্মীয় দলগুলোর অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে। কিন্তু কৃষকদের মধ্য থেকে দলে দলে নতুন রক্ত এসে একে শক্তিশালী করে তোলে। এই বাহিনীর কাজ হল, শত্রুর মোবাইল রিজার্ভ বাহিনীর মোকাবিলা করা, নিজ দায়িত্বে সামরিক অভিযান চালানো, শত্রু ঘাঁটি ধ্বংস করা, শত্রুর 'নির্মূল করা'র অভিযানের মোকাবিলা করা ইত্যাদি।

তুয়া হাই এবং অন্যান্য সামরিক অভিযানগুলোই দেখিয়ে দেয় যে, ফ্রন্ট গঠিত হবার সময় থেকেই তার সশস্ত্র বাহিনী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং সেই বাহিনীকে পরিচালনা করবার মতো দক্ষ নেতারও অভাব ছিল না। ১৯৬১ সালের সারা বছর ধরে দেশব্যাপী কৃষক অভ্যুত্থান হয়। সেই বিদ্রোহের মুখ্য রূপ ছিল নিজ নিজ গ্রাম থেকে দিয়েমী আমলাদের হটিয়ে সেই জায়গায় স্থানীয় নির্বাচিত ব্যক্তিদের বসানো। এই প্রসঙ্গে ত্রান নাম ক্রঙ একদিন আমাকে বলেছিলেন, "সবচাইতে বড় কথা, কৃষকশ্রেণী জেগে উঠেছিল ; তারাই হয়ে পড়েছিল গ্রামাঞ্চলের প্রকৃত প্রভু। এবং এর আগে যে ধরনের দমন-পীড়ন তাদের সহ্য করতে হয়েছে, সে সমস্তকে তারা চিরদিনের জন্য দূর করতে পেরেছিল। সায়গন কর্তৃত্বের অধিকাংশই ভেঙে পড়েছিল। 'সৌভাগ্য এলাকা' ('স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট'-এর আদি রূপ) থেকে ফিরে এসে কৃষকেরা আবার তাদের পুরনো খেত-খামারের চাষ ও বাগানের গাছ-পালা লাগানো শুরু করেছিল। এবং এবার তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে নিজেদের সম্পদ রক্ষা করতে হয়েছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি গ্রামে গড়ে উঠেছিল গেরিলা সংগঠন ; আর এই ভাবে দেশব্যাপী বিরাট আকারে শুরু হয়ে গিয়েছিল গেরিলা আন্দোলন।"

জ্যাপ আরো বলেছিলেন, "মুক্তাঞ্চলগুলোর ভিতরে 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' বসানোর কাজ দিয়েম শুরু করবার আগে, ১৯৬১ সালেই আমরা সায়গণ ও অন্যান্য মফঃস্বল কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর ঠিক আস-পাশেই ঘাঁটি স্থাপন করেছিল আমাদের সেনাবাহিনী।"

ততদিনে দিয়েমের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়েছে। এই কারণেই স্ট্যালে-টেলর পরিকল্পনার কাঠামোর ভিতরে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে 'বিশেষ ধরনের যুদ্ধ' শুরু করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আসরে অবতীর্ণ হবার সিদ্ধান্ত নেয়। উক্ত পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়গুলো ছিল :

(১) সপ্তদশ অক্ষরেখা এবং লাওস ও কম্বোডিয়া সীমান্ত বরাবর সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করে এবং বিমান থেকে রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে সমস্ত জংগল নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, একটি মানব বিহীন অঞ্চল সৃষ্টি করা ; আর এইভাবে মুক্তাঞ্চলগুলোকে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

(২) ১৬,০০০ 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' স্থাপিত করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশকে সেগুলোর ভিতরে আটক করে রাখা। এই ভাবে তাবৎ প্রতিরোধ শক্তিগুলোকে জন-সাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারবে বলে ওরা আশা করেছিল।

(৩) উপর্যুক্ত পরিকল্পনা দুটি কার্যকরী করে ফেলতে পারলেই ব্যাপক সামরিক অভিযান মারফত সমস্ত সংগঠিত প্রতিরোধ শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।

স্থির ছিল, পরিকল্পনার প্রথম অংশটিকে ১৯৬২ সালের শেষ নাগাদ সম্পূর্ণ করা হবে। কিন্তু জেনারেল পল হারকিন্সের অধীনে সায়গনে মার্কিন সামরিক কমাণ্ডের প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে ক্রমে ক্রমে ২৫,০০০ মার্কিন সামরিক 'উপদেষ্টা' ও 'শিক্ষক' আমদানী করা সত্ত্বেও, ঘটনাস্রোত কিছুটা ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা

দখলীকৃত এলাকা তথা জনসংখ্যার দিক থেকে ১৯৬১ সালকে যদি 'ফ্রন্টের বৎসর' বলা যায়, তা হলে ১৯৬২ সালকে সাধারণভাবে সায়গনের পক্ষে সু-বৎসর বলতেই হবে। ১৯৬১ সালের শেষভাগ থেকেই মার্কিন জনবল ও সাজ-সরঞ্জামের সাহায্য অবিরল ধারায় আসতে শুরু করেছিল। এবং সেই সাহায্য দিয়ে ফ্রন্টের সশস্ত্রবাহিনী-গুলোকে ধ্বংস তথা বিচ্ছিন্ন করতে; সায়গন ও অন্যান্য প্রাদেশিক রাজধানীর দ্বারপ্রান্ত থেকে ফ্রন্টের প্রভাব হটিয়ে দিতে এবং গ্রামাঞ্চলে দিয়েমের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বিরাটাকার প্রচেষ্টা চালানো হতে থাকে। দিয়েমী সেনাবাহিনী যখনই সড়ক অথবা নদীপথে চলাচল করত তখনই তারা গিয়ে পড়ত বিপর্যয়করী সংঘর্ষের মধ্যে। এই ধরনের সংঘর্ষ এড়াবার উদ্দেশ্যে এবং চলাচলের গতিবৃদ্ধির জন্য সায়গন কর্তৃক হেলিকপ্টার ও উভচর ট্যাংকের ব্যবহার প্রথমটা গেরিলাদের বেশ বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। 'বিশেষ যুদ্ধে'র ব্যাপারে আমেরিকা যে একমাত্র নতুন রণকৌশল আমদানি করেছে, তা'হল দ্রুত চলা-চলের ক্ষমতা। এবং গেরিলা যুদ্ধে এটা হল একেবারে নতুন জিনিস। এ ছাড়া, 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' স্থাপনের উদ্যোগ জনসাধারণের পক্ষে অতিরিক্ত এক উপদ্রবরূপে দেখা দেওয়া ছাড়াও, জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি সমস্যার বিষয়।

'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' হল এক বিচিত্র বস্তু। সারি সারি কাঁটাতার কিংবা বাঁশের বেড়া দিয়ে চারিদিক থেকে ঘেরা খানিকটা স্থান; প্রতিটি বেড়ার সারির মধ্যের অংশ মাইন-পূর্ণ পরিখা; বাইরে সৈন্য ঘাঁটির উদ্যত কামানের প্রহরা আর ভিতরে উৎকট যত গোয়েন্দাগিরি ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা—এই হল 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'। গ্রামাঞ্চলে আপন অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে দিয়েমের বিরাট আশা ছিল এই সমস্ত হ্যামলেটের উপর। আমেরিকার

সর্বাত্মক সমর্থন ছিল এই পরিকল্পনার পিছনে ; শত-শত কোটি ডলারও ব্যয় করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে। দেখে-শুনে মনে হয়েছিল, এ হল এক অসম এবং অসম্ভব যুদ্ধ। হেলিকপ্টার বাহিত সৈন্যবাহিনী ছোঁ মেরে নেমে আসছে ছোট্ট একদল সৈন্যের উপর, যাদের অর্ধেক অথবা তারও কম সংখ্যক লোকের কাছে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। জাল দিয়ে মাছ ছেঁকে তোলবার মতো, মানুষদের ধরে ধরে 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-এ পুরে রাখবার মতলবে প্রচুর রণসম্ভারে সজ্জিত সেনাবাহিনী নিয়ে চলেছে উভচর ট্যাংকের মিছিল ; কিংবা মেকং ব-দ্বীপের নদী অথবা খাল দিয়ে চলেছে সৈন্যবাহী জাহাজ, আর তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে কামানবাহী রণপোত। 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে দূরে রয়েছে সৈন্য ঘাঁটি। যে সমস্ত কৃষক কাঁটাতারের বেড়া কোনো রকমে এড়িয়ে পালিয়ে গেছে, তাদের খোঁজে, কিংবা সামরিক লক্ষ্য-বস্তুর সন্ধানে বোমা ও মেশিনগান সজ্জিত এরোপ্লেন সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথার উপর—এই হল 'বিশেষ যুদ্ধের' প্রকৃত চিত্র।

গ্রামবাসী ও প্রতিরোধ সংগ্রামী নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ করবার কাজে 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেটে'র পরিকল্পনা কাগজে-কলমে খুব কার্যকরী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এর ভিতরে ছিল এক মারাত্মক দুর্বলতা। জনসাধারণের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা নিষ্ক্রিয় ও নির্বিরোধী, তাদেরও এই পরিকল্পনা সায়গন-বিদ্বেষী করে তুলেছিল। পুরুষানুক্রমিক বসত ভিটা, চাষের জমি এবং পূর্বপুরুষের সমাধিস্থান, এ সমস্ত থেকে সাধারণ মানুষকে বলপূর্বক উৎখাত করা হয়েছিল। এশিয়াবাসীদের কাছে এ হল এক সাংঘাতিক ব্যাপার। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বন্দী শিবিরে না গেলে, কিংবা যেতে গড়িমসি করলে, তাদের চোখের সামনে দিয়েমী সৈন্যেরা ফলগাছগুলো কেটে ফেলেছে, পুকুর ভরাট করে দিয়েছে, আর বাড়ি-ঘরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে এই সমস্ত অত্যাচার। চলাচলের স্বাধীনতা ছিল না। কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে কৃষকেরা যেতে

পারত কেবলমাত্র বন্দীশিবিরের একেবারে লাগোয়া জমিতে চাষ-বাস করতে; এবং তাও দিবাভাগে। প্রতিটি ফটকে থাকত সশস্ত্র প্রহরা। বাইরে যাবার এবং ভিতরে আসার সময় প্রতিটি মানুষকে খানাতল্লাসী করা হত। সর্বক্ষণ তাদের বাস করতে হত দুর্বৃত্তদের দয়ার উপর নির্ভর করে।

ফ্রন্টের সংগঠকদের পক্ষে 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'গুলোর ভিতরে অনুপ্রবেশ করা কঠিন হলেও, একবার কোনো রকমে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে, প্রতিরোধ সংগ্রামের বীজ বপন করবার পক্ষে সেগুলো ছিল সর্বোত্তম ক্ষেত্র। কারণ, বাসিন্দাদের হৃদয়ে অহরহ জ্বলত দিয়েমী শাসন এবং তার পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি নিদারুণ ঘৃণার আগুন। বন্দীশিবিরে স্থানান্তরণের বিরুদ্ধে প্রতিটি ক্ষেত্রেই জনসাধারণ লড়াই করেছে। এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের বলপূর্বক নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রেও তারা লড়াই করেছে আবার বেরিয়ে আসার জন্য।

ব্যাপক সশস্ত্র প্রতিরোধ যে শুরু হয়ে গেছে, এ কথাটা ১৯৬২ সালের গোড়ার দিকেই সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের কৃষক সম্প্রদায় জেনে গিয়েছিল। আসলে এই জিনিসটাই চাইছিল তারা। এর পরই শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এক লড়াই। সায়গনের মুখ্য প্রচেষ্টা হল স্ট্যালে-টেলর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৬,০০০ 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' স্থাপন করা; এবং ফ্রন্টের প্রধান প্রচেষ্টা হল সেই পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেওয়া; আর সায়গন কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত হ্যামলেট স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল, সেগুলোকে ধ্বংস করবার ব্যাপারে জনসাধারণকে সাহায্য করা।

মধ্য ভিয়েতনামে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'গুলোর অন্যতম ছিল ফু ইয়েনের ডঙ জুয়ান জেলার কাইলো'র হ্যামলেটটি। লি ভ্যান চিয়েন কথা প্রসংগে একদিন আমাকে জানিয়েছিলেন যে, ওই বিশেষ হ্যামলেটটির উপর ফ্রন্ট প্রথম থেকেই অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। "কারণ, ওটিকে ভেঙে না দিলে, 'শত্রুপক্ষ এবং আমাদের'

উভয়েরই মনোবলের উপর তার প্রতিক্রিয়া হত খুব খারাপ। গাট্টাগোট্টা, মাথা ভরতি পাকা চুল, ষাটের প্রথম দিকে বয়স এবং ফ্রন্টের অন্যতম প্রবীণ তথা প্রথম সারির কর্মী লি ভ্যান চিয়েন হলেন সম্পূর্ণ মধ্য ভিয়েতনামের আঞ্চলিক কমিটির সদস্য। প্রসংগের জের টেনে বলেছিলেন, "মুশকিল হয়েছিল ভিতরে প্রবেশ করা নিয়ে। ওই জেলায় আমাদের কোনো গেরিলা ঘাঁটি ছিল না। তার উপর, হ্যামলেটটি ছিল বিশেষভাবে সুরক্ষিত এবং শক্তিশালী। স্ট্যালে-টেলর পরিকল্পনা অনুযায়ী ওটি ছিল একটি আদর্শস্থানীয় হ্যামলেট। ফলে, দিয়েমীরাও ওটিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেছে বেছে সমস্ত শক্তিশালী, কঠোর এবং বর্বর লোকদের নিযুক্ত করেছিল। আমরা জানতাম, ফটক খোলা হয় সকাল ৭ টায়। সর্বপ্রথম ফটক দিয়ে বাইরে বেরোয় মোষের পাল। পিঠের উপর তাদের থাকে বাচ্চা ছেলেরা। মোষগুলোকে চারণভূমিতে ছেড়ে দিয়ে, ছেলেরা সকালের জলখাবার খেতে আবার হ্যামলেট-এ ফিরে আসে। সুতরাং আমাদের কর্মীদের ভিতরে যাদের দেখতে সব চাইতে ছোট, বেছে বেছে তাদেরই নেওয়া হল এই কাজের জন্য। যথারীতি সেদিন মোষের পাল নিয়ে ছেলেরা বাইরে বেরিয়ে এলো। একটু বুঝিয়ে বলতেই আমাদের কর্মীদের সংগে পোশাক বদল করতে ওরা রাজী হয়ে গেল। তারপর হ্যামলেটে ফেরবার সময় এক একটি দলে ১০ জন করে ভিতরে প্রবেশ করল আমাদের ছেলেরা। প্রহরীদের চোখে তখনো লেগে ছিল ঘুমের রেশ। সুতরাং কেউ ব্যাপারটা খেয়াল করল না। আমাদের ছেলেরা সোজা চলে গেল প্রশাসনিক সদর দপ্তরে। দিয়েমী বড় কর্তারা তখনো সেখানে সুখ-নিদ্রায় বিভোর হয়ে ছিল। ছেলেরা ওদের সবাইকে চটপট বন্দী করে ফেলল। ওদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লেখা কাগজ-পত্র আমাদের কাছে ছিল। ব্যাপারটি সত্যই হয়ে দাঁড়াল খুব লাভজনক। মোট ১৩ জনকে আমরা পেলাম। ততক্ষণে হ্যামলেটের সমস্ত লোকজন এসে ভেঙে পড়েছে সেখানে। সবাই দেখল এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

তাদের উপর এতদিন যারা অকথ্য অত্যাচার করেছে, আজ সেই অত্যাচারী শাসকেরাই হাত-পা বাঁধা অবস্থায়, বিমর্ষ বদনে পড়ে আছে। আর, অতি বিনম্র প্রার্থনা জানাচ্ছে, জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে এবং দয়া ভিক্ষা করতে একটিবার যেন তাদের সুযোগ দেওয়া হয়।

"এই দৃশ্য দেখে সবাই সাশ্রু নেত্রে 'আমাদের জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে শুরু করে দিল। তারপর, সেই স্থানেই আয়োজন করা হল বিরাট এক জনসভার। হ্যামলেটের বাসিন্দারা প্রথমেই দিয়েমীদের অপরাধের বিরুদ্ধে আনতে লাগল একের পর এক অভিযোগ। যে সমস্ত মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, যাদের উপর দমন-পীড়ন চালানো হয়েছিল এবং ওই সমস্ত দুষ্কার্যের জন্য দায়ী দালালদের বিস্তারিত তালিকা ছিল বাসিন্দাদের কাছে। আমাদের তালিকার সংগে সেটি হুবহু মিলে গেল। গ্রামবাসীরা ওই ১৩ জনকেই হত্যা করার দাবি জানাতে লাগল। আমরা কিন্তু ফাঁসি দিলাম ৪ জনকে ; ৫ জনকে দিলাম জেলখাটার সাজা : আর বাকি ৪ জন ওই স্থানেই খোলাখুলিভাবে নিজেদের অপরাধ কবুল করে অনুতপ্ত হওয়ায়, ওদের ছেড়ে দেওয়া হল। হ্যামলেটের দিয়েমী সৈন্যদের আর লড়াই করবার মতো অবস্থা ছিল না। সবাই আত্মসমর্পণ করল। ওদের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল। তারপর ওই প্রকাশ্য জনসভায় জনগণের নির্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধির সাহায্যে আমরা জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্টের নামে একটি ভূমি সংস্কারের দলিল প্রস্তুত করলাম। কৃষকদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য জমির পরিমাণও স্থির করা হল। কিভাবে বণ্টন করা হবে, সে ভার ছেড়ে দেওয়া হল ওদেরই উপর ; এবং এই ব্যাপারে বিশেষ একটি কমিটিও গঠন করা হল। দলিলের ভিতর উল্লেখ থাকল যে, ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কৃষক ও জমিদারদের ভিতরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংগত একটি খাজনার হারও স্থিরীকৃত হল। মকুব করে দেওয়া হল সমস্ত বকেয়া খাজনা ও ঋণ। তারপর, নির্বাচিত একটি স্ব-প্রতিরক্ষী

দলের হাতে অধিকৃত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমরা অর্পণ করলাম।

"ঠিকই অনুমান করেছিলাম আমরা। ঘটনাটির কথা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। একই জেলার আরো ১৩টি 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-এর বাসিন্দারা আমাদের সাহায্য ছাড়াই বিদ্রোহ করে বসল। কাঁটাতার ও বাঁশের বেড়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সবাই ফিরে গেল নিজের নিজের পুরনো গ্রামে। তারপর তৈরী করল স্ব-প্রতিরক্ষী বাহিনী। এ সমস্ত ছিল ১৯৬২ সালের গোড়ার দিককার ঘটনা। সেই বৎসরেরই মার্চ মাসে দিয়েমীরা পুরো এক ডিভিশন সৈন্য নিয়ে সর্বপ্রথম তাদের বিখ্যাত 'সী সোয়ালো' সামরিক অভিযান শুরু করে, এবং ঘোষণা করে যে, এক মাসের মধ্যেই তারা 'ভিয়েতকং'দের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিছু কিছু গ্রামের লোকদের ওরা অবশ্য আবার 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-এ নিয়ে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ওই সেনাবাহিনী চলে যেতেই, গ্রামবাসীরা আবার সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে।"

উদার হাসি হেসে চিয়েন আবার বলেছিলেন, "১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে সায়গন কমাণ্ড তাদের '৫৫ নং সামরিক অভিযান' শুরু করে। 'সী সোয়ালো' অভিযানের পর এটি ছিল ৫৫ তম সামরিক অভিযান। কিন্তু সেটাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এবং ওদের প্রথম অভিযান শুরু হবার পর থেকে আমরা সারা প্রদেশের প্রতিটি জেলায় ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে বহু সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করেছি। উত্তর-দক্ষিণে ওদের যত সড়ক ও রেলপথ রয়েছে, সমস্ত গেছে আমাদের ঘাঁটির ভিতর দিয়ে। ইচ্ছা করলেই ওদের রেলগাড়িগুলো আমরা ধ্বংস করে দিতে পারি। কিন্তু যে সমস্ত গাড়িতে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্য চলাচল করে, কেবলমাত্র সেইগুলোই হল আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।"

যে ধরণের সংগ্রাম কু-ইয়েন'এ হয়েছিল, সে রকম অবশ্য সব জায়গায় হতে পারে নি। মধ্য ভিয়েতনামের ভূ-প্রকৃতি গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। তথাপি সমতল মেকং ব-দ্বীপ

অঞ্চলের তুলনায়, মধ্য ভিয়েতনাম হল আদর্শস্থান। কারণ মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে পাহাড়-পর্বত একেবারে নেই। জংগল বলতে যা রয়েছে, তা'হল উপকূলবর্তী অঞ্চলের জনবসতিহীন জলাভূমিতে গরান গাছের বন। ১৯৬২ সালে হেলিকপ্টার-বাহিত শত্রু বাহিনী প্রতিরোধ সংগ্রামীদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হবার দরুণ, এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে, ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে প্রতিরোধ তুলে নেবার এবং ফ্রন্টের নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে পার্বত্য অঞ্চলের মূল ঘাঁটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন। এই প্রসংগে ফ্রন্টের জনৈক সামরিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাকে বলেন, "কিন্তু গভীর আলোচনার পর আমরা অন্তরে উপলব্ধি করলাম যে, ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে একবার সরে এলে আর কখনো সেখানে ফিরে যাওয়া যাবে না। তার অর্থ হবে, সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী অঞ্চলটিকেই পরিত্যাগ করে চলে আসা। কারণ, ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের এবং ১৯৪৫ সালের প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামের পীঠস্থান ছিল ওই অঞ্চল। ব-দ্বীপ এলাকার লক্ষ লক্ষ কৃষক আমাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ন্যস্ত করেছে। আজ তাদের ফেলে চলে আসার অর্থই হবে প্রচণ্ড পরাজয় বরণ করে নেওয়া।

এক হিসাবে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ১৯৬২ সালের শেষ ভাগের পরিস্থিতি ফ্রন্টের পক্ষে ছিল সংকটজনক। দিয়েম তাঁর পরিকল্পিত ১৬,০০০ 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' স্থাপন করতে না পারলেও, বেশ কয়েক হাজার 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' স্থাপন করেছিলেন; এবং এক বৎসর পূর্বেও সম্পূর্ণরূপে ফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণে ছিল এমন বহু অঞ্চলে কোনো-না-কোনো রকমে তথাকথিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্থাপিত হ্যামলেটের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অবশ্য কঠিন। তবু মনে হয়, প্রায় ৮,০০০-এর মতো 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' স্থাপন করতে দিয়েম সক্ষম হলেও, কোনো সময়েই একবারে চার হাজারের বেশী হ্যামলেটের অস্তিত্ব থাকে নি। আসলে

'দড়ি টানাটানি'র লড়াই থামে নি কোনো সময়েই। কখনো বা হ্যামলেটের বাইরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে; কখনো আবার সব কিছু সম্পূর্ণ হতে না হতেই, সেই রাতেই কৃষকেরা নিজেরাই ধ্বংস করে দিয়েছে সবকিছু; আর দোষ চাপিয়েছে 'ভিয়েতকং'দের উপর। সেই সংগে তারা দিয়েমী কর্তৃপক্ষের কাছে অনুযোগ করেছে: "কেন আপনারা আমাদের রক্ষা করবার কোনো ব্যবস্থা করেন নি?" দশ অথবা পনের বার ধ্বংস করা হয়েছে, এমন হ্যামলেটের কথাও আমি শুনেছি। বেড়া আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাদি নতুন করে তৈরী করবার ব্যাপারে কৃষকেরা কাজ করেছে খুব ধীরে-সুস্থে; কিন্তু সেগুলো ভেঙে ফেলার ব্যাপারে কাজ করেছে বিদ্যুৎগতিতে। এই ভাবে তারা ভোগ করেছে মাত্র কয়েক দিন কিংবা কয়েক সপ্তাহের মুক্তি। এলাকা তথা জনসংখ্যার দিক থেকে ১৯৬২ সালে দিয়েম অনেক পিছনে সরে এসেছিলেন; জনসমর্থন আদায় করার ব্যাপারে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন প্রচণ্ড ভাবে। সামরিক পরিভাষা অনুসারে, মার্কিন-দিয়েমী বাহিনী একাধিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে এবং সামরিক গুরুত্ব তথা কৌশলগত উদ্যোগে অগ্রগামী হয়। কিন্তু ১৯৬৩ সাল শুরু হতেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হল নাটকীয়ভাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বিশ্বব্যাপী যে সমস্ত গেরিলা-বিরোধী সামরিক তৎপরতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মার্কিন-সায়গন কমাণ্ড সেইগুলোর অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছিল 'প্রতি-বিদ্রোহ' রণ-কৌশল রচনার ব্যাপারে। অর্থাৎ, ১৯৪৬ সালে গ্রীসে জেনারেল ভ্যান ফ্লিটের অভিজ্ঞতা হতে শুরু করে, ফিলিপিনে হুকবালাহাপ-দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমেরিকার বিপর্যয়; কেনিয়া ও মালয়ে ব্রিটিশদের এবং চীনে কুওমিনতাংদের বিপর্যয় ও গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযানে সর্বপ্রথম হেলিকপ্টার ব্যবহার করা সত্ত্বেও আলজেরিয়া ও ইন্দোচীনে ফরাসীদের দুরবস্থা—এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিল তারা। কিন্তু মুক্তি ফ্রন্টও পিছিয়ে থাকে নি। বিদেশস্থিত প্রতিনিধিদের মারফত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা

চীন, কোরিয়া, কিউবা ও আলজেরিয়ার অভিজ্ঞতা নিজেদের কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছিল। মালয়ের বন্দীশিবির গ্রামগুলো থেকে লব্ধ ব্রিটিশদের অভিজ্ঞতা এবং আলজেরিয়ায় 'সেন্টার্স্ ডি রিগ্রুপ্মেণ্ট' ও হেলিকপ্টার-বাহিত সৈন্য বাহিনী থেকে লব্ধ ফরাসীদের অভিজ্ঞতা যদি মার্কিন কমাণ্ডের পক্ষে মূল্যবান হয়ে থাকে, তা'হলে আলজেরিয়ায় এম. এল. এন. কর্তৃক উদ্ভাবিত হেলিকপ্টারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কৌশলও মুক্তি ফ্রন্টের পক্ষে কম মূল্যবান হয় নি। সুতরাং, সারা বিশ্বের গেরিলা তথা প্রতি-গেরিলা যুদ্ধের সমস্ত অভিজ্ঞতা দক্ষিণ ভিয়েতনামের এই অতি বিশেষ ধরনের যুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছিল।

ক্ষমতা দখলের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক লড়াইয়ে, ১৯৬১ সালকে যদি 'ফ্রন্টের বৎসর' এবং ১৯৬২ সালকে 'দিয়েমের বৎসর' বলে মনে করা হয়, তবে ১৯৬৩ সালকে কোন্ পক্ষের বৎসর বলা হবে তা 'আপ বাক'-এর যুদ্ধই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করেছিল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সবিস্তারে উল্লিখিত এই যুদ্ধ ছিল এক সন্ধিক্ষণ। এবং ঘটনাচক্রই প্রমাণ করেছিল যে, ১৯৬৩ সাল শেষ হবার আগেই, দিয়েমের কর্তৃত্ব বলতেআর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

তৃতীয় খণ্ড

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অতি অসাধারণ যুদ্ধ—শত্রু-সৈন্য সম্বন্ধীয় নীতি

রাতটি ছিল অতি মনোরম। প্রায় পূর্ণচন্দ্রকে মনে হচ্ছিল বুঝি বাঁশ পাতার নয়নাভিরাম ফ্রেমের মধ্যে আঁটা রয়েছে। অন্ধকারের ভিতরে যেখানে-যেখানে চাঁদের আলো এসে পড়ছিল, সেখানে-সেখানে চক-চক করছিল বাঁশ ঝাড়ের পাতা। সম্পূর্ণ দৃশ্যটি দেখাচ্ছিল উজ্জ্বল, দীপ্তিময় একখানি ভিয়েতনামী তৈল চিত্রের মতো। মুগ্ধ, মগ্ন হৃদয়ে বসেছিলাম সেই দিকে চেয়ে। সহসা গাইড সাবধানী সংকেত করলেন। আমাদের ছোট্ট সামপানের সংগে সংযুক্ত মোটরটিকে সংগে সংগে বন্ধ করে দিয়ে, দ্রুতগতিতে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হল নদীতীরবর্তী বাঁশ ঝাড় অভিমুখে।

বিপরীত দিক থেকে বেশ কয়েকটি মোটরের আওয়াজ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে শোনা গেল। পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াল বেশ ঘোরালো। অথচ এই স্থানটিকে 'নিরাপদ' অঞ্চল বলেই আমরা জানতাম। যাই হোক, চটপট নিভিয়ে ে প হল জ্বলন্ত সিগারেটগুলো। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে থাকবার আদেশ হল সবার উপর। কয়েক মিনিটের ভিতরেই প্রায় ৫০০ গজ দূরবর্তী নদীর বাঁকের মুখে আবির্ভূত হল দুই সারিতে বিভক্ত অনেকগুলো সামপানের প্রথম দুটি সুদীর্ঘ সারি। বাঁক ঘুরে প্রথম সারি দুটি ক্রমশঃ এসে পড়ল আমাদের আত্মগোপন-স্থানের বিশ-ত্রিশ গজের মধ্যে। কিন্তু অনেক আগে থেকেই আমাদের কানে এসেছিল নারীকণ্ঠের আওয়াজ। আর একটু কাছে আসতেই বাঁশ পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলাম সামপানগুলোতে রয়েছে মহিলা ও তরুণীদের বিরাট একটি দল। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে একটি করে লাঠি; আর সেই লাঠির মাথায়

ফ্রেমে আটকানো রয়েছে লাল ও কালো কালিতে নানান ধরনের স্লোগান লেখা কাগজ। কোনো কোনো সামপানে আবার দুটি লাঠির মাথায় স্লোগান ছাপা একখণ্ড কাপড় টানা করে আড়াআড়িভাবে আটকে রাখা হয়েছে সামনের দিকে।

এতক্ষণে আমাদের সামপানটি আবার মাঝ দরিয়ায় বেরিয়ে এল। মোটরটি পুনরায় চালু করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল সরস অভিনন্দনের আদান-প্রদান। ধীরে ধীরে আমরা সেই সামপান-বহর পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকলাম। যে-ভাবে সবব অভিনন্দন এবং সেই সংগে উচ্চ হাসির রোল চলল, তাতে বেশ বোঝা গেল যে আমরা যথার্থই 'নিরাপদ' অঞ্চলে রয়েছি। দোভাষী আমায় জানালেন, "বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিতে ওবা জেলা সদবে চলেছে। ওই সামপানগুলোতে রয়েছে গোটাছয়েক গ্রামেব মানুষ। এছাড়া আরো বহু দল বিভিন্ন দিক থেকে নদী ও সড়ক-পথে রওনা দিয়েছে।"

—"এত রাতে ?"

—"এরোপ্লেনের নজর এড়াবার জন্য ওদের রাতের বেলাতেই চলাফেরা করতে হয়। তা'ছাড়া, ওদের উদ্দেশ্য হল ভোরেব আগেই শহরে পৌঁছান। কারণ মিছিলের বিরুদ্ধে আদেশাদি দেবার জন্য কর্তৃস্থানীয় কেউই তখনো ঘুম থেকে উঠবে না।"

বিক্ষোভ মিছিলেব কারণ জানতে চাইলাম। দোভাষী সামপান-যাত্রীদেব সংগে আবার কয়েকটি কথা-বার্তা বিনিময় করে আমাকে ব্যাপারটি জানালেন। কয়েকদিন আগে এই জেলারই একটি গ্রামের উপরে বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল। তার ফলে একটি নতুন স্কুলবাড়ি ও লাইব্রেরি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় লোক-জন অবশ্য কেউ মারা যায় নি। তবু জনসাধারণের সম্পত্তি বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে ওরা প্রতিবাদ জানাতে চলেছে। কারণ স্কুল এবং লাইব্রেরি গ্রামবাসীরাই প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর, অন্যান্য স্থান থেকে লোকেরা যাচ্ছে—'ঐক্যের খাতিরে' এবং সাধারণভাবে বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। আমার অনুরোধক্রমে দোভাষী ওই স্লোগানগুলোর

কয়েকটির অনুবাদ করে শোনালেন। 'জনসাধারণের, সরকারী এবং জনতার সম্পত্তি'র ক্ষতি-সাধন বন্ধ করার দাবি ছাড়াও অন্যান্য স্লোগান ছিল এই ধরনের : 'সেনা বিভাগে কর্মরত আমাদের ছেলেদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে'; 'সৈনিকদের নিয়মিত ছুটি দিতে হবে'; 'আহত সৈনিকদের পেনসন দিতে হবে'; 'সামরিক কার্যকলাপে নিহত ও আহত সৈনিকদের মাতা ও স্ত্রীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে'; 'সৈন্য বিভাগে প্রহারের নিয়ম রদ করতে হবে', ইত্যাদি।

প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু ওরা তো মুক্তিফ্রন্ট অঞ্চলের বাসিন্দা?"

আমার ওয়াকিবহাল সাংবাদিক—দোভাষী হুইন স্বীকার করলেন, "হ্যাঁ।"

—"আর ওরাই বেতন বৃদ্ধির দাবি করছে সেই সমস্ত সৈনিকদের যারা ওদের উপর গুলি চালায় আর বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়?"

জবাব এল, "হ্যাঁ তাই। প্রথমতঃ, জনসাধারণ কখনই নিজেদের 'ভিয়েতকং' বলে স্বীকার করে না। ওদের দাবি হল, ওরা সবাই সায়গন সরকারের অনুগত প্রজা, এবং 'আইনানুগ সরকারকে' সর্ববিধ ব্যবস্থা করতে হবে ওদের রক্ষার জন্য। আশে-পাশে যদি 'ভিয়েত-কং'রা থাকেও, তা'হলে সেটা সম্ভব হয়েছে 'আইনানুগ' সরকার সেখান থেকে পালিয়ে গেছে বলেই। এ ছাড়া, পুতুল-সৈন্যদের সহানুভূতি অর্জন করাটাও হল ফ্রন্টের নীতি। এই ধরনের সমস্ত স্লোগান সৈনিকদের ভাবিয়ে তোলে। ওরা ভাবতে শুরু করে যে, উন্নততর অবস্থার জন্য ওদেরও সংগ্রাম করা উচিত। এ সমস্ত ছাড়া, আর একটি দিকও রয়েছে। সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে সেটা হল খুবই ফলপ্রসূ। সৈন্যেরা যখন দেখে যে স্লোগানগুলোর অর্ধেকই হল তাদের মংগলের জন্য, তখন তাদের পক্ষে কোন প্রতিবাদ মিছিল দমন করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।"

হুইন আরো বলে যান, "এটা শুধু মাত্র কৌশল নয়; তার চেয়েও বেশী। এই ধরনের সমস্ত ব্যাপারের জন্য ফ্রন্টের একটি সর্বাত্মক নীতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সৈন্যরা শত্রুপক্ষের চাকরি করতে

গিয়ে মারা গেছে ; অথচ তাদের পরিবার রয়েছে আমাদের এলাকায়। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা তাদের বাস্তব সাহায্য প্রদান করে থাকি। এই বিষয়ে দেখাশুনা করবার জন্য আমাদের একটি বিশেষ সংস্থাও রয়েছে। তারা নিহত সৈনিকদের পরিবারবর্গের সংগে দেখা করে কি ধরনের বাস্তব সাহায্য দেওয়া দরকার, সে সম্বন্ধে সুপারিশ করে থাকে।"

ততক্ষণে শেষ সামপানটিকে পিছনে ফেলে আমরা চলে এসেছি। নদী এবং চাঁদ আবার নিবিড় হয়ে ফিরে এল আমাদের কাছে। পূর্ব প্রসংগের জের টেনে, রাজনৈতিক কৌশল ও পন্থা এবং সামরিক-রাজনৈতিক যুক্ত সংগ্রামের আরো কতগুলো ঘটনার বিবরণ দিতে হুইনকে অনুরোধ করলাম।

একটু ভেবে হুইন বললেন, "এমন বহু সৈন্য ঘাঁটি রয়েছে যেগুলোকে খুব সহজেই আমরা ধ্বংস করে ফেলতে পারি। সৈন্যরা যদি গুলি না চালিয়ে আর লুঠ-তরাজ না করে জনতার বক্তব্য শোনে তা হলে আমরাও গুলি চালাই না। কিন্তু ওরা গুলি চালালে, আমরাও চালাই ; এবং জয়লাভও আমরাই করি। বস্তুতঃ আমাদের একমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা ছাড়া, প্রায় সবাই এই ধরনের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। আলোচনা সভা চলে সারা দিন-রাত। তত্ত্বগতভাবে স্থানীয় জনসাধারণের সংগে মেলামেশা করা সায়গন সৈন্যদের পক্ষে নিষিদ্ধ ; এমন কি তাদের আত্মীয়-স্বজনের সংগেও। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যোগাযোগ থাকে সব সময়েই। বিগত বছর দুয়েক ধরে সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টির মাত্রা দেখে বড় কর্তারা এত বিচলিত হয়ে পড়েছে যে, গ্যারিসনগুলোকে প্রতি তিন মাস অন্তর বদলী করা হয়। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয় না। কারণ এক অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে গেলেও, সেখানকার জনসাধারণ পূর্বেকার ঘাঁটির আরব্ধ কাজ সেখানেও শুরু করে দেয়।

"আসলে আমাদের লোকেরা শত্রুর ভিতরেই বাস করে। নিজেরাই তারা ভূমি-সংস্কার ও অন্যান্য বহু কাজ করেছে। শত্রু-

সৈন্যরা সবাই হল আসলে কৃষক। জোর করে ধরে এনে তাদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছে। এই সমস্ত সৈনিক যখন চারিদিকের স্বাধীন, মুক্ত জীবনযাত্রা স্বচক্ষে দেখে, তখন কি তাদের মনের ভিতরে কোনো রকম চাঞ্চল্য হয় না বলে আপনি মনে করেন? বিশেষ করে যখন সৈন্যঘাঁটির একেবারে ফটক অবধি বিস্তৃত মাঠে কর্মরত সহকর্মী কৃষকেরা এই স্বাধীন, মুক্ত জীবনের জয়ঢাক অনবরত তাদের কানের কাছে পিটোতে থাকে। আমাদের বহু মুক্ত অঞ্চল শত্রু-ঘাঁটির একশ' গজ দূরত্ব অবধি বিস্তৃত। সেই সমস্ত ঘাঁটির সৈন্যদের বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত সরবরাহের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রায়শই নিক্ষিপ্ত ওই সমস্ত জিনিসপত্র পড়ে আমাদের এলাকায়। ওরা এসে সেই সমস্ত জিনিস যাতে না নিয়ে যেতে পারে, সে ব্যবস্থা আমরা ইচ্ছা করলেই করতে পারি। সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারি ওদের। কিন্তু আমরা তা করি না। বরং ওদের দু-তিন জনকে এসে নিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে দিই। তবে, প্যারাসুটগুলো আমরা রেখে দিই। আমাদের এই মনোভাব ওরা বোঝে। ভিয়েতনামীরা ভিয়েতনামীদের হত্যা করবে এটা আমরা চাই না। আমরা যে এর বিরুদ্ধে সে কথাটা সদাই আমাদের আচার-আচরণে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে থাকি। তাই ওরাও আমাদের 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' এই মনোভাব গ্রহণ করেছে। ওদের যে জোর করে সেনা-বাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছে, সে কথা আমরা বুঝি। দিয়েমের চাকরি করা ছাড়া ওদের আর গত্যন্তর নেই। আর এটাও ঠিক যে, আমাদের সংগে যুদ্ধ করতে ওদের বাধ্য করা হোক এবং ওরা মারা যাক, সেটাও ওই সৈন্যরা চায় না।"

হুইনের কাছে আরো শুনলাম, "ছুটির দিনে গ্রামবাসীরা সৈনিকদের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করে। খুব একটা আন্তরিকতা না দেখালেও, ভদ্রভাবে, মুক্তাঞ্চল সম্বন্ধে ওদের কাছে সব কিছু ব্যাখ্যা করে। কখনো কখনো ফল, কেক কিংবা ছোট-খাটো উপহারও নিয়ে যায়। সেই সংগে সৈন্যদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে, ওরা গ্রামে গিয়ে

'সদর রাস্তা' ছাড়া এদিক সেদিক যদি না যায়, এবং গুলি চালাবার অথবা লুঠ-তরাজের মতলব ত্যাগ করে, তা'হলে কোনো গণ্ডগোল হবে না। বরং ওদের স্বাগত জানানো হবে ; চা দিয়ে আপ্যায়িতও করা হবে। কিন্তু সদর রাস্তা ছেড়ে অনাহুতভাবে ওরা যদি বাড়ি-ঘর, শুয়োর কিংবা মুরগির খোঁয়াড়, ফলের বাগিচা ইত্যাদির দিকে যায়, তা'হলে ফাঁদে পা বাড়িয়ে কেবলমাত্র বিপদের মধ্যেই গিয়ে পড়বে। আর, গুলি চালাতে শুরু করলে, বিপদ হবে আরো বেশী। সেদিন না হলেও, হবে অন্য যে-কোনো দিন। ঘাঁটির বাইরে পা দিলেই বিপদে পড়বে ওরা। কথাগুলো যে কতখানি খাঁটি, সেটা সৈন্যেরা নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ভালো করেই জানে।

"গ্রামবাসীদের মধ্যে কারা যে 'সক্রিয় কর্মী' সেটা গ্যারিসনের বড় কর্তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানা থাকে। ঘাঁটির পর্যবেক্ষণ মঞ্চগুলো তৈরী করা হয় খুব উঁচু করে। তার উপর ওদের রয়েছে উন্নত ধরনের দূরবীণ। কে পোস্টার সাঁটছে, কে দেয়ালে-দেয়ালে স্লোগান লিখছে, কে জনসভায় বক্তৃতা করছে, এ সমস্তই ওরা দূরবীন দিয়ে সব সময় দেখে। কিন্তু এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কোনো টহলদারী দল পাঠালেই গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জবাব আসবে : 'ভিয়েতকং ? তা কিছু কিছু এখানে নিশ্চয়ই আছে। ইচ্ছা করলে, এসে ওদের গ্রেপ্তার করতে পারেন তবে, আসলে কিন্তু ওরা কোনো ক্ষতি করে না। বরং ওদের গ্রেপ্তার করতে গেলে যদি বুলেটের ঝাঁক ছুটতে শুরু করে, সে ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষেরাই আহত হতে পারে। আহত আপনিও হতে পারেন। কারণ সামরিক প্রশিক্ষণ ওরা ভালভাবে পেয়েছে বলেই মনে হয়।' আর, সত্য-সত্যই যদি সৈন্যেরা আসে, আর কাউকে হত্যা করে, তা হলে সম্পূর্ণ গ্রামের লোক একত্রিত হয়ে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল করে সেই মৃতদেহ নিয়ে সৈন্যঘাঁটিতে গিয়ে হাজির হবে। ঘাঁটির সৈন্যদের হাব-ভাবে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবে যে, এরপর বাইরে বেরুলেই তাদের হবে সত্যকারের বিপদ। ফ্রন্টের শিক্ষায় সুশিক্ষিত

গ্রামবাসীরা জানে যে, এর বেশী অগ্রসর হওয়া হবে অনুচিত; প্ররোচনা দ্বারা ঝঞ্ঝাট ডেকে না এনে, কার্য হাসিল করতে হবে কৌশল দ্বারা। গ্রামবাসীরা ফ্রন্টকে নিয়মিতভাবে সাহায্য প্রদান করে; বেশীর ভাগই দেয় ধান। যাই ওরা দিক না কেন, আমরা তার জন্য রসিদ দিয়ে থাকি। ওরা আবার সেই রসিদ নিয়ে ঘাঁটিতে গিয়ে সৈন্যদের দেখিয়ে বলে: 'এই দেখ; 'ভিয়েতকং'রা কাল রাতে এসে জোর করে আদায় করে নিয়ে গেছে। আর বলেছে, আমেরিকানদের দূর করে দেশকে মুক্ত করবার জন্য এগুলো নাকি প্রয়োজনীয়। আমরা দিতে বাধ্য হয়েছি; আর কোনো উপায় ছিল না।' বলা বাহুল্য, এই ধরনের কথা সৈনিকদের হৃদয়ে আরেকটি নাড়া দিয়ে যায়।"

হুইন বলে যান, "এই ধরনের কৌশল যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সমস্ত সম্ভবপর হবার একমাত্র কারণ হল, জনসাধারণ সায়গন সরকারের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং আদর্শগত সমস্ত কিছুর বিরোধী হলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে তারা এখনো শত্রু-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বসবাস করে। সুতরাং, আত্মরক্ষার খাতিরে তাদের সঠিক আইনসম্মত একটি পরিস্থিতি বজায় রেখে চলতেই হয়। তাই সৈন্য ঘাঁটির অফিসারদের কাছে গিয়ে ওই ধরনের সমস্ত কথা বলতে ওদের আমরা বরং উৎসাহিতই করে থাকি। যে ধরুন, কেউ হয়ত বলবে: হ্যাঁ, আমাদের গ্রামে গেরিলা রয়েছে। আমার স্বামী একজন গেরিলা; আমার পুত্রও গেরিলা। হ্যাঁ, ওদের কামানও রয়েছে। কিন্তু গেরিলা দলের শক্তি কত, কিংবা কামানগুলো কোথায় লুকানো আছে, এ সমস্ত প্রশ্নের জবাবে তারা স্রেফ অজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আগে এ ধরনের স্বীকারোক্তি কেউ করলে, তাকে হত্যা করা হত। কিন্তু চরম দুর্দান্ত অত্যাচারীদের সায়েস্তা করে দেবার পর থেকে, পরিস্থিতি বদলে গেছে। এখন তাই এই ধরনের স্বীকারোক্তি করা সম্ভবপর। তাই কিছু কিছু তথ্য শত্রুপক্ষকে জানাতে আমরাই গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করি। প্রচারকার্য হিসাবে

এটা খুবই ফলপ্রসূ। তবে কেউ যাতে কখনো দলগত শক্তি অথবা অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থান সম্বন্ধে কোনো কিছু না বলে, সে বিষয়ে আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়।

"সশস্ত্র প্রতিরোধ যখন প্রথম শুরু হল, তখন গ্রামবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই নিজেদের ছেলেদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে গেরিলাদের সংগে যোগদানে উৎসাহিত করত। শত্রুপক্ষ তখন শুরু করল পলাতক পুত্রের পিতাদের ধরে ধরে গুলি করে মারতে। এর মোকাবিলা আমরা করলাম প্রতিবাদ দিয়ে। আমাদের পাল্টা দাবি হল, দিয়েমী সৈন্যরাই আমাদের ছেলেদের ধরে নিয়ে গেছে, অথবা হত্যা করেছে। এমনও দেখা গেছে যে, ছেলে হয়তো দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে যাবে গেরিলাদের সংগে যোগদান করতে। অর্ধেক রাত অবধি জেগে মা ছেলের কাপড়-জামা ঠিক করল; খাবার তৈরী করে দিল, তারপর ভোর রাতে রওনা করে দিল তাকে। এবং কয়েক ঘণ্টা পরে নিজেই বিলাপরত মহিলাদের একটি মিছিলের নেতৃত্ব করে জেলা অধিকর্তার কাছে গিয়ে ছেলের 'গ্রেপ্তারের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করল। অথবা, গ্রামে নিরাপত্তা নেই বলেই 'ভিয়েতকং'রা এসে ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়— এই অভিযোগ করে দাবি জানাল যে, ঘাঁটির অধিনায়ক যেন তার ছেলেকে 'উদ্ধার' করবার জন্য অবিলম্বে একটি টহলদারী দল পাঠান। এই ধরনের ব্যাপারগুলোতে জনসাধারণের উদ্যম ও দক্ষতার কোনো তুলনা নেই।"

হুইন আরো জানালেন যে, প্রতিটি গ্রামে, এমন কি সায়গন-নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলোতেও বিশেষ ধরনের সমস্ত প্রোপাগাণ্ডা দল রয়েছে। বিপদ এড়িয়ে এবং শত্রুর আঘাত করবার ক্ষমতা বিনষ্ট করে দিয়ে 'উদ্দেশ্য' সিদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা কি, তা নিয়ে এই সমস্ত দল পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে থাকে।

মাথার উপরে উজ্জ্বল তারকাখচিত আকাশ। সামপানের উপরে শুয়ে আছি দু'জনে। কানে আসছে নদীর কলধ্বনি আর সামপানের

মোটরের একটানা যান্ত্রিক আওয়াজ। হুইন আবার বলেন, "যেমন, গ্রামের সবাই যে ফাঁদ তৈরীর কাজে অংশ গ্রহণ করে সে কথা শত্রু-পক্ষ জানে। কিন্তু এই বিষয় কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই জবাব আসবে: 'হ্যাঁ, ভিয়েতকংরা আমাদের দিয়ে জোর করে করায়। বাধ্য হয়ে আমাদের করতেই হয়।' ফাঁদগুলোর অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, ওরা দু'একটা দেখিয়েও দেবে। কিন্তু প্রধান প্রধান ফাঁদের অবস্থান কখনই জানাবে না। হয়তো কয়েকটা বর্শা দেখিয়ে বলবে: 'এগুলো ওরা বাতিল করে দিয়েছে। কোনো পারিশ্রমিকও আমাদের দেয় নি। ভাল ভাল বর্শা সব ওরা নিয়ে গেছে।' একটি কথা অবশ্য ঠিক। এই ধরনের সমস্ত জবাব গ্রামবাসীরা দিতে পারে শুধুমাত্র আমাদের বর্তমান শক্তি-সামর্থ্যের কারণেই। কিন্তু পূর্বেও যখন নির্বিচার হত্যা, লুঠতরাজ, গুণ্ডামি ইত্যাদি সমস্ত রকম বর্বরতা অবাধে চলত, তখনো সাধারণ মানুষ নিজেদের আইনগত পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছে; এবং ঘোষিত সরকারী নীতির উপরেই নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছে। জেলা অধিকর্তার কাছে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 'সায়গন সরকারের নীতিবিরুদ্ধ' কাজ করার অভিযোগ এনেছে তারা। শুধু তাই নয়। দাবি করেছে, তাদের অভিযোগ যেন জাতীয় পরিষদে, এমন কি সরকারী মন্ত্রীদের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই কারণেই বেশ কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী বদলী হয়; এবং এই ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দরুন অন্যান্যরাও সাবধান হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত ফল লাভ হতে থাকে তখনই, যখন জনগণ নিজেরাই নিকৃষ্টতম উৎপীড়কদের ধরে-ধরে শাস্তি দিতে শুরু করে।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেন, "এই ধরনের কাজ কখনই ব্যর্থ হয় না। বরং, অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যাপারে শত্রুর যে ব্যাপক গরিষ্ঠতা রয়েছে, সেটাকেও পুষিয়ে দিতে অনেকখানি সাহায্য করে।" এই প্রসংগে অতীতের কথা উল্লেখ করলেন হুইন। তখনো সশস্ত্র প্রতিরোধ এমন ব্যাপক আকারে আরম্ভ হয়নি। সেই সময় কিছুকাল

তিনি মধ্য ভিয়েতনামের উপকূলবর্তী সমতল এলাকায় কাজ করেছিলেন। বললেন, "সে সময় আমাদের কাছে কোনো রকম অস্ত্র-শস্ত্রই ছিল না। কিন্তু জানতাম, পার্বত্য এলাকার খণ্ডজাতীয় লোকেরা আত্মরক্ষার লড়াই শুরু করে দিয়েছে। ওদের শায়েস্তা করবার জন্য সরকারী সৈন্যদল আমাদের এলাকার ভিতর দিয়েই যাতায়াত করত; আর সেই সুযোগে জনসাধারণও সৈন্যদের ভিতরে চালিয়ে যেত নিজেদের কাজ। সৈন্যরা যাতে খণ্ডজাতীয় মানুষদের উপর কোনোরকম দমন-পীড়ন না করে, সে সম্বন্ধে তাদের সুকৌশলে সাবধান করে দিত। কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তি হয়তো গিয়ে বলল : 'ওদের আমরা জানি। ওরা হল অহংকারী আর সাহসী জাত। কোনো-রকম অন্যায় করলে ওরা ঠিক তোমাদের হত্যা করবে। বর্শা এবং বিষাক্ত তীরের নানান ধরনের সাংঘাতিক সমস্ত ফাঁদ ওরা পেতে রেখেছে। ওগুলোর মধ্যে একবার পড়লে আর রক্ষা নেই। কয়েক মিনিট অকথ্য যন্ত্রণা; তারপর অবধারিত মৃত্যু। তোমাদের মতো সুন্দর যুবকদের দেখে কষ্ট হয়। বন্ধুভাবে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। কারণ আমরাও তোমাদের মতোই ভিয়েতনামী।' কিছুদিন পর সেই সৈন্যবাহিনীই যখন বেশ কিছুসংখ্যক সহকর্মীকে হারিয়ে, আহতদের বহন করে নিয়ে ফিরে আসত, তখন দেখা যেত আমাদের লোকেরা সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে পড়েছে। কেউ আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করছে; কেউ বা চা বিতরণ করছে; আর মুখে অনর্গল করে যাচ্ছে নানা ধরনের মন্তব্য। যেমন : কি বলেছিলাম মনে আছে? যা হবার তা হয়ে গেছে। আর কখনো ওই সমস্ত জায়গায় যেও না। ওদের গ্রামগুলোকে এড়িয়ে চলো। নইলে তোমরা সবাই মারা পড়বে।"

আমাদের সামপান ধীরে ধীরে ছোট্ট একটি খাঁড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে। প্রসংগের সমাপ্তি টেনে হুইন বলেন, "প্রোপাগাণ্ডা হিসাবে এগুলোর তুলনা হয় না। কারণ কথাগুলো সব খাঁটি।"

বানর ও মৌমাছি

মৌলিক তথা সুদক্ষ প্রচার-পদ্ধতির প্রসংগটি বারংবার নানাভাবে আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। একবার কয়েকজন খণ্ডজাতীয় লোকের সংগে তাদের শিকার পদ্ধতি নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। কনটাম প্রদেশের অধিবাসী কাই প্লুই নামক জনৈক প্রসিদ্ধ জারাই উপজাতীয় শিকারী তাঁর বিচিত্র সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিলেন। তাঁরা কিভাবে বাঘ ও হাতি শিকার করেন সে সম্বন্ধে লোমহর্ষক সমস্ত বিবরণ দেবার পর, অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক বানর শিকারের আলোচনার মধ্যে এসে পড়লেন। বানরেরা সাধারণতঃ পাহাড়ের ঢালে গভীর বাঁশবনের ভিতরে বাসা বাঁধে। প্রথমে ওদের বাসস্থান খুঁজে বার করা হয়। তারপর সমকেন্দ্রী বাঁশঝাড়গুলোর দুই পাশে নিচের দিক থেকে ক্রমশঃ উপরের দিকে কেটে ফেলা হয়। ফলে বানরগুলো গিয়ে জড়ো হয় একটি ত্রিকোণাকার স্থানে। তখন ওই ত্রিকোণাকার ঝাড়ের ডগার দিকে আবার কাটা হয়। তারপর ডগার দিক থেকে কঞ্চিগুলোকে ছেঁটে পথ করে নিয়ে 'শিকারী'রা ঢুকতে থাকে সেই ত্রিকোণের ভিতরে। সেই সংগে অন্যান্য শিকারীরা ঘণ্টা, ঢাক ইত্যাদি পিটোতে পিটোতে বাঁশঝাড়ের গোড়ার দিক থেকে ক্রমশঃ গিয়ে যেতে থাকে। ঝাড়ের কঞ্চি ও মূল কেটে ফেলার দরুণ বানরগুলো দোলখেয়ে পালাতে পারে না। ভীত হয়ে ক্রমশঃ গিয়ে জড়ো হয় আরো সংকীর্ণ স্থানে। কৌশলটি ব্যাখ্যা করে কাই প্লুই বললেন, "ছোট ছোট গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে বানরগুলো লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়; লম্ফঝম্ফ ও চেঁচামেচি শুরু করে। কিন্তু গোড়ার দিক থেকে এগিয়ে আসতে থাকে ঢাক-ঢোলের শব্দ। আর ডগার দিকে বাঁশ ও অন্যান্য জংগল কেটে ফেলা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বানরদলের বুড়ো সরদার মাটিতে নেমে আসে। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ দলটি তখন আত্মসমর্পণ করল। তারপর এক এক করে নেমে আসে বাকিগুলোও। আমরা

তখন তাদের ভিতর থেকে ৫০০, ১০০০ কিংবা আরও বেশী বানর পছন্দ মত পাকড়াও করি।"

শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অত বানর নিয়ে ওরা কি করে?

গাট্টা-গোট্টা, শক্তিশালী চেহারা কাই প্লুই-র। চিবুকের হাড় দু'পাশে উঁচু হয়ে রয়েছে। গালে পাতলা একগুচ্ছ কালো দাড়ি। কিছু দিনের জন্য ফরাসী সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছিলেন। তাই কিছু কিছু ফরাসী ভাষা বলতে পারেন। আমার অনুচ্চারিত প্রশ্ন বুঝি অনুমান করলেন। বললেন, "বানরগুলোকে খাঁচায় ভরে রাখা হয়। প্রয়োজন মতো খাই। বানরের হাড় সিদ্ধ করে ওষুধ তৈরী করা হয়। কিন্তু বড় বড় বানরগুলোকে ফ্রন্টের ক্যাডারদের দিয়ে দেওয়া হয়। ওদের প্রোপাগাণ্ডা দলের কাজে লাগে।"

সেখানে উপস্থিত জনৈক ভিয়েতনামী ক্যাডার জানালেন, বানরের হাড় থেকে রক্তাল্পতা ও শক্তিহীনতার ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু ওই প্রোপাগাণ্ডার ব্যাপারটা কি?"

জবাবে প্লুই বললেন, "৩০ থেকে ৪৫ পাউণ্ড ওজনের সব চাইতে বড় বড় বানরগুলোকে আমরা এই কাজের জন্য বেছে নিই। ওগুলোকে কালো প্যাণ্ট ও সার্ট পরিয়ে, মুখে রঙ মাখিয়ে দিয়েম কিংবা হারকিন্সের সঙ সাজানো হয়। জামার পিঠে নানা রকমের বিদ্রুপাত্মক ছবিও এঁকে দিই। এছাড়া, নানান ধরনের শ্লোগান লিখে পায়ে বেঁধে দেওয়া হয় ওদের। তারপর নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় সায়গন এবং অন্যান্য প্রাদেশিক রাজধানীতে। খুব ভোর বেলা সবাই যখন কাজে বেরোয়, সেই সময় ওগুলোকে নিয়ে আমরা বাজারের ভিতর কিংবা কর্মব্যস্ত এলাকায় ছেড়ে দিই। বানরগুলো প্রথমে খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। তারপরেই ওই সমস্ত শ্লোগান নিয়ে চারিদিকে লাফালাফি করতে থাকে। বানর দেখে মানুষ সব সময়েই মজা পায়। আর এগুলোকে দেখে আরো বেশী করে মজা উপভোগ করে। পুলিশ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুলি করে ওগুলোকে মারতে পারে না, কারণ সেটা হবে প্রেসিডেন্ট দিয়েম কিংবা হারকিন্সকেই গুলি করার সামিল। যে কারণেই হোক, বানরগুলোর উপর গুলি চালানো যে চরম বোকামি হবে সে-কথা ওরা বোঝে। কিন্তু ওই স্লোগান-লেখা কাগজগুলোও ছিঁড়ে ফেলা দরকার। সুতরাং বানরগুলোর পিছনে ধাওয়া করে পুলিশের দল। আর লোকে ততই উপভোগ করে সেই দৃশ্য।

"প্রোপাগাণ্ডার পদ্ধতি হিসাবে এটা খুবই ভাল। কিন্তু এর অন্য উপযোগিতাও রয়েছে। আইন অনুসারে, বাজারের ভিতরে তিন জনের বেশী লোক একত্রিত হতে পারে না। হলেই পুলিশে ধরবে। জিনিসপত্র কেনা-বেচা কিংবা তর্কাতর্কির জন্যও তিনজনের বেশী একজায়গায় হলে রেহাই নেই। কিন্তু বানরগুলো যখন লাফালাফি করতে থাকে, আর পুলিশের দল ছুটতে থাকে সেগুলোর পিছনে, তখন জনসাধারণ সুযোগ পায় একত্রিত হবার। আর, সেই সুযোগে আমাদের প্রোপাগাণ্ডার দলও কাজে নেমে পড়ে। কখনো কখনো এই ধরনের কাজের জন্য আমরা কুকুরও ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কুকুরগুলোকে ধরা খুব সহজ। কখনো কখনো আবার কলাগাছের ছোট ছোট ভেলা তৈরী করে সেগুলোর মাস্তুলের মাথায় সঙ আঁকা ও স্লোগান লেখা কাগজ এঁটে দিয়ে শয়ে শয়ে আমরা নদীতে ভাসিয়ে দিই। ভেলাগুলো প্রাদেশিক রাজধানী ও জেলা সদর হয়ে নদীপথে ভেসে যায়। সেগুলোকে তুলে আনতে খুব বেগ পেতে হয় পুলিশকে। ফলে জনসাধারণ আবার আমোদ উপভোগ করবার সুযোগ পায়।"

দক্ষিণ-ভিয়েতনামী জনসাধারণের উদ্ভট সমস্ত অস্ত্রের ভাণ্ডারে কুকুর কিংবা বানরের চাইতেও ছোট ছোট প্রাণীরা রয়েছে। এবং এই পারমাণবিক যুদ্ধের যুগে সেগুলোকে তারা কেবলমাত্র প্রোপাগাণ্ডার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে না; অন্য উদ্দেশ্যেও করে। উদাহরণ স্বরূপ, বেন ত্রে প্রদেশের মো-গে জেলার ফ্রন্ট-নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই সমস্ত গ্রামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

মুখ্যতঃ ন্যস্ত রয়েছে মৌমাছিদের উপর। এই প্রসংগে, বেন ত্রে প্রদেশের নিখুঁত সুন্দরীদের একজন, চি হুয়েত (ভগিনী চন্দ্রালোক) নাম্নী জনৈকা মহিলার সংগে আমার আলোচনা হয়েছিল। তাঁদের গ্রামটিকে 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-এ পরিণত করতে ১৯৬০ সাল থেকে দিয়েমীরা কিভাবে চেষ্টা চালিয়েছিল, সেই প্রসংগ উল্লেখ করে হুয়েত বলেছিলেন, প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে আমরা বহু মহিলা ও তরুণী প্রাদেশিক রাজধানীতে পৌঁছুতেই, সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন গ্রামের সমস্ত মেয়েরা ছেলে-পুলে নিয়ে বেন-ত্রে'তে হাজির হয়ে আমাদের মুক্তির দাবি করতে লাগল। এমন হল্লা তারা শুরু করল যে, শেষ পর্যন্ত গভর্নর আমাদের মুক্তি দিয়ে রেহাই পায়। দিয়েমী সৈন্যেরা বারংবার আমাদের গ্রামে এসে শুয়োর, মুরগি সমস্ত চুরি করত ; আর, বেড়া এবং পরিখা দিয়ে গ্রামটিকে ঘিরতে আমাদের বাধ্য করবার চেষ্টা করত। কিন্তু কোনো বারই ওরা সফলকাম হয় নি।

"অন্যান্য বহু অঞ্চলের মতো, আমাদের ওই এলাকাতেও খুব বড় বড় আর সাংঘাতিক এক ধরনের মৌমাছি দেখা যায়। সাধারণ মৌমাছির চাইতে আকারে সেগুলো দ্বিগুণ, অথবা তারও বেশী। এরা চাকের ভিতরে মধু সঞ্চয় করে না। আর, এদের হুলে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। গোটা ছয়েক মৌমাছি কাউকে হুল ফোটালে, সে লোকের প্রাণ সংশয় হয়ে উঠবে। যাই হোক, এই মৌমাছিদের চাল-চলন বেশ কিছুদিন ধরে খুব ভাল করে আমরা লক্ষ্য করলাম। মৌচাকে সারাক্ষণ চারটি করে মৌমাছি পাহারায় থাকে। এই পাহারাদারদের কেউ একটু বিরক্ত করলেই তার আর রেহাই নেই। চাকের সমস্ত মৌমাছিদের ওরা ডেকে এনে তাকে আক্রমণ করবে। ওদের চাল-চলন জেনে নেবার পর, কতগুলো মৌচাক এনে দিয়েমী সৈন্য ঘাঁটি থেকে যে রাস্তা আমাদের গ্রামে এসেছে, সেই রাস্তার ধারের গাছগুলোতে আটকে রাখলাম। আঠালো কাগজ দিয়ে উপর থেকে সেগুলোকে ঢেকে দেওয়া হল

আর সেই কাগজ থেকে সরু সরু দড়ি টেনে বেঁধে দেওয়া হল পথের মাঝে পেতে রাখা একটি বাঁশের ফাঁদের সংগে। এই ঘটনার পর আবার একদল শত্রুসৈন্য এল আমাদের গ্রামে। পথে সেই ফাঁদটিতে পা দিতেই, দড়ির টানে মৌচাকের কাগজগুলো গেল ছিঁড়ে। সংগে সংগে হাজার হাজার মৌমাছি আক্রমণ করল তাদের। পাগলা মোষের মতো দৌড় লাগাল সৈন্যরা; আর পড়তে লাগল আমাদের বর্শা-পাতা ফাঁদে। শেষ পর্যন্ত আহতদের বয়ে নিয়ে ফিরে গেল সবাই।

"ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে বেতার মারফত ওরা নিশ্চয়ই সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল। কারণ জেলা শাসক অন্য একটি ঘাঁটি থেকে এক কোম্পানি সৈন্য সড়ক পথে এবং আরো কিছু সৈন্য হেলিকপ্টারে পাঠাল আমাদের গ্রামের দিকে। ততক্ষণে আরো বেশ কিছু মৌচাক এনে আমরা বসিয়ে দিয়েছি। শত্রু-সৈন্য এসেই দেখল রাস্তার জায়গায় জায়গায় গাদা করা রয়েছে মাটির স্তূপ। দেখলেই মনে হয় যেন নতুন পাতা ফাঁদগুলোকে ওইভাবে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। অফিসারটি অমনি সৈন্যদের আদেশ দিল মাটির স্তূপ সরিয়ে ফাঁদগুলো বার করতে। আসলে কিন্তু স্তূপগুলোর তলায় ছিল মৌমাছির চাক। ওই ভাবে বিরক্ত করায় মৌমাছিগুলো গেল দারুণ ক্ষেপে। ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আক্রমণ করল সৈন্যদের। দেখতে দেখতে ৩০ জন সৈন্য ঘায়েল হল। ফলে, আবার পালাতে হল তাদের।

"ব্যাপার দেখে আমরা বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। বিশেষ করে আমাদের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে শুরু করলাম ওই ধরনের মৌমাছি পালন করতে। আমি ওখান থেকে আসার সময় দেখে এসেছি দু'শয়েরও বেশী মৌচাক। সব চাইতে বড় কথা হল, শত্রুও দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের ধারে-কাছে ঘেঁষতে সাহস করে নি।"

ভগিনী চন্দ্রালোকের সংগে যে সময় আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি আপন গ্রাম ছেড়ে বহু দূরে এক আঞ্চলিক অধিবেশনে যোগদান করতে এসেছিলেন। অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের

অস্বাভাবিক যুদ্ধ-পদ্ধতির অভিজ্ঞতা বিনিময় করা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ওই সমস্ত পদ্ধতি কতদূর প্রয়োগ করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা। বানর প্রোপাগাণ্ডাদল ও মৌমাছি সেনাদলের ব্যবহার হল 'জনযুদ্ধের' একটি অপরিহার্য অংগ। আমার ধারণা পৃথিবীর কোনো সেনাবাহিনী, এমন কি মুক্তিফ্রণ্টেরও কোনো উচ্চ-পদস্থ জেনারেল স্টাফের মাথা থেকে এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের পরিকল্পনা কখনো বেরুতে পারত না। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন-সাধারণের সংগ্রাম বলেই, এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের কল্পনার জন্ম সম্ভব হয়েছে। এটা হল দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধের মৌল চারিত্রিক বিশেষত্ব। আর, একবার এই ধরনের অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়ে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হলেই, সে খবর বিদ্যুৎগতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের রাজনৈতিক এবং সামরিক চরিত্র প্রতিটি স্তরে অংগাংগীভাবে জড়িত। লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী সবাই প্রায় একই সংগে সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি অভিনেতৃদল হয়ত বে-আইনীভাবে কোনো শত্রু-নিয়ন্ত্রিত গ্রাম থেকে এসে 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' ধ্বংস করবার কৌশল কোনো নাটকে বাস্তবভাবে রূপায়িত করল। তারপর দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েই আবার চলল খানিক আগে মঞ্চে রূপায়িত বিষয়টিকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে। অর্থাৎ বাঁশ ও কাঁটাতারের বেড়া ভাঙার ব্যাপারে গ্রামবাসীদের সাহায্য করতে। আবার অভিনয়ের সময়ে কোনো রকম শত্রু-আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে, নাটক ফেলে হাতে তুলে নিল রাইফেল। আর এ সমস্ত কিছুই যদি না হয়, তবে হয়ত একটি নাটক শেষ করেই শুরু করবে অন্য একটি নাটক। তাতে হয়ত দেখাবে, কিভাবে একটি 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'কে সশস্ত্র গ্রামে রূপান্তরিত করা হল।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম পরিভ্রমণ কালে এই ধরণের একাধিক নাট্য-

দলের সংগে আমার দেখা হয়েছে। হাসি খুশী তরুণ-তরুণীরা অভিনয়ের সাজ-সরঞ্জাম ও মঞ্চের লটবহর পিঠে বয়ে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। অনেকে দলের কোনো অসুস্থ সংগীকে বহন করে নিয়ে চলেছে। প্রদর্শনীর জন্য কোনো স্থানে উপস্থিত হয়ে এই সমস্ত দলের প্রথম কাজই হল নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পরিখা খনন করা। এরা সামরিক অভিযানেও অংশ গ্রহণ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযান শুরু হবার ঠিক আগে মনোবল উদ্দীপ্ত করবার উদ্দেশ্যে কোনো নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে। তারপর বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধের মধ্যে। বিশিষ্ট লেখক ও নাট্যকার, মুক্তিফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, এবং লেখক ও মঞ্চকর্মী-সংঘের সভাপতি ত্রান হু ত্রাঙ একবার আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর সংঘের সদস্যরা অস্ত্র হাতে নিয়ে আজ অবধি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানেই অংশ গ্রহণ করেছেন। আরো বলেছিলেন, "শত্রুঘাঁটি দখল করবার পর ওদের প্রথম কাজই হয় কাগজ যোগাড় করা। যেখানে যত কাগজ পায়, সমস্ত ওরা সংগ্রহ করে। কারণ কাগজের ঘাটতি হল আমাদের একটি প্রধান ও স্থায়ী সমস্যা।"

সাংবাদিকেরাও সামরিক অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার সংগে সংগে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যান। বস্তুতঃ তাঁরা 'এক হাতে কলম, আর অন্য হাতে রাইফেল' নিয়ে কাজ করেন। এই প্রসংগে একবার ভগিনী থিয়েন নাম্নী জনৈকা মহিলার সংগে আমার আলোচনা হয়েছিল। মহিলার প্রকৃত নাম কিন্তু থিয়েন নয়। কারণ তাঁর আপন জনেরা এখনো সায়গনে বাস করছেন, এবং দেখা সাক্ষাতের জন্য তিনিও মাঝে মাঝে সায়গনে গিয়ে থাকেন। ছাত্রদের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন তিনি। সেই সংক্রান্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, "পত্রিকাটি বহুদিন ধরে সায়গনেই ছাপা হত। অবশ্য গোপনে; এবং একেবারে সায়গনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দিয়েমীদের ছাপাখানাতেই। কিন্তু ক্রমশঃ গণ্ডগোল বাড়তে থাকায় আমরা একটা মুদ্রণযন্ত্র কিনে গোপনে সায়গন থেকে পাচার

করে জংগলে নিয়ে আসি।"

আমার ধারণা ছিল, আজকের সায়গন হল বিশ্বের সবচাইতে কড়া নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সংবলিত শহর। দিবারাত্র সেখানে রয়েছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর টহলদারী। প্রতিটি রাস্তায় মোড়ে-মোড়ে রয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "সায়গন থেকে পাচার করে নিয়ে এলেন?"

একগাল হেসে মহিলা জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। যন্ত্রের প্রতিটি অংশ খুলে আলাদা আলাদা করে নিয়ে আসা হল। আমরা ছাত্রীরা সব দোকানী মেয়ে সেজে ঝাঁকার মধ্যে অক্ষরগুলো রেখে উপরে অবিক্রীত আনাজ ও শাকসবজী চাপা দিয়ে পিঠে করে নিয়ে এলাম। বেলনাগুলো খানিকটা মুশকিলে ফেলেছিল। অবশেষে সেগুলোতে খুব ভাল ভাবে চর্বি মাখিয়ে সামপানের তলায় আটকে দেওয়া হল। জলের তলায় দীর্ঘ দিন ধরে থাকলেও কোনো অনিষ্ট হয় নি। পরে বেশ ভাল করে পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। সমস্ত মালপত্র ওদের একেবারে নাকের ডগার উপর দিয়ে নৌকায় তুলে পাচার করা হল। আগে আমাদের সমস্যা ছিল পত্রিকাটি সায়গনে ছাপা এবং গ্রামাঞ্চলে পাচার করা। এবার হয়েছে ঠিক উলটো। এবার ছাপা হয় বাইরে, আর কপিগুলো পাচার করা হয় শহরে। পাঁচ হাজার কপি ছাপা হয়। তারপর কোনো রকমে একবার আমাদের 'চিঠির বাক্সে' অর্থাৎ সংযোগ রক্ষাকারী কর্মীদের হাতে সেগুলো তুলে দিতে পারলেই অনায়াসে বিলি হয়ে যায়। তারপর হাতে হাতে পাচার হতে থাকে, এবং প্রায় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীই পড়তে পায়। পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয়। ছাত্র-ছাত্রীরাই প্রধানত সংবাদদাতার কাজ করে। যে প্রক্রিয়ায় কপিগুলো শহরে পাচার করা হয়, ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই ওদের লেখাগুলোও আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়। অবশ্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। পাছে কোনো রকমে ফাঁস হয়ে যায়, তাই ক্রমাগত আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থাটিকে পরিবর্তিত করতে থাকি। কিন্তু আজ অবধি কোনো কিছু ফাঁস হয় নি।"

খাদ্য-শস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

মার্কিন কমাণ্ড তার 'বিশেষ যুদ্ধে'র জন্য যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করেছে, তার অন্যতম হল শস্য ক্ষেতের উপরে বিমান থেকে রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়া। অর্থাৎ, যেখানেই তারা আর এঁটে উঠতে পারছে না, সেখানেই ধ্বংস করে দিচ্ছে সমস্ত কিছু। এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বাগানের পর বাগানে কোনো গাছে একটিও পাতা কিংবা ফল নেই। অথচ পাশের গ্রামের বাগিচা-গুলোতে সবুজ পাতা আর ফলের সমারোহ। স্বচক্ষে দেখেছি, বিরাট বিরাট পেঁপে বাগিচার সমস্ত গাছ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। ফলগুলো সব শুকিয়ে আখরোটের আকৃতি হয়ে পত্র-বিহীন গাছের গুঁড়ির চারপাশে রয়েছে ছড়িয়ে। আনারস বাগিচায় দেখেছি আনারসগুলো সব শুকিয়ে ছোট ছোট কমলালেবুর আকৃতি ধারণ করেছে। অথচ পাশের গ্রামের বাগিচাগুলোর অবস্থা দেখেছি ঠিক বিপরীত। সুপুষ্ট ফল শুধু পেড়ে নেবার অপেক্ষা। অবশ্য এই ধরনের কোনো আক্রমণ আমি নিজের চোখে দেখি নি। অথবা, মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে যেখানে এই ধরনের আক্রমণ অহরহ হচ্ছে, সেখানেও যাই নি। কিন্তু জনৈকা দক্ষিণ ভিয়েতনামী মহিলা বৈজ্ঞানিকের সংগে আমার সাক্ষাৎকারের সুযোগ ঘটেছিল। তিনি হলেন দক্ষিণ ভিয়েতনাম মুক্তিফ্রন্ট মহিলা সংঘের কার্যকরী সমিতির সদস্যা, বিশাল একটি হাসপাতালের সর্বময়ী কর্ত্রী এবং জননী ও শিশু রক্ষা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, ডাক্তার থুই বা। প্রধানতঃ এই রাসায়নিক যুদ্ধের কবল থেকে রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের জন্যই বিশেষ গবেষণা চালিয়েছেন তিনি।

ডঃ থুই বা'র বয়স খুব অল্প। মুখখানা লাজুক ধরনের। অন্যান্য সহকর্মীদের মতো তিনিও সায়গনের আয়েস-আরামপূর্ণ গৃহ এবং চিকিৎসা ব্যবসা ছেড়ে জংগলের কঠিন জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন। রাসায়নিক বিষের প্রসংগে তিনি আমাকে বলেন,

"যদিও প্রধানতঃ খাদ্য-শস্য ও গৃহপালিত জীবজন্তুদের লক্ষ্য করে এই বিষ বিমান থেকে ছড়ানো হয়, তবু এই বিষ মানুষেরও সাংঘাতিক ক্ষতি সাধন করে। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের। একমাত্র ১৯৬৪ সালের প্রথম দুই মাসেই কা-মাউ অঞ্চলে এই রাসায়নিক বিষের শিকার হয়েছিল তিন হাজার শিশু। এই বিষের প্রধান লক্ষণ হল শরীরের চামড়া পুড়ে যাওয়া, পেটের পীড়া ও ফুসফুসের রোগ। বর্তমান বৎসরের শুরু থেকেই শত্রুপক্ষ প্রায় সারা মেকং ব-দ্বীপ এলাকা জুড়ে রাসায়নিক বিষের আক্রমণ জোরদার করে তুলেছে।

"আমাদের জনস্বাস্থ্য কমিটি অবশ্য কিছু কিছু প্রতিষেধক উপায়ও উদ্ভাবন করেছে। গ্যাস মুখোস না থাকার দরুন আমরা বেশ অসুবিধায় পড়েছি। তবু রুমাল জলে ভিজিয়ে তাই দিয়ে নাক-মুখ চাপা দিয়ে যতদূর সম্ভব বাঁচবার চেষ্টা করা হয়। এতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংগে বিষ অতটা ভিতরে যেতে পারে না। গায়ের চামড়া পুড়ে গেলে আমরা লেবুর রস ব্যবহার করি। রাসায়নিক আক্রমণ শুরু হলে, একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নাইলনের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। আর, বড়রা সেই তল্লাট ছেড়ে দূরে চলে যায়। এই ধরনের আক্রমণের সময় শত্রুপক্ষ ভান করে যেন তারা কীট অথবা পত্রনাশক কোনো ওষুধ ছড়াচ্ছে। আসলে কিন্তু উদ্দেশ্য হল সব কিছু ধ্বংস করা। যে সমস্ত অঞ্চলকে ওরা কাবু করতে পারে না, সেই সমস্ত অঞ্চলের সমুদয় ফসল ধ্বংস করে। যেমন ধরুন কা মাউয়ের কথা। দিয়েম-বিরোধী অভ্যুত্থানের সংগে সংগে ওরা বহু সৈন্যঘাঁটি পরিত্যাগ করে চলে যায়। তারপর ওই এলাকার ক্ষেতের ধান ও ফলের বাগিচা সুপরিকল্পিতভাবে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে শুরু করে। এবং দিনের পর দিন এই ধ্বংসকার্য বেড়েই চলেছে। খুয়েন খান গদীতে বসবার পর ধ্বংসকার্যের তীব্রতা বেড়ে গেছে অনেক বেশী।"

উপসংহারে ডঃ থুইবা বললেন, "পুতুল সৈন্যদের লড়াই করবার ইচ্ছা একেবারে শেষ হয়ে যাওয়াতে, ওরা দেখছে যে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ক্রমশঃ হয়ে উঠছে কঠিনতর। ধ্বংসে

যেতে ওঠার কারণ সম্ভবতঃ এই।"

আমেরিকানরা নিজেদের বর্বরতম কার্যকলাপকে গোপনীয়তার যবনিকার আড়ালে ঢেকে রেখেছে। সেই যবনিকা মাঝে মাঝে হঠাৎ সরে যায়; আর তখনি বাইরের পৃথিবী প্রকৃত সত্যের কিছুটা আভাস পায়। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৬৪ সালের ১৯শে মার্চ তারিখের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই তারিখে মার্কিন উপদেষ্টাদের নির্দেশাধীনে গঠিত একটি সামরিক অভিযানে সায়গন সৈন্যেরা ছানত্রিয়া নামক একটি কাম্বোডিয়ান গ্রামের উপর আক্রমণ চালায়। প্রথমে গ্রামটির উপর ফেলা হয় নাপাম বোমা। ফলে বহু শিশু অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। তারপর রংগমঞ্চে প্রবেশ করে ডজনখানেক ট্যাংক। গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা সময় মতো পালাতে পারে নি, তারা সবাই ট্যাংকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা গেল। এছাড়া ১৩জন গ্রামবাসীকে ট্যাংকের তলায় পিষে, গুলি করে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মারা হল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত মার্কিন উপদেষ্টাগণ সংক্ষিপ্ত জবাবদিহি করে বললেন, "দুঃখিত। আমরা ভেবেছিলাম তোমরা সবাই হলে ভিয়েতনামী।" আর এদিকে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তারস্বরে ঘোষণা করতে লাগল যে এই ঘটনার মধ্যে কোনো আমেরিকান জড়িত নেই। পরে স্টেট ডিপার্টমেন্ট স্বীকার করে যে, আমেরিকানরা সেখানে 'উপস্থিত' ছিল, কিন্তু তারা এই ব্যাপারে কোনো রকম 'অংশগ্রহণ' করে নি।

রাসায়নিক যুদ্ধ সম্বন্ধে ডঃ থুই বা'র অভিযোগের সমর্থন প্রাপ্তির ব্যাপারটি হল এর চাইতেও বীভৎস এবং গুরুতর। কাম্বোডিয়ার বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এম হুয়োত সামবাথ জানান যে, ১৯৬৪ সালের ১৩ই জুন ও ২৩শে জুলাই তারিখের মধ্যে মার্কিন বিমানবহর কাম্বোডিয়ার রত্তনকিরি প্রদেশের ছয়টি গ্রামের উপর 'বিষাক্ত পাউডার' নিক্ষেপ করেছে, এবং তাতে বহু শিশুসহ মোট ৭৬ জন লোক মারা গেছে। এই অভিযোগের জবাবে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলে যে, কেবলমাত্র 'জংগল ও পত্রনাশক' পদার্থ

ব্যবহার করা হয়েছে এবং কাম্বোডিয়ার গ্রামের উপর সেগুলো ছড়ানো হয়েছে নিছক ভুল বশতঃ।

মুক্তাঞ্চল ছেড়ে আসার আগে সর্বশেষ যে সংবাদ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম, তা'হল, শস্য ধ্বংসের নব নব সমস্ত পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি হল, বিমান থেকে ধান ক্ষেতের উপর এমন কয়েক ধরনের কীটের ডিম ফেলা, যা জলের ভিতরেও ধানগাছগুলোকে আক্রমণ করতে পারে। আরেকটি হল, নাপাম বোমার খোলে ফসফরাসের ব্যবহার। কারণ, সব সময়েই, এমন কি ধান কাটার সময়েও ক্ষেতে জল ভর্তি থাকে। ফলে, নাপাম বোমার কার্যকারীতা অনেকখানি কমে যায়।

একদিকে, অনুন্নত দেশগুলোতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় নির্ধারনের জন্য অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাসমারোহে অংশ গ্রহণ করছে। অন্যদিকে তারই সামরিক কর্তারা বিশ্বের অন্যতম সর্ববৃহৎ খাদ্যশস্য উৎপাদক অঞ্চলের ধানক্ষেতগুলোকে বিষাক্ত করতে এবং পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছে না। এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে এশীয়া বাসীরা নিশ্চয়ই চমকে উঠবে।

এইভাবেই চলেছে এই সংগ্রাম : বিরামহীন ; কঠিন। এবং এতে জড়িয়ে পড়েছে সবাই। সৈনিক থেকে ছাত্র, কৃষক থেকে সরকারী কর্মচারী তথা পদস্থ সামরিক অফিসার সবাই। আর, লড়াইয়ের কোনো কৌশলই বাদ যায় নি এই সংগ্রামে। এবং ফ্রন্ট, বলতে গেলে অনায়াসে, এই সংগ্রামে জয়লাভ করছে। সায়গন কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে না আছে কিছু করণীয় ; না আছে পাল্টা আক্রমণ করবার মতো সত্যিকারের কোন সামর্থ্য।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সায়গনে অভ্যুত্থান—দিয়েম শাসনের অবসান।

বৌদ্ধ এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের উপর দমন-পীড়নের ফলে দিয়েমী শাসনের অবশ্যম্ভাবী অবসান সূচিত হয় নি ; হয়েছিল আপ-বাক-এর পর থেকে একের পর এক সামরিক পরাজয়ের কারণে। যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে দিয়েমের ব্যর্থতা এবং মার্কিন সামরিক নীতি ও কৌশলের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রমাগত বাধা সৃষ্টির ফলে, আমেরিকার সংবাদপত্রগুলো বৎসরাধিক কাল ধরে ক্রমশঃ বেশী করে তাঁর খোলাখুলি সমালোচনা শুরু করেছিল। যাকেই দিয়েম নিজের বিরুদ্ধবাদী বলে মনে করেছেন, তাকেই দমন করবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন মধ্যযুগীয় ও ফাসিস্ট কায়দা-মিশ্রিত পুলিশী নির্যাতন। এই জিনিসটি আমেরিকার সংবাদপত্রগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় লক্ষ্যই করে নি, কিংবা সমর্থন করেছে। কিন্তু লড়াইয়ে দিয়েম পরাজিত হচ্ছিলেন ; এবং এইটাই ছিল তাঁর আসল অপরাধ। 'দিয়েমকে দিয়ে এই লড়াই কি আমরা জিততে পারব ?'—অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিতবহ এই শিরোনামায় নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় একটি প্রচণ্ড মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দিয়েমের সর্বোচ্চ সামরিক কর্তা-ব্যক্তিদের সংগে হারকিন্সের কলহ এবং সামরিক ব্যাপারে আমেরিকার সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে দিয়েমের বাধা দান, এই দুটি সংবাদে পরিপূর্ণ থাকত আমেরিকার সমস্ত সংবাদপত্র। প্রকৃত সমস্যা ছিল এইখানেই।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর দমন-পীড়ন চলে আসছিল বহু বৎসর ধরে। মার্কিন সরকার যদি দিয়েমের প্রতি বিরূপ না হত এবং

সায়গনের জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট যদি তৎপর না হয়ে উঠত, তা হলে এই দমন-পীড়নের কাহিনী থেকে যেত অলক্ষ্যেই। অধিকতর ধর্মীয় স্বাধীনতার দাবীটিকে মুক্তি ফ্রন্ট ব্যাপকতর আন্দোলনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবিতে পরিণত করে, এবং সমর্থকদের বিশাল গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানায়। এই গণ-আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে পথে-পথে পুলিশের সংগে প্রচণ্ড সংঘর্ষে। আন্দোলনের বিশালতা এবং জনতার উৎসাহ ও সংগ্রামী মনোভাব সায়গনের মার্কিন কমাণ্ডের কাছে ছিল একটি বিরাট আঘাতস্বরূপ। কারণ তারা বুঝেছিল, 'ভিয়েৎকং'রা একেবারে সায়গনের ভিতরে হাজারে হাজারে তাদের সংগে মিশে রয়েছে এবং দিয়েমের সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত, বিব্রত করে তুলেছে।

এই লড়াইয়ে দিয়েম যে শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলেই পরাজয় বরণ করছিলেন তাই নয়; পরাজিত হচ্ছিলেন সায়গনেও। ফলে, তাঁর অপসারণ হয়ে উঠেছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু এই ব্যাপারে মার্কিন সরকারী মহলে মতৈক্য ছিল না। পেন্টাগন চাইছিল, দিয়েম তাদের কথামতো চলুন। তাঁর অপসারণ কিংবা মৃত্যু তারা চায় নি। বস্তুতঃ হারকিন্স ছিলেন অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধেই। দিয়েমের সংগে তাঁর মতান্তর ছিল দুটি প্রধান বিষয়ে।

হারকিন্স চেয়েছিলেন ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ করতে; শত্রু পরিবেষ্টিত ওই শত শত সৈন্য ঘাঁটি পরিত্যাগ করে চলে আসতে। তাঁর মতে ওই সমস্ত ঘাঁটি ছিল 'মুক্তিফ্রন্টের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে'র কেন্দ্রস্বরূপ। বলা বাহুল্য, হারকিন্সের অনুমান ছিল যথার্থ। ওই ঘাঁটিগুলোতে দৈনিক রসদাদি সরবরাহের কাজে তাঁর ডজন ডজন হেলিকপ্টার আটকে থাকত। কিন্তু দিয়েম ছিলেন এর বিরুদ্ধে। প্রধানতঃ মেকং ব-দ্বীপ এলাকার ঘাঁটিগুলো থেকেই সরে আসতে চেয়েছিলেন হারকিন্স। দিয়েমের কাছে তার অর্থ ছিল, দেশের সব চাইতে সমৃদ্ধশালী অঞ্চলের বেশ কিছুটা অংশের উপর থেকে নামমাত্র অধিকারও হারানো। হারকিন্স অংগীকার করেছিলেন পরিত্যক্ত

ঘাঁটিগুলোর 'বেকার' সেনাদলকে একত্রিত করে গঠিত মোবাইল রিজার্ভ বাহিনীর সাহায্যে তিনি পরে আবার ওই অঞ্চল দখল করে নেবেন। কিন্তু তাঁর এই অংগীকারও দিয়েমকে প্রভাবিত করতে পারে নি। এই 'বিশেষ যুদ্ধ'-কে চূড়ান্ত সীমা অবধি ঠেলে দেবার অভিপ্রায়ে হারকিন্স চেয়েছিলেন, সামরিক ক্ষেত্রে নিচের দিকে একেবারে কোম্পানি পর্যায় অবধি, এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জেলা পর্যায় অবধি সর্বময় নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে মার্কিন অফিসারদের হাতে। দিয়েমের এতেও আপত্তি ছিল। হারকিন্স নিশ্চিত ছিলেন যে, যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করলে দিয়েম তাঁর দাবী মেনে নিতে বাধ্য হবেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে। এবং এই ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন করছিলেন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল হুয়েন খান। খান ছিলেন অতি সাধারণ একজন অফিসার। কিন্তু ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে সামরিক অফিসারদের একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানে দিয়েমকে রক্ষা করবার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবার পর, দিয়েম তাঁর দ্রুত পদোন্নতি ঘটান দিয়েমী অফিসারদের মধ্যে হুয়েন খান ছিলেন হারকিন্সের সর্বাপেক্ষা অন্তরংগ বন্ধু।

আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থান চাইছিল। তাই দক্ষিণ ভিয়েতনামে নব নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্যাবট লজের উপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পিত হল। 'দিয়েমকে দিয়ে এ যুদ্ধ আমরা জিততে পারবো না'—এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত হয়েছিল স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তা ছাড়া, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর দমন পীড়ন এবং সায়গনের 'অভিজাত' ঘরানার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে কারান্তরালে আটক—এই দুটি ব্যাপার অন্যান্য বৌদ্ধ রাজ্যগুলোর সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের পক্ষে হয়ে উঠেছিল মারাত্মক ক্ষতিকারক। রাষ্ট্রপুঞ্জের উপস্থিতিতেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন স্টেট ডিপার্টমেন্টকে আরো অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। এবং এই ঘটনাই স্টেট ডিপার্টমেন্টকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন কর্মকর্তাগণ

অতি অল্পের জন্য ভোট এড়াতে এবং কিছু কালের জন্য ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দিতে সক্ষম হন। কিন্তু তার আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি তদন্তকারী দল গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সায়গনে। ফলে দিয়েমের পতন স্টেট ডিপার্টমেন্টের চরম কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। শুধু কাম্যই নয়; প্রকৃতপক্ষে হয়ে ওঠে অতি-প্রয়োজনীয়। কারণ সে ক্ষেত্রে, একটিমাত্র সামরিক অভ্যুত্থানেই আধডজন খানেক অস্বস্তিকর সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সুতরাং, বৌদ্ধ নির্যাতন দিয়েমের পতনের কারণ না হলেও, পতনের দিন-ক্ষণটিকে সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট করেছিল। দিয়েম নিজে ছিলেন মধ্য ভিয়েতনামের অধিবাসী। ফলে সেনা বাহিনী তথা আমলাতন্ত্রের সমস্ত বড় বড় পদগুলোই পূর্ণ করা হয়েছিল মধ্য ভিয়েতনামের অধিবাসীদের দিয়ে। কিন্তু ক্যাবট লজ যে 'সায়গনের দুই ব্যক্তি'কে মনোনীত করলেন, সেই জেনারেল দুয়োঙ ভান মিন এবং ত্রান ভান দন উভয়েই ছিলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষ।

সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যাপারে সাধারণতঃ 'সিয়া'র (C. I. A.) উৎসাহ খুব বেশী। কিন্তু দিয়েমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তাদের মতামত ছিল দ্বিধাবিভক্ত। 'সিয়া'-র সায়গনস্থ বড় কর্তা ছিলেন অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে। এই কারণেই ক্যাবট লজ পরে তাঁকে দেশে ফেরত পাঠান। 'সিয়া'-র উপর মহলের অনেকেই 'দিয়েমকে হারানো ক্ষতিকারক' বলে মনে করত। এবং তাদের দৃষ্টি-কোণ থেকে তারা ছিল অভ্রান্ত। সায়গনের 'সিয়া'-র দলের মধ্যে যারা অভ্যুত্থানের পক্ষে ছিল, তাদের পছন্দসই মানুষ ছিলেন মেজর জেনারেল তন থাট দিন; দিয়েমের মতোই একজন মধ্য ভিয়েতনামী সামন্ত প্রভু এবং উগ্র কম্যুনিস্ট-বিরোধী। দিয়েমের কর্মরত চিফ অফ স্টাফ রূপে সেনাবাহিনীকে ইচ্ছামত পরিচালিত করা তাঁর পক্ষে ছিল সম্ভবপর।

কি ভাবে অভ্যুত্থান ঘটানো হল এবং নো দিন দিয়েম ও তাঁর কুখ্যাত ভ্রাতা নু কি ভাবে নিহত হলেন, সে সমস্ত হল অতীতের

সুপরিজ্ঞাত ঘটনা। যেটা ভাল করে সবাই জানে না, তা'হল সেই ঘটনার পটভূমিকা। ঘটনাটি অবশ্য সংঘটিত হবার ঠিক দশ দিন বাদে, আততায়ীর বুলেটে অন্য একজন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্টের নিহত হবার পর, বিশ্বের শীর্ষ সংবাদের সারি থেকে দ্রুত মিলিয়ে যায়।

নো ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হবার পরের মাসেই গেরিলারা সায়গন থেকে মেকং ব-দ্বীপগামী সমস্ত সড়ক পথের বিভিন্ন স্থানে বিরাট বিরাট অংশ কেটে দেয়; পথের বহু অংশকে আবার জলপূর্ণ ধান ক্ষেতে রূপান্তরিত করে; বহু রেলের পুল বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় এবং বহু খালে বাঁধ নির্মাণ করে বাঁধের উপরে কলা গাছ ও ঝোপ-ঝাড় রোপণ করে। বস্তুতঃ সমস্ত সড়ক, রেল তথা জল-পথের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে অথবা বাধা সৃষ্টি করে তারা সৈন্য ঘাঁটি ও 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট'-গুলোকে ধ্বংস করার এক বিরাট ও ব্যাপক অভিযান শুরু করে। ফলস্বরূপ, ব-দ্বীপ অঞ্চলের সমস্ত সৈন্য ঘাঁটিই হেলিকপ্টার-বাহিত অথবা প্যারাসুট নিক্ষিপ্ত সরবরাহ ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা আবার যতদিনে কিছু কিছু পুনস্থাপিত হল, ততদিনে পূর্বতন বহু 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট'-ই 'সুরক্ষিত গ্রামে' রূপান্তরিত হয়ে গেছে; এবং যে সমস্ত সৈন্যঘাঁটি আগে ওই 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট'গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করত, তারা নিজেরাই হয়ে পড়েছে নিয়ন্ত্রিত। কারণ চারিদিক থেকে তখন তাদেরই প্রতি উদ্যত হয়ে রয়েছে কামানের নল। দিয়েমের পতনের পর আস্ফালন করে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, 'সামরিক তৎপরতা অবিলম্বে বৃদ্ধি করা হবে।' বৃদ্ধি করা হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু বিপরীত অর্থে। অর্থাৎ সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল মুক্তি ফ্রন্টের তরফ থেকে। সায়গনের তরফ থেকেও অবশ্য একাধিক সামরিক অভিযান চালানো হয়। কিন্তু সবগুলোরই পরিসমাপ্তি ঘটে ব্যর্থতায়।

১৯৬৩ সালের ২৫শে নভেম্বর তারিখ থেকে মার্কিন-সায়গন

সেনাবাহিনী ১৮০টি সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। তার মধ্যে, সায়গনের অন্যতম প্রধান প্রবেশ পথ ভান্-আন্ ও চোলোন প্রদেশে একাধিক অভিযানে নিযুক্ত করা হয়েছিল তিন থেকে সাত ব্যাটেলিয়ন সৈন্য। পাল্টা আক্রমণে গেরিলারা ধ্বংস করে বারোটি সৈন্যঘাঁটি; এবং আরো কুড়িটি ঘাঁটি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় মার্কিন-সায়গন কমাণ্ড। এ ছাড়া, ৮২টি 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' গেরিলারা হয় ধ্বংস করে বাসিন্দাদের পূর্বতন গ্রামে ফেরত পাঠায়, অথবা সেগুলোকে 'প্রতিরোধ' গ্রামে রূপান্তরিত করে।

এই প্রসংগে প্রেসিডেন্ট হুয়েন হু থো বলেছিলেন, "সেই নভেম্বর মাসেই মুক্তিফৌজ ও জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে ১,৬৬২টি 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট' ধ্বংস করে এবং শত শত সৈন্যঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আমাদের বাহিনী দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা শত্রু সৈন্য কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে পরিত্যক্ত ঘাঁটির সংখ্যা একমাত্র কোচিন-চায়নাতেই ছিল ৪০১টি। এদের মধ্য মাঙ্গ-থো, লঙ-আন, বেন-ত্রে ও কা-মাউ প্রদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিও ছিল। ওই একই মাসে আমাদের দেশপ্রেমিক ও সৈন্যেরা মিলে ৩১ জন আমেরিকান সহ মোট ৫,৪৯৫ জন সৈনিক ও অফিসারকে নিহত করেছিল; ১৫ জন আমেরিকানসহ আহত করেছিল মোট ২,৮৪৯ জনকে; বন্দী করেছিল ৯৯০ জনকে, তাদের মধ্যে ৪ জন আমেরিকান; ১৬টি মর্টার, ৪৭টি মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেলসহ আটক করেছিল ২,১৭২টি বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র; ভূপাতিত করেছিল ৩২টি বিমান ও হেলিকপ্টার, এবং ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল আরো ৩০টি। এ ছাড়া, ওদের সেনাবাহিনী ছেড়ে পালিয়ে যায় ৬,৩৫৮ জন সৈনিক ও অফিসার।" এতদ্ব্যতীত, কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথাও প্রেসিডেন্ট থো উল্লেখ করেছিলেন। সেই সমস্ত লড়াইয়ে জয় লাভ করেছিল মুক্তিফ্রন্ট।

দিয়েমের পতনে উল্লসিত কণ্ঠগুলো কিন্তু এই ঘটনার পর থেকেই অন্য সুর গাইতে শুরু করে। সামরিক অভ্যুত্থানের মাত্র পাঁচ সপ্তাহ

পরে, ৯ই ডিসেম্বর তারিখের নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়: 'পরবর্তী ছয় মাসে নতুন সরকারকে অগ্রগামীর ভূমিকা পুনরুদ্ধার করতে প্রচণ্ড প্রয়াস করতে হবে।' নতুন সামরিক সরকার কিন্তু কোনো দিনই অগ্রগামীর ভূমিকা পুনরুদ্ধার করতে পারে নি। বিগত ছয় মাসেও না। জেনারেল হারকিন্স এবং ঙুয়েন খান নিঃশব্দে নেপথ্যে কাজ করে যাচ্ছিলেন। সামরিক বিপর্যয় বৃদ্ধি পাবার সংগে সংগে তাঁরা দুজনেই ক্যাবট লজকে বলতে পারতেন, 'এটা যে হবে, তা আমরা আগেই বলেছিলাম।' আর, প্রধানতঃ মিন্, দিন্ এবং দন —এই তিন প্রধান নিয়ে গঠিত সরকারের ভিতরে চলছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। তিন জনেরই পদমর্যাদা ছিল সমান। কারো সম্মান কারো চাইতে বেশী ছিল না। ফলে দেখা দিয়েছিল সম্পূর্ণ অচল এক অবস্থা।

এদিকে ক্যাবট লজও চুপ করে বসেছিলেন না। ফ্রান্সের নির্বাসন থেকে প্রত্যাগত এবং দিয়েমী কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ডঃ ফান্ কোয়াং দান্ ও ফু-ফু-থঙ্-এর মতো বিগত দিনের রাজনীতিকের যাতে এবারেও একহাত খেল দেখাতে সম্মত হন, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন তিনি। সামরিক অভ্যুত্থানের পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিলেন যাতে উভয়ে মিলে একটি দ্বি-দলীয় সরকারের পরিকল্পনায় রাজি হন—'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে এক মত হয়ে, ঠিক আমাদের রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটিক পার্টির মতো।' কিন্তু কেউই এতে সম্মত হন নি। প্রত্যেকেই 'ফরাসী প্রথা অনুযায়ী' নিজ-দলীয় সরকার গঠন করে, সেই সরকারের শীর্ষ আসন দখল করতে চাইছিলেন। সর্বজন পরিচিত যে সামান্য কয়েকজন রাজনীতিককে ক্যাবট লজ যোগাড় করতে পেরেছিলেন, তাঁরা সবাই আমেরিকার দ্বি-দলীয় এবং দিয়েমী এক-দলীয় সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন: এবং যতদিন পর্যন্ত সামরিক দলের হাতে কর্তৃত্ব থাকবে, ততদিন কোনো রকমের সহযোগীতা করতে অসম্মত হন। শেষোক্ত দলের হাতে ক্ষমতা

থাকাটা অবশ্য লজেরও অপছন্দ ছিল। তাঁর পরিকল্পনা ছিল দিয়েমের পরিবর্তে একজনকে প্রধান মন্ত্রী করে বসানো, যাতে সামরিক এবং অসামরিক ক্ষমতা দ্বিধা-বিভক্ত থাকে। আমেরিকার পছন্দসই মানুষ অবশ্য ছিলেন হুয়েন তন হোয়াঙ। হোয়াঙকে নিঃশব্দে লালন-পালন করেছিলেন একজন মার্কিন ক্যাথোলিক আর্চবিশপ। যেমন দিয়েমকে ব্যক্তিগত শিক্ষাধীনে মানুষ করে তুলেছিলেন কার্ডিনাল স্পেলম্যান। হোয়াঙ ছিলেন দাই ভিয়েত (বৃহত্তর ভিয়েতনাম) দলের প্রধান অংশের নেতা। প্রাক্তন মান্দারিনদের মধ্যে চরম দক্ষিণপন্থী অংশ, বড় বড় জমিদার ও সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের নিয়ে গঠিত এই 'দাই ভিয়েত' দল। সামরিক দলের জেনারেলদের নেতা হুয়োঙ ভান্ মিন্, হোয়াঙকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা হস্তগত করেই তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকৃত হন।

খান্ অভ্যুত্থান।

হুয়েন খান্ ও হারকিন্স এবার 'জুনটা' জেনারেলদের হাত থেকে ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত শুরু করলেন। হোয়াঙকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দেবার অংগীকার করলেন খান্। সুতরাং নতুন আরেকটি অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলল। এই অভ্যুত্থানের সাংকেতিক নাম হওয়া উচিত ছিল 'হারকিন্সের প্রতিশোধ।' 'জুনটা' এতদিন ধরে যে প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আসছিল, খান্ সেটাকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রস্তাবটি ছিল—মার্কিন অফিসারেরা ২৮টি জেলার সর্বময় সামরিক তথা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করবে; সায়গনের সৈন্য ও অফিসারেরা নিরঙ্কুশভাবে মার্কিন অফিসারদের তাঁবেদারীতে থাকবে, এবং হুয়েন তন হোয়াঙকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দেওয়া হবে।

বছরের শেষ দিকে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারা সায়গনে এলেন; এবং ১৯৬৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখে নিউজ উইক

পত্রিকায় 'জুনটা' জেনারেলদের প্রতি তাঁর উক্তি উদধৃত করা হল: "বর্ষা শেষ হয়ে খরার দিন এসে গেছে; এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা আগের চাইতে এখন অনেক সহজ। ক্ষয়-ক্ষতির উদ্বেগ আপনারা ভুলে যান। এমন ভাবে যুদ্ধ চালান, যেন এইটাই হল আপনাদের শেষ সুযোগ—কারণ, এইটাই শেষ সুযোগও হতে পারে।" এবং সত্যিই, সেটা ছিল 'জুনটা'র শেষ সুযোগ।

ইউ. পি. আই. এর ভাষায়, ১৭ই জানুয়ারি তারিখে 'সামরিক ইতিহাসে সর্ববৃহৎ হেলিকপ্টার-বাহিত আক্রমণ' শুরু করা হল মেকং-এর প্রদেশের থান্ ফু'তে। ৫০টি হেলিকপ্টার, ৩০০০ সৈন্য, ১৬টি এম-১১৩ ট্যাংক, নৌবহরের ১৬টি পোত এবং কয়েক ডজন বিমান—এই নিয়ে আক্রমণ চালানো হল একটি 'গেরিলা শিবিরে'র উপরে। হার্কিন্সের 'পশ্চাদপসরণ, একত্রীকরণ ও পুনর্দখল' কৌশলের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের সব চাইতে বড় প্রমাণরূপে এই অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীর 'মোবাইল স্ট্রাইক ফোর্স' গঠন করা হয়েছিল 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট'গুলো থেকে সরিয়ে আনা সৈন্যদের নিয়ে।

হেলিকপ্টারের প্রথম চারটি তরংগকে মুক্তি ফৌজ বিনা বাধায় আসতে দিল। পঞ্চম তরংগটি আসতেই সক্রিয় হয়ে উঠল তাদের আগ্নেয়াস্ত্র। ভূপাতিত হল দুটি; আর ক্ষতিগ্রস্ত হল পনেরটি হেলিকপ্টার। সংঘর্ষ এড়াবার উদ্দেশ্য থাকলে মুক্তি ফৌজ হেলিকপ্টারের প্রথম দলটিকেই আক্রমণ করতে পারত; এবং অতগুলো হেলিকপ্টারের ক্ষয়-ক্ষতির পর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটত সেখানেই। কারণ, এই লড়াইকে 'মার্কিন হেলিকপ্টার অভিযানের অন্যতম নিদারুণ বিপর্যয়' বলে মন্তব্য করেছিল এ. পি.।

আক্রমণের ঢেউ এগিয়ে আসতে দেখেও মুক্তি ফৌজ কিন্তু ছিল নিষ্ক্রিয়। সায়গন বাহিনীর কোন সৈন্য পালাবার চেষ্টা করলে তাকে গুলি করে মারবার জন্য উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পিছন থেকে তাদের উৎসাহিত করছিল অফিসারেরা। আসলে মুক্তি ফৌজ অপেক্ষা

করছিল যাতে সায়গন বাহিনীর অফিসারেরা গুলির আওতার মধ্যে এসে পড়ে। এবং সেই মতলব সিদ্ধ হতেই শুরু হল মুক্তি ফৌজের পাল্টা আক্রমণ। সংগে সংগে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল আক্রমণকারীব ঢেউ।

এইবার শুরু হল আদর্শ পন্থায় লড়াই : আরো বোমা ও গোলা বর্ষণ ; মধ্য স্থল, দক্ষিণ ও তার পর বাম পার্শ্ব থেকে আক্রমণ ; তারপর দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের শেষ প্রান্ত থেকে যুগপৎ আক্রমণ এবং তার ফাঁকে ফাঁকে বোমা ও গোলা বর্ষণ। লড়াই চলল দুই দিন ধরে। তারপর সায়গন বাহিনী ছত্রভঙ্গ হতে আরম্ভ করল।

মার্কিন প্রতিবেদনে এই লড়াইয়ের ফলাফলকে 'হেলিকপ্টার ধ্বংসের সর্বাপেক্ষা কলংকময় অধ্যায়' বলে উল্লেখ করা ছাড়াও 'নগণ্য সাফল্য এবং নৈরাশ্যজনক' বলে অভিহিত করা হয়। বস্তুত এটি ছিল সায়গন কমাণ্ডের এক বিপর্যয়কারী পরাজয়। 'ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে উদ্বেগ' পরিহার করতে ম্যাকনামারা যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সে উপদেশ 'জুনটা' মান্য করেছিল। মুক্তি ফ্রণ্টের হিসাব অনুসারে সায়গন বাহিনীর নিহত ও আহত হয়েছিল ছয়শ জন। এই অভিযানের নেতৃত্ব করেছিলেন 'জুনটা' সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, লি-ভ্যান-কিম্ স্বয়ং। 'জুনটা'র অন্যান্য সদস্যদের সংগে আলাপ-আলোচনা করার জন্য তিনি সায়গনে ফিরে গেলেন। এই পরাজয়ের কি এই অর্থ ছিল যে, তাঁরা তাঁদের শেষ সুযোগ হারিয়েছেন ?

থান-কুব বিপর্যয়ের দিন দশেক পরে, সামরিক 'জুনটা'র এক বিতর্কিত অধিবেশন শুরু হল। ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট দ্য গল সবাইকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে, দক্ষিণ ভিয়েতনামসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন। নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সমাধানের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করায়, সায়গনের প্রায় গোটা ছয়েক সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু ফরাসী শিক্ষা প্রাপ্ত সব কয়জন 'জুনটা' প্রধানই, এই অসম্ভব সামরিক পরিস্থিতি এবং যে কোনো ধরনের নিরপেক্ষতা-ভিত্তিক

আপস মীমাংসার অপরিহার্যতা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। সবাই যে এ ব্যাপারে একমত হলেন তা নয়; নুয়েন খানের মতো আরো অনেকেই এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করলেন। কিন্তু সমর্থন করলেন মিন্, ডন্, ডিন্ এবং কিম; কেউ বা আংশিকভাবে, কেউ বা সম্পূর্ণভাবে। দিয়েমবাদে প্রত্যাবর্তন—অর্থাৎ 'জুনটা' একনায়কত্বে তালগোল না পাকিয়ে, অথবা নিরপেক্ষতার প্রস্তাব নিয়ে ভান করার বদলে, শক্তিশালী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোনো অভ্যুত্থানের ব্যাপারে ক্যাবট লজ এ যাবৎ বাধা দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আর পারলেন না। রাষ্ট্রদূত লজের শেষ বাধা ভেঙে হারকিন্সের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সহজতর করে দিল উপরের ঘটনা। স্থির হল, খান হবেন সেনাবাহিনীর নতুন সর্বাধিনায়ক; যুদ্ধের ব্যাপারে সর্ব পর্যায়ে তিনি নির্বিবাদে মার্কিন নির্দেশ মেনে চলবেন। নুয়েন তন হোয়াঙ হবেন প্রধানমন্ত্রী। এবং কোন না কোন ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা আবার ফিরিয়ে আনা হবে।

সুতরাং, চক্রান্ত অনুযায়ী হারকিন্স একদিন গেলেন 'সায়গনের বাইরে'; আর সেই অবসরে হল অভ্যুত্থান। 'জুনটা'র পক্ষ হয়ে একটি গুলিও কেউ নিক্ষেপ করল না। প্রধান প্রধান 'জুনটা' জেনারেলরা সবাই বন্দী হলেন। 'শেষ সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন' এবং হারিয়েও ফেলেছিলেন তা।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর নুয়েন খান কিন্তু একটি ব্যাপারে মার্কিনদের হাতের পুতুল হতে রাজী হলেন না। অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করবার ভানটুকুও অন্ততঃ করা হবে—এই আশ্বাস প্রদান করে অভ্যুত্থানের ব্যাপারে লজের সমর্থন আদায় করা হয়েছিল। এ সম্বন্ধে হারকিন্সের সম্ভবতঃ এতটুকুও মাথাব্যথা ছিল না। সুতরাং নুয়েন খানও পূর্ব-প্রতিশ্রুতি পালনে স্রেফ অসম্মত হলেন। সাফ জানিয়ে দিলেন, ক্ষমতা ভাগ তিনি করবেন না; সামরিক ও অসামরিক সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণ করবেন তিনি নিজেই। এর অবশ্য বিশেষ কারণও ছিল। প্রশাসনের অসামরিক বিভাগই সাহায্যপ্রাপ্ত মার্কিন

ডলার নিয়ে নাড়াচাড়া করে ; আর তাই থেকে আসে প্রচুর আর্থিক পুরস্কার।

একটি বিষয়ে অবশ্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন খান্। প্রাক্তন 'জুনটা'-প্রধান দুয়োঙ ভান মিন্'কে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়েছিল। তাঁকে মুক্তি দিয়ে ক্ষমতাহীন, নামেমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান করতে সম্মত হলেন গুয়েন খান্।

মুক্তি ফ্রণ্টের মূল্যায়ন

গুয়েন খান্ ক্ষমতা দখল করবার প্রায় মাস খানেক পর একদিন আমি প্রেসিডেন্ট হুয়েন হু থো'কে মুক্তিফ্রণ্টের দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বোক্ত দুটি অভ্যুত্থানের ফলাফলের মূল্যায়ন করতে অনুরোধ করেছিলাম।

জবাবে তিনি বলেছিলেন, "দুটি অভ্যুত্থানই আমাদের পক্ষে স্বর্গীয় আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছে। সামরিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক, সমস্ত দিক থেকেই শত্রুপক্ষ হয়ে পড়েছে ভয়ানক দুর্বল। লড়াইয়ের ময়দানে ওদের সেনাবাহিনী প্রচণ্ড মার খেয়েছে। তার উপরে, পালিয়েও গেছে বহু সৈনিক। দিয়েমী কর্তৃত্বের সব চাইতে বড় সমর্থক যে দুর্ধর্ষ বিশেষ সেনাবাহিনী ছিল, তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বারংবার বহিষ্কারের ফলে সামরিক কমাণ্ড হয়ে গেছে তছনছ এবং দুর্বল।

"বছরের পর বছর ধরে অতি যত্নে দিয়েম যে দমনমূলক হাতিয়ার তৈরী করেছিলেন, তাও ওই একই কারণে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে ; বিশেষ করে ভিত্তিমূলে। দিয়েমী শাসনতন্ত্রের নিরাপত্তা তথা বিপ্লবী আন্দোলন দমনের ব্যবস্থা মূলতঃ নির্ভরশীল ছিল নিরাপত্তা বিভাগ ও গুপ্ত পুলিশের প্রধান প্রধান কর্তা ব্যক্তিদের উপর। তারা সবাই খতম হয়ে গেছে। অনেককে আবার সরিয়েও দেওয়া হয়েছে।

"সেনা বিভাগের সৈনিক ও অফিসার থেকে নিয়ে প্রশাসন

বিভাগের কর্মী পর্যন্ত সবাই আজ দিশাহারা হয়ে পড়েছে। কর্তাদের উপরে কারো আর আস্থা নেই। এবং আনুগত্য প্রদর্শন করবে কার প্রতি, তাও কারো জানা নেই। দেশপ্রেমিক শক্তির বারংবার জয়লাভে মনোবল ওদের আগেই ভেঙে গিয়েছিল। এখন একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

"রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের শত্রুপক্ষ যে কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তা আরো স্পষ্ট করে বোঝা যায়। দিয়েমী শাসনতন্ত্রের মুখ্য সমর্থক ছিল কতগুলো প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল। যেমন, শ্রমিক এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংগঠন, জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন, নব্য প্রজাতন্ত্রী দল, মহিলা সংহতি আন্দোলন ইত্যাদি। এগুলো সব ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যে ভাবেই হোক, দক্ষিণ ভিয়েতনামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলেই যে নুয়েন খানের শাসনতন্ত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, এই ঘটনাই জন্মমুহূর্ত থেকে হয়েছে তার কাল। কি দেশের ভিতরে, কি বাইরে, এই শাসনতন্ত্র হয়ে পড়েছে একেবারে বিচ্ছিন্ন।"

বিপ্লবী জনতা পার্টির ত্রান নাম ক্রুঙকেও আমি ওই একই প্রশ্ন করে আরো স্পষ্ট উত্তর পেয়েছিলাম। বলেছিলেন, "সামরিক বিপর্যয়ের দায়িত্ব আমেরিকা চাপাচ্ছিল দিয়েম ও নু'র ঘাড়ে: আর দিয়েম এবং নু দোষারোপ করছিলেন মার্কিনদের। জনসাধারণের চোখে ধুলো দেবার জন্য আরো আধুনিক নীতি অনুসরণ করতে চাইছিল আমেরিকানরা। তারা চাইছিল মনোবলের অধোগতিকে রুখতে এবং অধিকতর বশম্বদ পুতুলদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে। তাই তারা 'মাঝ দরিয়ায় ঘোড়া বদলানো'র মতো সাংঘাতিক পথ বেছে নিয়েছিল।"

"কিন্তু বাস্তব সত্য হল, দিয়েমের চাইতে যোগ্যতর ঘোড়া তারা বৃথাই খুঁজে মরবে। সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি এবং মূঢ় অপরাধমূলক কার্যকলাপ সত্ত্বেও, নয় বৎসরে দিয়েম নিজের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করে, একটি সেনাবাহিনী, একটি প্রশাসন ব্যবস্থা এবং কোন-না-কোন

ধরনের রাজনৈতিক যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমেরিকা এবং সম্ভবতঃ লজেরও ধারণা ছিল, ভ্রাতা নূকে সরিয়ে দিতে পারলেই দিয়েম আরো বশম্বদ হয়ে পড়বেন। প্রচণ্ড কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও নূকে 'একগুঁয়ে' এবং 'শক্ত মানুষ' বলে মনে করা হত। কারণ ওয়াশিংটনের আদেশ বশম্বদ ভৃত্যের মতো মান্য করতে তিনি আদৌ রাজী ছিলেন না; বিশেষ করে শেষের দিকে। কিন্তু প্রথম অভ্যুত্থানটি ওয়াশিংটনের আশার কিছুটা বিপরীত দিকে চলে গেল। কারণ, অভ্যুত্থান ঘটালো সেনা বাহিনী; এবং তারা দিয়েম ও নূ উভয়কেই হত্যা করল।

"এর ভিতরে ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া, অভ্যুত্থানের পরেও দিয়েম জীবিত থাকলে তাঁর প্রতিক্রিয়া কি ধরনের হবে, এবং দিয়েমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানো হল অথচ তাঁকেই খতম না করলে জনসাধারণের রোষ-বহ্নি কি ভাবে সামাল দেওয়া যাবে, সে ভয়-ভাবনাও ছিল। যে শাসন ব্যবস্থার সাহায্যে দিয়েম ক্ষমতা দখলে রেখেছিলেন, সেই শাসন ব্যবস্থাকে নতুন 'জুনটা' যে সমূলে ধ্বংস করে ফেলতে মনস্থ করে, তার কারণও ছিল এই। অন্যথায় ভয় ছিল দিয়েম সমর্থকেরা হয়ত ওই শাসন ব্যবস্থার সাহায্যেই ক্ষমতা পুনর্দখল করবে। কর্নেলের পদ অবধি তাই একশ'য়েরও বেশী অফিসারদের সেনা বাহিনী থেকে বিতাড়িত করা হয়, এবং প্রাদেশিক ও জেলা পর্যায়ে দিয়েমের অনুগত বহু সরকারী কর্মচারীকে তাড়ানো হয়। এ ছাড়া গোয়েন্দা পুলিশের সম্পূর্ণ যন্ত্রটিকেই ভেঙে ফেলা হয়েছিল। অতীতে এই সরকারী যন্ত্রগুলোকে হিংস্রভাবে জনসাধারণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে, জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ 'জুনটা' যে এই সমস্ত কাজ করেছিল, তা নয়। আসলে 'জুনটা'র ভয় ছিল এই যন্ত্রগুলোকে হয়ত আবার তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।

"জুনটা জেনারেলদের তিনটি দলের অনুগামীরাই সেনা ও প্রশাসন বিভাগের ভিতরে আপন আপন প্রভুদের জন্য লড়াই

চালিয়ে যাচ্ছিল। ফলে দেখা দিয়েছিল চরম বিশৃঙ্খলা, এবং কেন্দ্রের ক্ষমতার প্রতি আস্থার সম্পূর্ণ অভাব। এই কারণেই গ্রামাঞ্চল তথা সায়গনে সর্বাত্মক তৎপরতা জোরদার করবার ব্যাপারে উক্ত পরিস্থিতিকে আমরা কাজে লাগাতে পেরেছিলাম। এক এক বারে ১০ থেকে ১০টি করে কয়েক শত 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'কে মুক্ত করা হয়েছিল; এবং সব কয়েকটি রণাঙ্গনেই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বিজয় অর্জন করতে আমরা সমর্থ হই। এ ছাড়া, সায়গনের কল-কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলগুলোতে শ্রমিক, শিক্ষক ও ছাত্রদের আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। কল-কারখানার মধ্যে সবচাইতে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয় সূতী কলগুলোতে। আন্দোলনের মূল দাবী ছিল, উন্নততর আর্থিক অবস্থা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও শ্রমিক সংস্থা থেকে পুলিশের গুপ্তচরদের বিতাড়ন।

"এই সময় একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটে। শহরে জনতার বিভিন্ন অংশের মধ্যে 'শান্তি ও নিরপেক্ষতা'র দাবিতে বেশ জোরদার আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই। কিন্তু একে ব্যাপক এবং তীব্র গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয়েছিল দুটি অভ্যুত্থানের পরবর্তী সংকটজনক পরিস্থিতির সুযোগেই। বর্তমানে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও উন্নততর জীবনযাত্রার দাবির উপর ভিত্তি করে শহরগুলোতে ব্যাপক কর্মতৎপরতা গড়ে তোলবার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। বাধাতামূলক সরকারী অনুমোদন প্রথার বিলোপ এবং অন্যান্য দাবিতে ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রগুলো হয়ে উঠেছে সোচ্চার। প্রথম অভ্যুত্থানের পর শত্রুরা পরিস্থিতিকে সুস্থিত করতে পারেনি। সর্বস্তরে বিশেষ করে সেনা বাহিনীতে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে গড়িয়ে চলেছে। দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের কারণ ছিল এই। অবশ্য আর একটি কারণও ছিল। আমেরিকানরা চেয়েছিল আরো অনুগত একজন ভৃত্য; অধিকতর দক্ষ একজন পুতুল, যার ফরাসীদের প্রতি কোনোরকম দুর্বলতা সন্দেহাতীতভাবে অনুপস্থিত থাকবে।"

ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ আরো একটি কথা বলেছিলেন। দিয়েম-বিরোধী অভ্যুত্থানের পর জনতার কোন কোনো অংশে আমেরিকার সম্মান সামান্য বৃদ্ধি পায়। কারণ দিয়েমকে লোকে এত ঘৃণা করত যে, 'তাঁর চাইতে আর খারাপ কিছু হতে পারে না' বলে জনসাধারণের মনে ধারণা জন্মে গিয়েছিল। জনসাধারণের মনোভাব এই ভাবেই শুরু থেকে হুয়েন খান-এর বিরোধী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে তিনি যখন মিনকে বন্দী করেন এবং মিন-এর দেহরক্ষীকে হত্যা করেন। কারণ ওই দেহরক্ষীই দিয়েম এবং নুকে হত্যা করেছিল। এর ফলে উক্ত অভ্যুত্থান যে খাঁটি 'আমেরিকায় প্রস্তুত' তা জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে ক্রোধের আগুন নতুন করে জ্বলে ওঠে।

হুয়েন হু থো আরো বলেছিলেন, "জনসাধারণকে প্রকৃত ব্যাপার বোঝাতে আমাদের একটুও বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু আমাদের কাছে সব চাইতে বড় আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছিল ম্যাকনামারার আগমন; গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণকালে ম্যাকনামারা যখন হুয়েন খানের বাহু ধরে চীৎকার করে বলেছিলেন, 'ইনিই হলেন আমাদের লোক।' এতে আমাদের প্রচারকর্মীদের বহু পরিশ্রম বেঁচে যায়।"

ম্যাকনামারা ভেবেছিলেন, তাঁর পক্ষে ভিয়েতনামে আসা এবং হুয়েন খানকে জনসাধারণের কাছে 'বিক্রি' করাটা খুব প্রয়োজনীয়; জনসাধারণকে নানাভাবে বোঝানো দরকার যে খানের প্রতি আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কারণ, স্বদেশে খানের যে এতটুকুও জনসমর্থন নেই সেকথা ওয়াশিংটনের জানা ছিল। কিন্তু জেনারেলদের মধ্যে একমাত্র লোক ছিলেন হুয়েন খান, যিনি আমেরিকার শর্ত অনুসারে 'কম্যুউনিস্ট হত্যা' চালিয়ে যেতে সম্মত ছিলেন। বস্তুতঃ দক্ষিণ-ভিয়েতনামের জনসাধারণের কাছে ম্যাকনামারা যা বলেছিলেন, তার অর্থ হল, 'হুয়েন খানের আপনাদের সমর্থনের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদের সমর্থনই তিনি পেয়ে গেছেন।' যাই হোক, খানের সৈন্যেরা যখন আক্রমণাত্মক অভিযান চালাতে অস্বীকার করল,

এবং কিছুটা রক্তক্ষয়ের পরও যখন সেনাবাহিনী থেকে পলাতকের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল, তখনই সম্ভবতঃ চৈতন্যোদয় হল ওয়াশিংটনের। তারা বুঝলো, কেবলমাত্র তাদের সমর্থনই যথেষ্ট নয় ; আরো কিছুরও প্রয়োজন রয়েছে।

সমস্ত দিয়েমী সংগঠন ভেঙে দেবার ফলে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা এখনো পূর্ণ হয় নি। অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ হবার সম্ভাবনাও নেই। এই ধরনের শূন্যতার ফলস্বরূপ যে হতাশাময় দুর্বলতার জন্ম হয়, সে কথা ওয়াশিংটন জানে। তাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত আমেরিকানরা এই শূন্যতা পূরণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। খান ক্ষমতা দখল করবার সংগে সংগে মার্কিন সাংবাদিকরা লেখেন যে, খানই একমাত্র মানুষ যিনি ধর্মীয় দলগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে সমর্থ। এবং, এর কয়েক দিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হয় যে, কাও দাই অথবা হোয়া হাও কিংবা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের অমুক অমুক সর্দার খানের দলে যোগদান করেছে। মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র এবং মার্কিন সরকারের সম্মতি নিয়েই এর আগে দিয়েম এই সমস্ত ধর্মীয় দলকে দমন করেছিলেন। সুতরাং এই নতুন আশার বাণী কেমন সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। দেখা গেল, ক্ষমতা দখলের সাত দিনের মধ্যেই খানের মার্কিন-বৈমানিক-চালিত বিমান বহর বেন্-কান-এর উপরে ৬০ টন বোমা বর্ষণ করেছে। সায়গন নিয়ন্ত্রিত এলাকার মধ্যে তে-নিন-এর পরেই বেন্-কান হল কাও দাইদের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র। এই বোমা বর্ষণে এক হাজার গৃহ ভস্মীভূত হয় ; নিহত হয় ৮৪ জন মানুষ এবং আহত হয় ২০০ জন। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ এমন সাংঘাতিকভাবে ফেটে পড়ে যে, খান, ক্যাবট লজ ও হারকিন্স, তে-নিন্-এ ছুটে যান এবং নিহত প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য ২০০০ ও শিশুর জন্য ১০০০ পিয়াস্ত্রা করে ক্ষতিপূরণ দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। আর, তে-নিন-এর শিশুদের হাতে মিষ্টান্ন বিতরণরত খানের ছবি তুলতে থাকেন ফটোগ্রাফাররা। বিক্ষোভ কিন্তু তবুও প্রশমিত হয়

নি। একটি জনসভায় খান যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন আবার বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। অগত্যা সেই জনসভাতেই নিহত প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্কের মূল্য ৫০০০ ও শিশুর মূল্য ২০০০ পিয়াস্ত্রা করে বৃদ্ধি করা হয়। ফাউ উপহার হিসাবে লি-ভান-তাত নামক জনৈক কুখ্যাত কাও-দাই জেনারেলকে, খান, তেন-নিন্ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের পরিধি হ্রাস পেতে পেতে এসে ঠেকেছিল তে-নিন্ শহরের বাইরে মাইল দুয়েক স্থান অবধি।

কিছু সংখ্যক কাও-দাই এবং হোয়া-হাও সর্দারকে খান অবশ্য ঘুষ দিয়ে ক্রয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তারা ছিল সেই একই লোক যাদের ইতিপূর্বে বহুবার জাপানী ও ফরাসীরা এবং এইবার মার্কিনরা কেনা-বেচা করেছে। নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোকজনদের নিয়ে তারা খান অথবা খানের উত্তরাধিকারী রূপে ওয়াশিংটন-নির্বাচিত কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো প্রকারের রাজনৈতিক সমর্থন সৃষ্টি করতে পারবে কিনা, সেটা অন্য ব্যাপার। এই প্রশ্নটিই আমি অবশ্য করেছিলাম ত্রান্ নাম্ ক্রুঙ-কে।

জবাবে তিনি বলেছিলেন: "বেশী অর্থ যে দেবে, কাও-দাই এবং হোয়া-হাও সর্দাররা তার পক্ষেই যোগদান করবে। এটা আজ নয়, বহু বৎসর ধরেই হয়ে আসছে। এবং উভয় গোষ্ঠীর লোকেরাই সে কথা জানে। যতবারই সর্দাররা পক্ষ পরিবর্তন করেছে, ততবারই ওদের সাধারণ মানুষের পক্ষে ফল হয়েছে আরো মৃত্যু, আরো দুর্দশা এবং অধিকতর শোষণ। অতীতে বহুবার কাও-দাই এবং হোয়া-হাও গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষ অসীম দুঃখ-দুর্দশা বরণ করেছে; আর আর্থিক লভ্যাংশ ভাগাভাগি হয়েছে সর্দারদের ভিতরে। গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের চরমতম দুঃখ-দুর্দশার সময়, লি-ভান্-তাত কোনো দিনই পাশে দাঁড়িয়ে থেকে দুঃখ-দুর্দশার অংশীদার হয় নি, কিংবা কোনো রকম সাহায্য করে নি। কাও-দাই এবং হোয়া-হাও গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষ হল কৃষিজীবী। ফ্রন্টের দৌলতে তারা সবাই এখন

নিজের নিজের জমি পেয়েছে। অন্যান্য কৃষকদের মতো, ওরাও নিজের জমির জন্য জান দেবে। ওরা যে কৃষক, এইটিই হল প্রাথমিক সত্য। গোষ্ঠীগত আনুগত্য হল তার পরে। যে সমস্ত কাও দাই সর্দার সত্য-সত্যই গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের সেবা করেছে, তারা অধিকাংশই যোগ দিয়েছে ফ্রন্টে। বাকিরা ফ্রন্টকে সমর্থন করে। হোয়া-হাও গোষ্ঠীতেও সেই একই ব্যাপার। আর, বিন্-জুয়েন গোষ্ঠী তো সম্পূর্ণরূপেই ফ্রন্টের সংগে যোগ দিয়েছে। খান এবং মার্কিনরা এই সমস্ত গোষ্ঠীর আস্থা অর্জনের চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু আস্থা অর্জন করা হবে অসম্ভব।"

অপর যে রাজনৈতিক শক্তির উপর মার্কিন আশা-ভরসা নির্ভর করে রয়েছে, তা হল ইতিপূর্বে উল্লিখিত দাই-ভিয়েত দল। দল হিসাবে খুবই ছোট। জনতার সংগেও কোনো যোগাযোগ নেই। ফ্রড-এর ভাষায় ওরা হল 'ডলার শিকারী'। এই দাই-ভিয়েত দল ইতিমধ্যেই একাধিক অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ প্রধান মন্ত্রী হিসাবে প্রতিটি দলেরই রয়েছে আপন আপন মনোনীত ব্যক্তি। এদের মধ্যে একজন হলেন ফুয়েন্ ছান্ থি। ১৯৬০ সালে নভেম্বর মাসের সামরিক অফিসারদের ব্যর্থ অভ্যুত্থান সংগঠিত করবার ব্যাপারে ইনি সহায়তা করেছিলেন। খান ক্ষমতা দখল করবার এগারো দিন পরে, ১৯৬৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখ আর একবার তিনি খানের বিরুদ্ধে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করেন। খান-এর অতি সহজে ক্ষমতা দখল করা দেখে নিশ্চয়ই তাঁরও মনে উৎসাহ জেগেছিল। কিন্তু এবারও তিনি বিফল হন। যাই হোক, দাই-ভিয়েত দলের কোনো অভ্যুত্থান যদি সফলও হয়, তবুও দিয়েমী সংগঠনগুলোর ধ্বংসের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পরিপূরণের ক্ষমতা তাদের নেই। তা ছাড়া, ভিয়েতনামী সমাজের সামান্যতম অংশেরও প্রতিনিধিত্ব ওরা করে না। সুতরাং ফ্রন্টের প্রতিপক্ষ হিসাবে এদের অবস্থা হল, সায়গনের জনৈক মুক্তিফ্রন্ট নেতার ভাষায় 'আগুন নিভাবার জলের নল দিয়ে সমুদ্রকে পেছনে ঠেলে দেবার চেষ্টা'র মতো।

সেনাবাহিনীর জেনারেল এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সামান্য যে কয়েকজন ডলার লভ্যাংশের লোভে যে-কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত রয়েছেন তাঁদের পক্ষে বিরাট মুশকিলের ব্যাপার হল 'কোন্' আমেরিকার প্রতি 'আনুগত্য প্রকাশ' করতে হবে তা তাঁরা জানেন না। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কারণে, প্রতিটি দলই হল ওয়াশিংটনের পক্ষে বিরাট ঝুঁকিস্বরূপ। অভ্যুত্থান মনোভাবাপন্ন কোনো দল যদি নিজেকে দক্ষ এবং বশম্বদ বলে প্রমাণ করতে পারে, এবং সাফল্যের সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে সেই দলকে ওয়াশিংটন অবশ্যই সমর্থন করবে। কিন্তু সম্ভাব্য দক্ষতা ও বশম্বদতা বিচারের ব্যাপারে দূতাবাস, সামরিক কমাণ্ড এবং সিয়া (C. I. A.) প্রত্যেকেরই মূল্যায়ন হল ভিন্ন ভিন্ন। অত্যুৎসাহী এবং চরম পুতুল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিও উপরিউক্ত তিনটির মধ্যে কার হাতের ক্রীড়নক হতে হবে তা বুঝে উঠতে দুশ্চিন্তায় হিমসিম খেয়ে যায়। কারণ, নির্বাচনে ভুল হলেই চরম বিপদ। যত আনুগত্য সহকারেই কাজ করা যাক না কেন, এবং বিশ্বস্ততার জন্য যত নির্বাধ প্রশংসাই বর্ষিত হোক না কেন, নির্বাচনে ভুল হলেই তাকে হয় তো দি.যম এবং নু'র মতো রক্তস্রোতের মধ্যে শেষ হতে হবে। অথবা তৃতায় ভ্রাতা ক্যান্‌কে মার্কিন কনসাল যেমন গিলোটিনে নিহত হবার জন্য জল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তেমনি যেতে হবে জল্লাদের কবলে। কিংবা সিয়ার নিজের হাতে গোপনে তৈরী ইদানীং কালের 'স্পেশাল ফোর্স'-এর লোকদের জল্লাদের দল যেমন কর্নেল লি-কোয়াঙ-তুঙ সহ সবাইকে সারবন্দীভাবে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছিল, সেইভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ভুল লোককে নির্বাচিত করে অতি বিশ্বস্তভাবে কাজ করবার এই হবে পুরস্কার।

আর 'জুনটা' জেনারেলদের অবস্থা? মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে নিজেদের ভাগ্য বাঁধা দেবার অপরাধে, তিন মাসের মধ্যে সকলের জেল হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে অতি ভাগ্যবান কয়েকজন বেঁচে যান অধঃস্তনদের ফাঁসিকাঠে অর্পণ করে। আর দুয়েন খান

নিজে? তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, অন্তরঙ্গ সহকর্মী এবং সহচক্রান্ত-কারীকে ১৯৬৪ সালের মে মাসে যখন সায়গন কমাণ্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন কি তিনি খুব নিরাপদ বোধ করেছিলেন?

সরিয়ে দেবার কারণ খান জানতেন। সেই 'কারণ' তিনি ছিলেন নিজেই। তিনি, জেনারেল হুয়েন খান, যিনি 'কম্যুনিস্ট নিধন' সম্পর্কে অগ্নিগর্ভ সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনিই তাঁর পূর্বসূরীদের চাইতে অনেক দ্রুত এবং আরো অধিক পরাজয় বরণ করেছিলেন। এ কথাটা খান ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি সময়েও যদি না বুঝে থাকেন, তা হলে তিনি যে অতি সরল একজন মানুষ তা মানতেই হবে। কারণ, ওই সময়েই সিয়ার সুদক্ষ ব্যক্তিরা জেনারেল ও কর্নেলদের দলিল-পত্র ঘেঁটে পরবর্তী পছন্দসই লোকের জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সিয়া তার অভ্যুত্থান এখনো ঘটায় নি।

নতুন কোনো লোককে একবার চেষ্টা করে দেখতে রাজি করাতে ওয়াশিংটনের যদি সেই সময় অসুবিধা হয়ে থাকে, তা হলে, যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা হাতে নিতে উৎসুক ব্যক্তিদের উভসংকটময় অবস্থাটিকে উপলব্ধি করা উচিত।

স্টেট ডিপার্টমেণ্ট ও পেণ্টাগনের নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিরাট প্রচেষ্টা হিসাবে ১৯৬৪ সালের ন মাসে জেনারেল ম্যাকসওয়েল টেলরকে ক্যাবট লজের পরিবর্তে সায়গনের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগ কেবলমাত্র রাষ্ট্রদূতরূপেই ছিল না; ছিল আরো কিছু বেশী। টেলর ছিলেন মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধি-নায়কদের যুক্ত কমিটির সভাপতি এবং 'বিশেষ যুদ্ধে'র মুখ্য প্রবক্তা। এইরূপে সামরিক এবং অসামরিক উভয় বিষয়ই ম্যাক্সওয়েল টেলরের হাতে আসে। ঠিক দশ বৎসর পূর্বে ফরাসী সরকার যা করেছিলেন তার সংগে এর অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। ফরাসী সরকার সেই সময় তাঁদের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, জেনারেল পল এলি-কে সায়গনে প্রেরণ করেছিলেন অসামরিক ও সামরিক কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য।

জেনারেল টেলরকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরণ করে প্রেসিডেন্ট জনসন প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই যেন বলেছেন : 'তুমিই আমাদের এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়েছো ; এবার তুমিই আমাদের এর ভিতর থেকে উদ্ধার করো।' 'বিশেষ যুদ্ধ' যেমন ছিল টেলরের মানস-সন্তান, তেমনি এই যুদ্ধ জয় করবার উদ্দেশ্যে আবিষ্কৃত ১৯৬১ সালের স্ট্যালে-টেলর সমর কৌশলেরও তিনি ছিলেন যুগ্ম-জনক। দুটিই হয়েছিল ব্যর্থ। জেনারেল টেলর যে একজন দক্ষ সেনাপতি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দক্ষ সেনাপতি ছিলেন ফ্রান্সের দ্য ল্যাত্রে দ্য তাসিনি-ও। কিন্তু তাঁকে পাঠানো হয়েছিল অসাধ্য সাধনের উদ্দেশ্যে। বস্তুতঃ দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনমানসে ওয়াশিংটন ইতিমধ্যেই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছে। এই অবস্থায়, সর্বশেষ সমর কৌশল তথা নীতিও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কি ভাবে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে ? মুক্তিফ্রণ্টের নিয়ন্ত্রনের ব্যাপ্তি।

আর কত দিন চলবে এই যুদ্ধ ? কি ভাবেই বা ঘটবে এর সমাপ্তি ? মুক্তিফ্রণ্টের অতি দায়িত্বশীল সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংগে এই তুটি প্রশ্ন নিয়ে আমি বারংবার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। জবাব পেয়েছি বিভিন্ন ধরনের। হুয়েন হু থো এই প্রশ্নের জবাবে প্রথমে বলেছিলেন, "যতদিন প্রয়োজন, ততদিন এ লড়াই চলবে। থামবে সেই দিন, যেদিন হয় আমেরিকানরা নিজেরা থেকেই চলে যাবে অথবা তাদের চলে যেতে বাধ্য করা হবে, এবং শান্তি ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।" একই বক্তব্য আরো দৃঢ়ভাবে রেখেছিলেন খণ্ডজাতীয় সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের নেতা ইবি আলেও, "দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করবার সামর্থ্য আমাদের রয়েছে। বর্তমান পুরুষ যদি এই কাজ শেষ করতে না পারে, তা হলে আমাদের পুত্র-পৌত্রেরা নিশ্চয়ই তা করবে।"

স্পষ্ট বোঝা যায়, মুক্তিফ্রণ্টের সামরিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি আরো বেশ কয়েক বৎসর ধরে যুদ্ধ চালাবার জন্য তৈরী হয়েই তাঁদের নীতি নির্ধারণ করেছেন। জয়লাভ সম্বন্ধে তাঁরা সুনিশ্চিত। এবং সামরিক মানচিত্রে ক্রমাগত রংয়ের পরিবর্তনই তাঁদের বিশ্বাসের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করছে। আমি সেখানে থাকতেই দেখেছি, সামরিক মানচিত্রে সবুজ রংয়ের ছোপগুলো ক্রমশঃ সংকুচিত হচ্ছে ; আর সেই সঙ্গে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে লাল রং। এ ছাড়া আরো যা-যা দেখেছি ও শুনেছি, সবই তাঁদের বিশ্বাসকেই সমর্থন করে।

১৯৬৪ সালের শুরুতে যে পরিস্থিতি ছিল, সেই অনুসারে ফ্রন্টের দাবি হল, সারা দেশের দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বর্তমান। একমাত্র নাম বাদে আর সমস্ত বিষয়েই মুক্তিফ্রন্ট হল পুরোদস্তুর সুপ্রতিষ্ঠিত একটি সরকার। সামরিক, বৈদেশিক, জনস্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক, তথ্য ও শিক্ষা, ডাক ও তার, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়াদি সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি তাদের রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে মন্ত্রী দপ্তরের মতো একাধিক সংস্থা এবং সেগুলোর বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ। বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি ইতিমধ্যেই কায়রো, হাভানা, আলজিয়ার্স, জাকার্তা বার্লিন, প্রাগ ইত্যাদি স্থানে 'রাষ্ট্রদূত' নিযুক্ত করেছে। এ ছাড়া বিদেশে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের বহু দফতর খোলার কাজ আটকে রয়েছে কর্মীর অভাবে। মুক্তিফ্রন্টের সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান লিবারেশন প্রেস-এর প্রতিনিধি অধিকাংশ বৈদেশিক দূতাবাসেই রয়েছে। এই প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রদূতের প্রেস অ্যাটাশে-রূপে কার্য পরিচালনা করে থাকেন।

বস্তুতঃ যে কোনো সময়েই ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটিকে অস্থায়ী সরকারে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। হুয়েন হু থো'র সদর কার্যালয়ে থাকতেই দেখেছি, এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। প্রসংগত থো বলেছিলেন "সরকারের অস্তিত্ব এখনই রয়েছে ; তবে প্রাথমিক পর্যায়ে। নিজেদের প্রশাসনিক সংগঠন আমাদের তো আছেই। কতগুলো অর্থনৈতিক সমস্যার উপর কাজও আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। যেমন, প্রযুক্তি সংক্রান্ত মান উন্নয়ন এবং পতিত জমি উদ্ধার। সব কিছুই করা হয় পুরোপুরি গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে। যেখানে সম্ভব, সেখানে গ্রামবাসীরাই নিজেদের স্বয়ং-পরিচালনা কমিটি নির্বাচিত করে থাকে। এবং বর্তমানে এইটিই হল সাধারণ নিয়ম। জন-নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার পন্থা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে। মুক্ত-অঞ্চলে জনসাধারণের জীবন ধারাকে কি ভাবে আদর্শ-

রূপে সংগঠিত করা যায়, সেইটিই হল বর্তমানে আমাদের সামনে বিরাট এক প্রশ্ন। এই ব্যাপারে আমরা একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছি। স্বয়ং-পরিকল্পনা কমিটিগুলো গঠিত হয়েছে পুরনো প্রতিরোধ প্রথার সংগে সংগতি রেখে; এবং সেগুলো ক্রমশঃ অধিকতর যুক্তিসম্মত প্রশাসনিক রূপের দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে। জন-শৃংখলা ও নিরাপত্তার সমস্যা ইতিমধ্যেই সমাধা হয়ে গেছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রাকে সুসম্বদ্ধ ভিত্তির উপর গঠন করবার কাজও এগিয়ে চলেছে।

"পতিত জমি এবং অনুপস্থিত দেশদ্রোহী জমিদারদের জমি ভূমিহীনদের ভিতর বিলি করা, খাজনা হ্রাস ইত্যাদি আমাদের এই সমস্ত ভূমিসংস্কারের প্রভাব পড়েছে সারা দেশের একের-তিন-ভাগেরও বেশী কর্ষণযোগ্য জমির উপরে। বিদ্যায়তন, আরোগ্যশালা এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি; বিশেষ করে মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে। জিনিসপত্রের অভাবে অসুবিধা খানিকটা হচ্ছে কিন্তু এই সমস্ত পুনর্গঠনের কাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা রূপ ধরে। আমাদের কর্মসূচীর মধ্যে অবশ্য অস্থায়ী একটি সরকার গঠনের বিষয়ও রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে খুব সাবধানে, ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে।"

বস্তুতঃ দেশের বৃহত্তম অংশে দক্ষিণ ভিয়েৎনামী জনসাধারণ দ্বারা পরিচালিত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রশাসন ব্যবস্থা কাজ করে চলেছে। ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ। মুক্তিফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় এই ভাবেই সব কিছু এগিয়ে যাবে; যুদ্ধ যদি চলে তবুও। আসলে, সব চাইতে বড় প্রশ্ন হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করবে?

উৎকর্ষের চরম সীমা অবধি ঠেলে দেওয়া সত্ত্বেও 'বিশেষ যুদ্ধ' হয়েছে ব্যর্থ। মূল পরিকল্পনায় ১১,০০০ মার্কিন 'উপদেষ্টা' নিয়োগ করবার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৬৪ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পঁচিশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এবং তারা কাজ করছে কোম্পানি,

এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্লেটুন পর্যায়েও। তুই ডিভিশনের সমান বিমান বহর নিয়োগ করা হয়েছে। পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজ চালাচ্ছে মাকিন সৈন্যেরা। এর বেশী আর কিছু করতে গেলেই, লড়াইয়ে সরাসরি মাকিন সৈন্য নামাতে হয়। এবং তা করবার অর্থ হবে 'বিশেষ যুদ্ধে'র নীতি থেকে সরে গিয়ে মাকিন স্থল সৈন্য নিয়ে 'সীমাবদ্ধ যুদ্ধে' সামিল হওয়া। কিন্তু কত সৈন্যের প্রয়োজন হবে তাদের? এবং যুদ্ধ যে 'সীমাবদ্ধ'ই থাকবে, এ প্রতিশ্রুতিই বা তারা দেবে কি করে?

আলজিরিয়াতে মোট এক কোটি জনসংখ্যার বিরুদ্ধে ফ্রান্স নিয়োজিত করেছিল আট লক্ষ সৈন্য। এবং তার পরেও বাধ্য হয়েছিল আপস মীমাংসার মাধ্যমে সরে আসতে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মোট জনসংখ্যা হল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। আলজিরিয়ানদের চাইতে এদের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাও অনেক বেশী। তা ছাড়া, দেশের তুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে পাহাড় ও অরণ্য থাকার কারণে এদের ভৌগোলিক সুবিধাও আলজিরিয়ানদের চাইতে বহুগুণে অধিক। কোরিয়ার অভিজ্ঞতা আমেরিকার প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে এখনো তাজা রয়েছে। ৫৪,২৪৬ জন আমেরিকান কোরিয়াতে নিহত হয়েছিল; এবং তাদের ভিতরে ৫৮৮৪ জন ছিল বৈমানিক। এর উপর আরো এক লক্ষ তিন হাজার তু'শো চুরাশি জন হয়েছিল আহত। এ তথ্য হল খোদ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের দেওয়া। কিন্তু এত ক্ষয়-ক্ষতির ফল হয়েছিল কি? যে ৩৮ ডিগ্রি অক্ষরেখায় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেই সীমানা বরাবরই আপস মীমাংসায় আসতে হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের অরণ্যের তুলনায় কোরিয়ার ভূ-প্রকৃতি নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর পক্ষে ছিল অধিকতর অনুকূল।

উত্তর ভিয়েতনামে রয়েছে আরো এক কোটি ষাট লক্ষ ভিয়েতনামী। এদের ভিতরে রয়েছে দক্ষিণ থেকে আসা সেরা-সেরা সব সৈনিক। এবং, জেনিভা চুক্তিতে এমন কোনো ধারা ছিল না, যা উত্তরাংশে চলে যাবার পর তাদের আধুনিক সমর কৌশলের

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যোগদানে বাধা স্বরূপ হতে পারে। এই প্রসংগে ১৯৬২ সালের গোড়ার দিকে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের অধিবেশনে গৃহীত কর্মসূচীর এই অনুচ্ছেদটি লক্ষণীয় :

'এই সভা দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দালালেরা যদি রক্ত পিপাসু আক্রমণের মধ্যে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে, তা হলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ এবং জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট সংগ্রামের সর্ব রকম পদ্ধতির প্রয়োগ করবে। নিজেদের এবং দেশকে রক্ষা করবার জন্য দৃঢ়তা সহকারে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, দক্ষিণ ভিয়েতনামকে মুক্ত করতে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এবং দেশদ্রোহী একনায়কদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে ইতিকর্তব্য কিছুই বাকি রাখবে না। প্রয়োজন হলে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট নিজেদের বৈধ এবং কার্যকরী অধিকার প্রয়োগ করে, উভয় ভিয়েতনামের জনগণ ও সরকার তথা বিশ্বের তাবৎ শান্তিকামী, গণতান্ত্রিক জনগণ ও সরকারের কাছে আবেদন জানাবে—অনুরোধ করবে যেন তাঁরা সাজ সরঞ্জাম ও জনবলের সাহায্য ছাড়াও সক্রিয় সমর্থন দ্বারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনসাধারণের এই ন্যায় যুদ্ধে সহায়তা করেন। এর ফলে উদ্ভূত যে কোনো সর্বনাশা পরিণতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দালালদের।'

'বিশেষ যুদ্ধ'কে 'সীমাবদ্ধ যুদ্ধে'র দিকে ঠেলে নিয়ে গেলে উপরিউক্ত অনুচ্ছেদটিকে সর্বতভাবে কার্যকরী করা হবে। এবং সে ক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুব কম করে হলেও, তিন কোটি ভিয়েতনামীর সংগে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হবে।

উত্তর থেকে হস্তক্ষেপ

মার্কিন-সায়গন কমাণ্ডের প্রচণ্ড সামরিক বিপর্যয় শুরু হবার সংগে সংগেই আমেরিকানরা সরকারীভাবে এই সমস্ত পরাজয়ের কারণ

স্বরূপ উত্তর থেকে আক্রমণ কিংবা হস্তক্ষেপের অভিযোগে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এবং এই পুস্তকের মুদ্রণ শুরু হবার সময় পর্যন্ত যে পরিস্থিতি আমি দেখেছিলাম, তাতে 'যুদ্ধকে উত্তর দিকে ঠেলে দেবার' আশংকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অভিযোগের সমর্থনে কিছুমাত্র প্রমাণও অবশ্য এখন অবধি মেলে নি। বরং অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সেটা প্রমাণ করবার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণাদি মজুদ রয়েছে।

প্রধান সামরিক তৎপরতা যদি দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর দিকে ১৭ অক্ষাংশের নিকটে অথবা লাওস সীমান্ত সন্নিহিত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হত, তা হলে এই সন্দেহ অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত না। কারণ, সীমান্তের অপর দিক হল প্যাথেট লাওয়ের নিয়ন্ত্রণে। সামরিক দিক থেকে দেখাতে হলে পরিস্থিতিকে মানচিত্রে লাল ছোপ দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। সেই ছোপ সীমান্ত অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে ছড়িয়ে পড়বে দক্ষিণ দিকে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কোনো দিনই এ রকম ছিল না। আন্দোলন বরং হয়েছে বিপরীত দিকেই। ১৭ অক্ষাংশ অঞ্চল থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে দুটি মাত্র পথ। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষগুলোর কথা বাদ দিলে, দুটি পথই হল সায়গন বাহিনীর দৃঢ় কবজায়। প্রথম থেকেই প্রধান প্রধান সামরিক তৎপরতা অনুষ্ঠিত হয়েছে একেবারে দক্ষিণের গভীরে। সায়গনের বৃহৎ সামরিক পরাজয়গুলোও ঘটেছে এই অঞ্চলেই। বস্তুতঃ প্রথম মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত কা-মাউ উপদ্বীপ এলাকায়। সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হবার বহু পূর্বে, এই অঞ্চলেই দিয়েমী বাহিনী একাধিক উল্লেখযোগ্য সামরিক জয়লাভ করেছিল। তারপর থেকে অধিকাংশ লড়াই হয়েছে এই অঞ্চলেই; সায়গনে মার্কিন সামরিক শক্তির সর্ববৃহৎ সমাবেশের একেবারে লাগোয়া অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও। মেকং ব-দ্বীপের সংগে উত্তর ভিয়েতনামের সংযোগ রক্ষাকারী সবকটি সড়কই হল মার্কিন-সায়গনের দখলে। এবং গেরিলা তৎপরতার অন্যতম প্রধান কাজই হল এই

সমস্ত সড়ক বিনষ্ট করা ও কেটে ফেলা। সামরিক সরবরাহের ব্যাপারে গেরিলারা যদি এই সড়কগুলোর উপরেই নির্ভরশীল হয়, তা হলে সেই সড়কগুলো বিনষ্ট করা অবশ্যই একটি বিচিত্র সামরিক কৌশল রূপে গণ্য হবে। নিজেদের এলাকার সংগে সমস্ত রকম যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য গেরিলারা অবিরাম চেষ্টা করে থাকে। কারণ তাদের সামরিক তৎপরতা মুখ্যত হল আত্মরক্ষামূলক—নিজেদের বাড়িঘর ও গ্রাম রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। কিন্তু শুরু থেকেই লাল ছোপগুলোকে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত করবার ঝোঁক দেখা গেছে—উল্টোটা নয়।

আর, অস্ত্রশস্ত্র সম্ভবতঃ আসে উত্তর থেকে? গেরিলাদের অস্ত্রশস্ত্র যে একেবারে আদিম ধরনের ছিল, এ বিষয়ে পাশ্চাত্য সংবাদপত্রের সবগুলো প্রতিবেদনই একমত। এমন কি দিয়েমী সরকারও তার সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদের দেখাবার উদ্দেশ্যে সায়গনে 'ভিয়েতকং' অস্ত্রশস্ত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, সেগুলো দেখে সরকারী সৈন্যেরা যাতে বুঝতে পারে যে, তাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। (নতুন নতুন মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র হাতে পাবার সংগে সংগে গেরিলারা তাদের পুরনো যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল, তাই দিয়েই যে আয়োজন করা হয়েছিল সেই প্রদর্শনীর, এ কথাটি দিয়েম নিশ্চয়ই উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন।) পাশ্চাত্য সংবাদপত্রের সমস্ত প্রতিবেদনেই বলা হয়েছিল যে, ওই সমস্ত 'অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত' সৈন্যেরা স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, ক্রমবর্ধিত দ্রুততার সংগে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ফ্রন্ট বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিচ্ছে।

পূর্বোল্লিখিত লক-নিন্‌'এর যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ডেভিড হলবারস্টাম তাঁর ১৯৬৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের সামরিক ভাষ্যে মার্কিন-সায়গন বাহিনীর 'দুর্দশা'র উল্লেখ করেন, এবং মার্কিন সরকারী আশাবাদকে সমালোচনা করে মন্তব্য করেন: "কৃত্রিম পরিসংখ্যানের উপরে অতি

মাত্রায় আস্থা স্থাপন করা হচ্ছে। বিগত দুই মাসের হিসাবে দেখা যায় যে, অস্ত্রশস্ত্র দখলের আনুপাতিক হার আশংকাজনকভাবে সরকারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে : অনুপাতিক হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ :১। আজকেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, বিগত সপ্তাহে ভিয়েতকংরা সরকারের ২২৫টি অস্ত্র হস্তগত করেছে। পক্ষান্তরে সরকার পক্ষ ভিয়েতকংদের কাছ থেকে অধিকার করেছে মাত্র ১০০টি অস্ত্র।" মন্তব্যের উপসংহারে হলবারস্টাম বলেন: "১২৫টি অস্ত্র নিয়ে গেরিলারা কি করতে পারে এ কথা যার জানা আছে, অথবা কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে ১২৫টি অস্ত্র কেড়ে নেবার চেষ্টা যে করেছে, এমন লোক নিশ্চয়ই জানে এই অস্বস্তিকর অনুভূতির কারণ কি। সুড়ংগের এক প্রান্তে যদি কোনো বাতি রাখা থাকে, (প্রেসিডেন্ট কেনেডির মন্তব্য), তা হলে সেটাকে জ্বালানো হয়েছে কি না সে কথা অপর প্রান্ত থেকে বলা খুব শক্ত।"

কয়েক দিন পূর্বেই সেক্রেটারি অফ স্টেটস ডীন রাস্ক, উত্তর থেকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ও 'হস্তক্ষেপ' সম্বন্ধে অভিযোগ করেছিলেন। এই বিষয়ে নুয়েন ও থোকে প্রশ্ন করায়, তিনি আমাকে বলেন: "পেন্টাগন প্রকাশিত সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৬৩ সালের শেষ তিন মাসে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রতি সপ্তাহে গড়পড়তা ২৩৪টি অস্ত্র অধিকার করেছে। এই আনুপাতিক হারের সংগে আমাদের নিজস্ব অস্ত্র উৎপাদনের হার যোগ করলে যা দাঁড়ায়, তা দিয়ে মুক্তি ফৌজকে খুব ভাল ভাবে সজ্জিত করা যায়। তা ছাড়া, আমেরিকানরা তাদের অভিযোগের স্বপক্ষে সামান্যতম প্রকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণও আজ অবধি উপস্থাপিত করে নি।"

একটি কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করা যদি সম্ভবও হয়, তবুও গভীর অরণ্য ও ভয়ংকর আন্নামী পর্বতশ্রেণীর খাড়া, বন্ধুর ৬০০ মাইলেরও অধিক দীর্ঘ সরবরাহ পথ দিয়ে মনুষ্যপৃষ্ঠ বাহিত অস্ত্র সরবরাহের উপর নির্ভর করে কোনো সেনাপতিই তাঁর সামরিক তৎপরতা বজায় রাখতে পারেন না। যাই

হোক না কেন, ফ্রন্ট বাহিনীর প্রয়োজন হল এমন অস্ত্রের, যার গোলা-গুলির অবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অকুস্থানে নিরন্তর অব্যাহত রাখা যায়। ফ্রন্টের জনৈক সামরিক নেতা এই প্রসঙ্গে একবার আমাকে বলেছিলেন, "আমাদের প্রধান অস্ত্রভাণ্ডার রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই ; আমাদের সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা নির্ভর করে রয়েছে ওদেরই ট্রাক, হেলিকপ্টার আর প্যারাস্যুটের উপরে। অতি উৎকৃষ্ট ধরনের অস্ত্র এবং সেগুলোতে ব্যবহারযোগ্য গোলা-গুলি ওরাই আমাদের সরবরাহ করে থাকে ; একেবারে ফ্রন্টের দোর গোড়ায় ; যেখানে আমাদের প্রয়োজন ঠিক সেইখানে।" মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে অতগুলো সৈন্য-ঘাঁটি পরিত্যাগ করে চলে আসার স্বপক্ষে জেনারেল হারকিন্স যে প্রধান যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, তা হল, এই সমস্ত ঘাঁটি ছিল ফ্রন্টকে অস্ত্র যোগান দেবার মুখ্য উৎস। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সমগ্র উত্তর ভিয়েতনামকে মুছে ফেলে দিলেও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না।

অবশ্য একটি প্রশ্ন নিয়ে তর্ক করা চলতে পারে। সেটা হল, অনুপ্রেরণা, নেতৃত্ব ও প্রযুক্তি বিদ্যার জ্ঞান—অন্ততঃপক্ষে এই তিনটি জিনিস নিশ্চিতভাবে উত্তর থেকে আসছে কি না? জবাবে বলা যায়, জনবলের স্পষ্টতই কোনো প্রয়োজন নেই। মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চল হল বিশ্বের সবাপেক্ষা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর অন্যতম। এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, ফ্রন্ট নিয়ন্ত্রিত এলাকায় জনবলের কোনো কমতি নেই। অগণিত যে সমস্ত সাধারণ সৈনিকদের আমি দেখেছি, তাদের বয়স হবে ১৩ থেকে ১৯ বৎসরের মধ্যে, এবং ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডারের পদ অবধি অফিসারদের বয়স হবে ২৬ থেকে ৩৫ বৎসরের মধ্যে। স্থানীয় স্বয়ং-প্রতিরক্ষী দলে সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত করে স্নাতক হয়ে সৈন্যেরা ফ্রন্টের নিয়মিত বাহিনীতে আসে। সেনাপতিরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় গেরিলা নেতা হিসাবে কাজ করে এবং বর্তমান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে স্নাতক হয়েছেন। কিন্তু অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বের প্রশ্নের আরেকটি দিকও রয়েছে।

উত্তর এবং দক্ষিণ দুই মিলিয়ে সারা ভিয়েতনামে সব চাইতে সংগ্রামী অঞ্চল হল মেকং ব-দ্বীপ এলাকা—বিশেষ করে মাঙ্গ-থো এবং বেন-ত্রে প্রদেশ দুটি। এই স্থানেই ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে ফরাসীদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিরাটাকারে বিদ্রোহ ঘটেছিল। ইন্দোচীনে ফরাসীদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য জাপানী-থাই সম্মিলিত আক্রমণের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ফরাসীরা কিছু সংখ্যক সৈন্য ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কাম্বোডিয়ায়। এরই সুযোগ নিয়ে, বাধ্যতামূলক ভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান ও অসহ্য করভারের বিরুদ্ধে কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেই সশস্ত্র বিদ্রোহের সময়েই জন্ম হয়েছিল আজকের লাল পতাকার মধ্যে হলুদ তারকা খচিত ভিয়েতনাম ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের। (যে-সমস্ত গ্রামে সেই বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল, সেই সমস্ত গ্রামেই সর্বপ্রথম দিয়েমী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল।) সামরিক মানচিত্রে বর্তমানে যে লাল ছোপগুলো রয়েছে, সেগুলো ওই সময়েই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল দক্ষিণে; উত্তরে নয়।

ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধও উত্তরে শুরু হবার ঠিক এক বছর আগে আরম্ভ হয়েছিল মেকং ব-দ্বীপে; ১৯৪৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। এবং, ১৯৫৫ সালে সশস্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে দিয়েম দমন করবার পরই, তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র অভিযান ছড়িয়ে পড়েছিল ব-দ্বীপ অঞ্চলে। অতীতের দিনে বিদ্রোহ উত্তর থেকে রপ্তানি করা হয় নি। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যেখানে-যেখানে পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল, সেখানেই শুরু হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। সশস্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছিলেন দিয়েম। এবং পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত ঘটনার পরই ওই সম্প্রদায়গুলো ব-দ্বীপ অঞ্চলে সরে যায় ও বিক্ষিপ্তভাবে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকে। অবশেষে ১৯৬০ সালে তারা নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীকে ফ্রন্টের সংগে মিলিত করে।

প্রবৃত্তি বিস্তার প্রশ্নে মনে রাখতে হবে যে, ব-দ্বীপ অঞ্চলের

কৃষকেরা প্রায় ২৫ বৎসর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। বিশ্বের সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ এই গেরিলা যোদ্ধাদের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে সুপ্রচুর। তৎকালীন প্রতিটি ফরাসী জেনারেল ও মার্শাল তথা তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ডি ল্যাটারে ডি তাসিঙ্গি, কারো মনেই এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আজ সেই গেরিলাদের সামরিক কলা-কৌশলের জ্ঞান হয়েছে অনেক বেশী। সব কিছু দেখে শুনে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, গেরিলাদের হাতে যে কোনো ধরনের অস্ত্রই পড়ুক না কেন, তাদের প্রতিটি সশস্ত্র দলই সেই অস্ত্র ব্যবহার করতে সক্ষম। যে-কোনো 'ভিয়েতকং' গেরিলা দলই তার অগ্রজ 'ভিয়েতমিন'এর চাইতে অনেক বেশী বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন। এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, 'ভিয়েতমিন'রা কোনো অংশে কম ছিল না। এই যে পার্থক্য, এটা কি উত্তর থেকে আগত প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষকদের কারণে হয়েছে? আমি সে কথা বিশ্বাস করি না; এবং এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণও পাই নি।

'বিশেষ যুদ্ধে'র আরেকটি সৃষ্টি হল এই উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞান। স্থানীয় কোনো সেনাবাহিনীর সংগে যুদ্ধ করতে হলে, স্থানীয় অফিসার, এন. সি. ও. এবং প্রয়োগবিদ্‌দের সার্বিকভাবে যোগ্য করে তুলতে হয়। এদের মধ্যে যারা পুরনো দিনের বিশেষজ্ঞ, তাদের অনেককেই হয়ত 'এক্সপিডিশনারি কোর'-এর একান্ত সং. ক্ষত হিসাবেই রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু ভিয়েতনামীদের ভারি মেশিনগান, বাজুকা, মর্টার, কামান, ইত্যাদি চালনার ব্যাপারে শিক্ষা দান করায় ফরাসীদের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কারণ সেই ভিয়েতনামীরাই হয়ত গিয়ে দাঁড়াত ফরাসীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু 'বিশেষ যুদ্ধে'র প্রয়োজনীয়ত অনুসারে আমেরিকানরা স্থানীয় সামরিক প্রয়োগ-বিদ্‌দের হাজারে হাজারে শিক্ষা দিয়ে যোগ্য করে তুলতে বাধ্য হয়েছিল। এবং কালক্রমে প্রশিক্ষণরত ভিয়েতনামীরা ক্রমবর্ধিত হারে ফ্রন্ট বাহিনীতে যোগদান করতে থাকে। জটিল অস্ত্রশস্ত্র সংগে করে নিয়ে যেতে না পারলেও, নিজেদের জ্ঞান ভাণ্ডার তারা সংগে করেই নিয়ে গিয়েছিল।

ফ্রন্টের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এই সমস্ত ব্যক্তিদের শিক্ষকরূপে ব্যবহার করা হতে থাকে। ফলে, ফ্রন্ট বাহিনীর মর্টারের গোলার আশ্চর্যজনক নিখুঁত নিশানা, বাজুকার সুযোগ্য ব্যবহার ও বন্দুক দাগার স্থানগুলোর অতি উন্নত ধরনের নিপুণ প্রয়োগ বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে অত্যল্পকালের মধ্যেই মার্কিন উপদেষ্টাদের কাছ থেকে শোনা যেতে থাকে অভিযোগের পর অভিযোগ। আসলে, অস্ত্রশস্ত্রের মতো, প্রযুক্তি বিদ্যার জ্ঞানও আসে ওই একই উৎস থেকে।

'বিশেষ যুদ্ধে' মার খাওয়া প্রথম জেনারেল হিসাবে বিখ্যাত, জেনারেল হারকিন্সকে ১৯৬৪ সালের মে মাসে বরখাস্ত করা হয়। তিনি যদি দার্শনিক মনোভাবাপন্ন হন, তা হলে নিম্নলিখিত উক্তিগুলোর মধ্যে সান্ত্বনা পেতে পারেন: অতি উন্নত ধরনের মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং সেই অস্ত্র ব্যবহারে পরোক্ষভাবে হলেও, মার্কিন শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষিত, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গেরিলাদের কাছে তিনি পরাজয় বরণ করেছেন। এবং সুবিখ্যাত সব ক'জন ফরাসী জেনারেলেরই ওই একই হাল হয়েছিল। জেনারেল হারকিন্স অতগুলো পরাজয় বরণ করেও যে-ভাবে অতদিন টিকে ছিলেন, সেরকম তাঁরা কেউই টিকতে পারেন নি। সব শেষে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের অরণ্যে সম্মান খোয়ানোর ব্যাপারে তিনিই যে শেষ জেনারেল নন, এ বিষয়ে হারকিন্স নিশ্চিত থাকতে পারেন। তাঁর বদলী হিসাবে আগত জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের ভাগ্য বলতে হবে যে, তাঁর নিয়োগ ঘোষিত হবার পূর্বে, সেই দিনই একটুর জন্য তিনি বেঁচে যান। বিমানের ভিতরে তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট অফিসারদের মধ্যে তিন জন নিচের থেকে নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে আহত হন। গুলি সম্ভবত এসেছিল সেই সমস্ত সৈনিকদের কাছ থেকে, যাদের সেনাপতিত্ব করতে চলেছিলেন জেনারেল সাহেব।

'উত্তর থেকে সাহায্য আসা' সম্বন্ধে যতদিন না কোনো বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন এই সমস্ত অভিযোগকে অতি-অবাস্তবিকর

তথা ব্যাখ্যার অসাধ্য পরাজয়গুলোকে চাপা দেবার অজুহাত হিসাবে তুচ্ছ করা যেতে পারে। যাই বলা হোক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে, বিমান, হেলিকপ্টার, ট্যাংক, কামান, (মনুষ্য পৃষ্ঠবাহী অস্ত্রাদি ছাড়া) নৌশক্তি এবং মোটর পরিবহণের ব্যাপারে সায়গনের মার্কিন কমাণ্ডের রয়েছে একচেটিয়া অধিকার। মুক্তিফৌজের এ সমস্ত কিছুই নেই। যতদূর দেখেছি, একটি মোটর ট্রাকও নেই তাদের। কার্যকরী শক্তির উৎকর্ষ বিচার করলে, মুক্তি ফৌজের চাইতে মার্কিন কমাণ্ড হল সব দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠ। তবু তাদের হটে যেতে হয়েছে সায়গনের দ্বারপ্রান্ত অবধি। ব্যাপারটি খুবই অস্বস্তিকর তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু হ্যানয়কে দোষ দিয়ে অথবা তার উপর বোমা বর্ষণ করে, কিংবা টনকিন উপসাগরে মার্কিন বিমান আক্রমণ চালিয়ে এর জবাব পাওয়া যাবে না। ফ্রন্ট নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বোমা বর্ষণ করবার মতো রেলপথ, সেতু, কারখানা ইত্যাদি আর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই। প্রকৃতই যদি ফ্রন্টের সরবরাহের উৎসের উপরে আমেরিকানরা বোমবাজি করতে চায়, তা হলে নিজেদের কারখানাগুলোর উপরেই তাদের বোমা বর্ষণ করতে হবে। কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশী কার্যকরী ব্যবস্থা হবে অস্ত্রশস্ত্র সংগে নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে চলে যাওয়া।

উত্তর অংশের কোনো সৈন্যকে দক্ষিণ অং দেখা গেছে, এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যায় নি। কিন্তু এর বিপরীত বহু ঘটনা দেখা গেছে। ১৯৬৩ সালের জুন মাস থেকে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত, এই সাত মাসে বিমান থেকে প্যারাস্যুটের সাহায্যে অবতীর্ণ অথবা জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়া মার্কিন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তেরটি কমাণ্ডো ও অন্তর্ঘাতী দলকে উত্তর ভিয়েতনামে গ্রেপ্তার করে সামরিক আদালতে বিচার করা হয়েছিল। একটি ঘটনায় ১৭শ অক্ষরেখার উত্তর দিকে কমাণ্ডো দল এবং প্যারাস্যুটসহ সম্পূর্ণ প্রস্তুত একটি বিমানকে গুলি করে নামানো হয়। উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক,

জেনারেল ভো হুয়েন গিয়াপ আমাকে বলেন যে, সায়গনে হুয়েন খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই ধরনের কার্যকলাপ আরো বেড়ে গেছে। সাধারণতঃ তাদের ছোট ছোট দলে পাঠানো হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন :

"আপনাকে সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এই ধরনের সমস্ত অন্তর্ঘাতী দলকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে আমাদের অসামরিক জনসাধারণ কিংবা স্থানীয় স্বয়ং-প্রতিরক্ষাবাহিনী। সামরিক তথ্যাদি সংগ্রহ তথা অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ এদের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, কিছু কিছু 'অসন্তুষ্ট গোষ্ঠী'কে সংগঠিত করবার চেষ্টাও এরা করে। অবশ্য তথাকথিত 'অসন্তুষ্ট গোষ্ঠী'র অস্তিত্ব রয়েছে কেবলমাত্র ওদের প্রভুদের কল্পনায়।" তিনি আরো জানান যে, কুয়োমিনটাং ও লাওসের দালালদের এই কাজে নিযুক্ত করবার পরিকল্পনা সায়গন করেছে। কিন্তু গিয়াপ সুনিশ্চিত যে, তাদেরও কাল ঘনিয়ে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই সমস্ত অন্তর্ঘাতী দলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

উত্তর ভিয়েতনামে যুদ্ধ সম্প্রসারণের মার্কিন চক্রান্তকে হ্যানয় অতীব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে। হ্যানয়ের আশংকা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ হল ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে টনকিন উপসাগরের ঘটনাবলী এবং উত্তর ভিয়েতনামের তৈল গুদাম ও উপকূলবর্তী কলকারখানাগুলোর উপর মার্কিন বিমানের হানা। যুদ্ধ সম্প্রসারণের নীতি পরীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন যে কতদূর অগ্রসর হতে প্রস্তুত, উপরিউক্ত ঘটনাবলী তারও ইংগিত বহন করে। দক্ষিণ অংশের সংগ্রামকে প্রভাবিত করবার উদ্দেশ্যে এই কাজগুলো করা হলেও, ফলাফল কিন্তু হয়েছে বিপরীত। এর প্রথম সরাসরি প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনসাধারণের ক্রোধ ফেটে পড়ে, এবং সেই ক্রোধের চরম প্রকাশ হিসাবে সায়গন, হুয়ে এবং অন্যান্য শহরে একের পর এক ছাত্রদের

বিক্ষোভ মিছিল দেখা যায়। এর ফলে, স্বল্পকালের জন্য হলেও, খুয়েন খানকে তাঁর গদী ছাড়তে হয়। বড় বড় শহরগুলোতে এই সমস্ত বিক্ষোভ মিছিলের আয়তন ও বলিষ্ঠতা এবং সেই সংগে সমন্বিতভাবে মুক্তি ফ্রন্টের সামরিক তৎপরতা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আশা করা যায়, এখন থেকে শহরের শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পূর্বের চাইতে অনেক বেশী করে এই সংগ্রামে সরাসরি অংশ গ্রহণ করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এই যুদ্ধের 'সমন্বয় সাধনে' সচেষ্ট হয় এবং যুদ্ধকে উত্তর অংশে ঠেলে দিয়ে একটি মাত্র রণাঙ্গন গঠনের চেষ্টা করে, তা হলে প্রথম যুক্তিসম্মত পরিণতি স্বরূপ সম্ভবতঃ সারা দেশ সামরিক দিক থেকে হবে ঐক্যবদ্ধ। এবং সেটা নিশ্চয়ই ওয়াশিংটন কিংবা সায়গনের শর্ত অনুযায়ী হবে না। এ ছাড়া, লাওসে অবস্থিত মার্কিন বিমানবহর উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণের চেষ্টা করলে, আমেরিকাকে ইন্দোচীনে একটি মাত্র রণাঙ্গণ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

আপস মীমাংসার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের আশা

এক কথায়, এই 'বিশেষ যুদ্ধে' ব্যর্থতা বরণ করবার পর, ওয়াশিংটনকে এবার পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে মনস্থির করতে হবে। ১৯৬৪ সালের প্রথমার্ধে উচ্চ পর্যায়ের যে একাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মনস্থির করবার ব্যাপারে ওয়াশিংটন বেশ মুশকিলে পড়েছে। এবং, তাদের সম্মুখে একাধিক পথও খোলা নেই। 'বিশেষ যুদ্ধ' থেকে সরে 'সীমাবদ্ধ যুদ্ধে'র পর্যায়ে উপনীত হওয়া বলতে যা বোঝায়, তা হল দক্ষিণ ভিয়েতনামে আরেকটি 'দ্বিতীয় কোরিয়া' সৃষ্টি করা। এবং কোনো রকম মার্কিন নিরাপত্তা অথবা অন্য কোনো স্বার্থের দোহাই দিয়েও যে উক্ত ব্যবস্থাকে সমর্থন করা যাবে না, সে সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম

মহল থেকে বারংবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, 'সীমাবদ্ধ যুদ্ধ' যে আপনা থেকেই 'বিশ্বব্যাপী পরমাণবিক যুদ্ধে'র পর্যায়ে চলে যাবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? খুব বেশী সম্মান না খুইয়ে আমেরিকানরা যাতে ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যেতে পারে, তার জন্য মুক্তিফ্রন্ট আমেরিকাকে কতখানি 'ছাড়' দিতে প্রস্তুত, সে কথা আমি মুক্তিফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনাকালে জিজ্ঞাসা করেছি। শুধু তাই নয়, সায়গনে কোনো এক ধরনের অভ্যুত্থান ঘটিয়ে যুদ্ধকে কতখানি সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন, সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছি। যে অভ্যুত্থান ফ্রন্টের দ্বারা পরিচালিত না হলেও, এমন একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে পারবে, যার সংগে তাঁরা আপস আলোচনা চালাতে পারবেন। আরো জানতে চেয়েছি, আপস-আলোচনার ভিত্তিই বা কী হবে? সমাধানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কোনো সম্মেলন কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে?

প্রশ্নের জবাবে হুয়েন হু থো বলেছিলেন, সায়গনের যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণতা, সেনাপতিদের নিজেদের ভেতরে বিরোধ, জনসাধারণের মধ্যে সার্বিক অসন্তোষ, খানের অনায়াস সামরিক অভ্যুত্থান, এই সমস্ত থেকে আর একটি অথবা একাধিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন কি ওয়াশিংটনের অনভিপ্রেত কোনো অভ্যুত্থানও ঘটে যেতে পারে।

আরো বলেছিলেন, "ফ্রন্ট সম্বন্ধে বলতে পারি, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে এবং কারো কোনো অতীত কার্যকলাপ বিচার না করেই আমরা সমস্ত পার্টি, দল, সম্প্রদায়, দেশপ্রেমিক প্রভৃতির সংগে আপস-আলোচনায় বসতে রাজি আছি, যদি তার দ্বারা জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং নিরপেক্ষতা-ভিত্তিক শান্তিপূর্ণ সমাধান আসে। কিন্তু আমরা চাই, বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই দক্ষিণ ভিয়েতনামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা সমাধান করবে। চুক্তির

ভিত্তি স্বরূপ, সমস্ত মার্কিন সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্র এবং সমর-সম্ভারসহ ভিয়েতনাম থেকে চলে যেতে হবে। সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে ফ্রন্ট কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিরোধী নয়। তবে, সেই সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী বৈদেশিক শক্তিগুলোর ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকবে শুধমাত্র প্রস্তাব পেশ করা এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামী পার্টিগুলোর মধ্যে কোনো ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলে তা লিপিবদ্ধ করা তথা সেই চুক্তি কার্যকরী করবার দায়িত্বগ্রহণের মধ্যে।"

থো আরো বলেছিলেন যে, ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতার যে মৈত্রী গড়ে উঠছে, সেই অনুসারে ফ্রন্ট সমস্ত দলের সংগে মিলে-মিশে কাজ করতে প্রস্তুত ; এমন কি যারা ফ্রন্টের বিভিন্ন কর্মসূচীর বিরোধী, তাদের সংগেও। যুদ্ধে জয়লাভ করা, কিংবা পরবর্তীকালে সরকার গঠন করা আমাদের একচেটিয়া অধিকার বলে আমরা দাবি করি না। অতীতকে, এমন কি বর্তমানকেও আমরা ভুলে যেতে প্রস্তুত। আমরা বলি : 'তোমরা যে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ এবং যুদ্ধ বন্ধ করতে চাও, এই যথেষ্ট। তোমাদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা চলব।' এবং আমরা যা বলি, তাই করি। কোনো নীতি একবার নির্দিষ্ট হলে, আমরা তা প্রয়োগ করি এটা কোনো চমক সৃষ্টিকারী প্রচার নয়। যে সমস্ত অফিসার আজ মার্কিন-সায়গন সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করছে, তাদের আমরা বলি : 'যদি তোমরা আমাদের দেশপ্রেমিকদের হত্যাও করে থাকো ; যদি তোমরা অপরাধও করে থাকো, তবুও আমরা তা মেনে নেবো। শুধু সে কাজের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে হবে, এবং দেশপ্রেমের পথে ফিরে আসতে হবে।'

বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে থো বলেছিলেন, 'সৈনিকরা যে বিভিন্ন কারণে শত্রুবাহিনীতে রয়েছে, সে কথা ফ্রন্ট জানে। সাধারণ সৈনিকদের অধিকাংশকেই বাধ্যতামূলকভাবে সেনা বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। অফিসারদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। একমাত্র সেনা বাহিনী ছাড়া অন্য সমস্ত রুজি-রোজগারের পথ ইচ্ছাপূর্বক বন্ধ করে দেবার ফলে, বহু অফিসার সেনা বিভাগে যোগদান করতে বাধ্য

হয়েছে অর্থ উপার্জনের জন্য।'

"এই ধরনের লোকদের একক অথবা দলগতভাবে জনগণের স্বপক্ষে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করার ব্যাপারে ফ্রন্ট যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। শত্রুপক্ষের কোনো সৈন্যদল সায়গন কমাণ্ড ছেড়ে পালিয়ে আসতে চাইলে, আমরা সর্বদা তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। বাস্তব কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে, তৎক্ষণাৎ তা দেওয়া হয়। ওরা ওদের নিজস্ব সংগঠন বজায় রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। ফ্রণ্টে যোগ দিতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাকতা নেই। ইচ্ছা করলে নিজেদের রাজনৈতিক তথা আদর্শগত মতবাদও ওরা বজায় রাখতে পারে। আমরা তাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করি না। আমাদের একমাত্র শর্ত হল, মার্কিন হস্তক্ষেপকারী ও সায়গনস্থিত তাদের তাঁবেদারদের বিরোধীতা করতে হবে। উচ্চপদস্থ আমলাদের ক্ষেত্রে, আমাদের দেশপ্রেমিকদের রক্তে যাদের হাত রঞ্জিত হয়েছে, কেবলমাত্র তাদেরই আমরা বিরোধীতা করে থাকি। কিন্তু এ ধরনের লোকের সংখ্যা নগণ্য। অন্যদের সংগে সহযোগিতা করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। সায়গন সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সাধারণ সৈনিক থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ আমলা ও কর্মচারিদের কাছ থেকে আমাদের এই নীতির প্রভূত সমর্থন পাওয়া গেছে।"

হুয়েন হু থো এই প্রসংগে জানান যে, সামরিক বিজয়ের সংগে সংগে ফ্রন্টের সম্মান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সায়গন প্রশাসনের বহু ব্যক্তি হাওয়ার গতি অনুমান করে সেই মতো নিজেদের খাপ খাওয়াতে শুরু করেছে। ফ্রন্টের সংগে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'বেশ উচ্চ মহলের' ব্যক্তিদের কাজে লাগানো হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বেশ মজার একটি ব্যাপারের উল্লেখ করেন। মুক্ত অঞ্চলের প্রশাসনিক পদগুলোতে নিয়োগের অছিলায় ফ্রন্ট অসামরিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছে। "কিন্তু সায়গন প্রশাসনে বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তিরা গোপনে এই প্রশিক্ষণ

কার্যক্রমে যোগদান করে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তারা এটা করে থাকে।"

সত্য-সত্যই সায়গন বাহিনীর কোন ইউনিট কখন পালিয়ে এসে স্বাধীনভাবে তৎপরতা চালাবার উদ্দেশ্যে ফ্রন্টের সাহায্য গ্রহণ করেছে কি না, সে কথাও জানতে চেয়েছিলাম হুয়েন হু থো'র কাছে। উত্তরে তিনি একটি কাও-দাই বাহিনীর উদাহরণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ইউনিটটি বেশ বড়, এবং ফ্রন্টের অন্তর্ভূক্ত নয়। এদের নিজস্ব কমাণ্ড এবং পতাকা রয়েছে। কিন্তু এরা আমাদের কাছ থেকে বাস্তব সমর্থন পায়, এবং ফ্রন্টের সামরিক কার্যকলাপের সংগে নিজেদের সামরিক তৎপরতার সমন্বয় সাধন করে সব সময় চলে। ত্রা-ভিন্ প্রদেশের অন্তর্গত কান্-লঙ গ্রামের অপর একটি প্লেটুন কিছু দিন আগেই নিজেদের অফিসারদের হত্যা করে পালিয়ে যায় এবং আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে। আমরা তাদের সাহায্য দিয়েছি। তারাও স্বাধীনভাবে নিজেদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। প্লেটুনটি ধীরে ধীরে বেশ বড় একটি ইউনিটে পরিণত হচ্ছে, এবং আমরা ওদের সাহায্য তথা সমর্থন করে যাচ্ছি। এই ধরনের আরো অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। আমাদের 'ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতা'-র নীতি লোকে যত ভাল করে জানতে পারবে, ততই এই ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে পেতে বিরাট এক আন্দোলনের রূপ নেবে। এটা সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতি।"

এই আলোচনার সময় হুয়েন হু থোর সংগে উপস্থিত ছিলেন বিন্-জুয়েন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেফটেনাণ্ট কর্নেল ভো-ভান্-মন্। সায়গন তাঁকে নিহত বলে বহুবার প্রচার করেছে। বিন্-জুয়েন্ বাহিনীর সংগে ফ্রন্ট বাহিনীর সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন, "চারিদিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে দিয়েমী সেনাবাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মার খাবার পর আমাদের যা কিছু রক্ষা পেয়েছিল, সেগুলোকে একত্রিত করে যতদিন পর্যন্ত ফ্রন্ট গঠিত না হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা স্বাধীনভাবে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর ফ্রন্টের সংগে যোগদান করি। শত্রুর প্রচার যন্ত্র আমাদের বারংবার সতর্ক করেছে। বলেছে, স্বাধীনভাবে থাকা আমাদের পক্ষে হবে অসম্ভব। কম্যুনিস্টরা আমাদের গিলে ফেলবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এখনো আমাদের নিজস্ব সংগঠন রয়েছে। সমস্ত স্তরে রয়েছে আমাদের নিজেদের কর্মী। লড়াইটা শুধু আমরা করি ফ্রন্টের যুগ্ম কমাণ্ডের অধীনে।"

একটু থেমে হুয়েন ত থো এবং সেখানে উপস্থিত প্রেসিডিয়ামের অপর কয়েকজন সদস্যের প্রতি নির্দেশ করে আরো বলেছিলেন, একাধিক বৎসর ধরে এঁদের সংগে সহযোগিতা করে, ফ্রন্টের পন্থা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল। তারপর একটি সভায় মিলিত হয়ে ফ্রন্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু এখনো আমাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রয়েছে। কম্যুনিস্টরা আমাদের গিলে ফেলবে বলে যে প্রচার কার্য চালানো হয়েছিল, তার অসত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। যেটা সত্য, তা হল, প্রতিদিন ফ্রন্টের জনসমর্থন ও শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।"

আলোচনার বিষয়বস্তুকে আবার আমি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম পূর্বেকার প্রশ্নে। কি ভাবে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো যায়, এবং আমেরিকার পক্ষে কোনো রকমে মুখ রক্ষা করে ভিয়েতনাম থেকে চলে যাবার পথ প্রশস্ত করা যায়? ফ্রন্ট যে জনসাধারণের বিরাট একটি অংশের সমর্থন আদায় করতে পেরেছে, এটা স্পষ্ট। এবং এর প্রভাব যে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করেছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। এমন কি হতে পারে না যে, অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের ভিতর থেকে যে কোনো দিন সায়গনে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটবে, এবং সেই ব্যক্তি এমন একটি কর্মসূচী উপস্থাপিত করবেন যা ফ্রন্ট সমর্থন করতে পারবে? এই ধরনের কোনো অবস্থা উপস্থিত হলে ফ্রন্ট কি তার সায়গনের সংগঠনকে কর্মতৎপর করে তুলবে?

উত্তর পেয়েছিলাম—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফ্রন্ট তা করবে। এই ধরনের

কোনো ঘটনার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ফ্রন্ট নেতৃত্ব দিবারাত্র কাজ করে যাচ্ছেন এবং কোনো 'অনুকূল অভ্যুত্থান' ঘটলে, তাকে তৎক্ষণাৎ তথা কার্যকরী সমর্থন জানাবার জন্যও ফ্রন্ট প্রস্তুত রয়েছে। সেই সংগে কিন্তু আমাকে একথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এই ধরনের সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে সুদূর প্রসারী কোনো রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। সেটা করা যায় একমাত্র 'বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের' উপর ভিত্তি করে। সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক-সামরিক সংগ্রামের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁদের চিন্তা করতে হয়েছে। আর কিছু না হলেও, উচ্চতর রাজনৈতিক পর্যায়ে কোনো সামরিক অভ্যুত্থান সম্ভবতঃ ঘটবে। কিন্তু আমেরিকানরা সত্যি যদি মুখ রক্ষা করে বেরিয়ে যেতে চায়, তা হলে ইতিমধ্যেই যখন তারা দুটি অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে তখন তৃতীয় আরেকটিই বা ঘটাতে দোষ কি? এমন একটি অভ্যুত্থান যাতে শান্তি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে কেউ আপস-আলোচনা চালাতে প্রস্তুত থাকবে? শেষোক্ত সম্ভাবনার কথাটি রসিকতা করে বলা হলেও, ওয়াশিংটন এ বিষয়ে চিন্তা করবার পরিবর্তে, অধিকতর খারাপ কিছু করতে পারত। মোট কথা, হুয়েন হু থো'র ধারণা, ওয়াশিংটন আরো কয়েকজনকে নিয়ে চেষ্টা করে দেখবে, এবং আরো কয়েকটি পরাজয় বরণ করবার পরেই বাস্তব ভিত্তিক আপোস-আলোচনায় সম্মত হবে।

প্রেসিডেণ্ট দ্যগল যে দক্ষিণ ভিয়েতনামসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরপেক্ষতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধেও আমি প্রশ্ন করেছিলাম। জবাবে হুয়েন হু থো বলেন যে, কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম শিহানুকের 'কাম্বোডিয়া, লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে একটি নিরপেক্ষ অঞ্চল গঠনের' প্রস্তাব ফ্রন্ট আগেই সমর্থন করেছে। "প্রেসিডেণ্ট দ্যগলের সাম্প্রতিক বক্তব্যকে আমরা বাস্তব সম্মত বলে মনে করি। জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট এ ধরনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়।"

স্বাধীন দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ফ্রান্সের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক

গড়ে ওঠা সম্বন্ধে থো বলেন, "দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাল সম্পর্ক ; বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বহুদিন ধরেই রয়েছে। সমকক্ষতা ও পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে ফ্রন্ট সর্বদাই আগ্রহী। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্স চিরদিনই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত স্থান অধিকার করে থাকবে বলে আমরা আশা করি। অবশ্য, মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ভিয়েতনামী জনগণ বর্তমানে যে সংগ্রাম করছে, তার প্রতি ফ্রান্সের কি মনোভাব, তার উপরেই নির্ভর করছে সব কিছু।

এই প্রসংগে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বার করতে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে ফরাসী সরকার সম্প্রতি যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সে দিকে আমরা গভীর আগ্রহের সংগে নজর রাখছি।"

পরবর্তীকালে হ্যানয়ে যখন প্রেসিডেণ্ট হো চি মিন'-এর সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনিও বলেছিলেন যে, প্রেসিডেণ্ট দ্যগলের মন্তব্য 'গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য', এবং মুক্তিফ্রণ্টের প্রস্তাবই হল সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অর্থাৎ, "স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রশ্নের সমাধান করবে দক্ষিণ ভিয়েতনামেরই জনগণ। এবং, এর প্রথম শর্ত স্বরূপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যেতে হবে, ও ১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তিকে মান্য করে চলতে হবে।"

মার্কিন নীতি নির্ধারকদের যদি সামান্যতম বাস্তবতাবোধ নিয়ে সমস্যা সমাধানের মতলব থাকতো, তা হলে মনে হয় উপরিউক্ত পন্থাতেই তাঁরা একটা সমাধান খুঁজে পেতেন। দক্ষিণ ভিয়েতনাম তথা সমগ্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্যা সমাধানের এই হল তাঁদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তার বদলে, 'যতদিন না দক্ষিণ ভিয়েতনাম

থেকে সমস্ত কম্যুনিস্টদের বিতাড়িত করা হয়' ততদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে বলে ওয়াশিংটন থেকে যে অযৌক্তিক, বিরক্তিকর ও একঘেয়ে ঘোষণা করা হয়ে থাকে, তা হল স্রেফ দেউলিয়া, অকর্মন্য প্রচার। এই প্রসংগে নুয়েন হু থো বলেছিলেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে 'কম্যুনিজম' সম্বন্ধে মার্কিন ভাষ্য অনুসারে, "এই ভীতি প্রদর্শনের অর্থ হল, যতদিন পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের তাদের নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত না করা হবে, ততদিন আমেরিকা এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে মনস্থ করেছে। এই ধরনের দম্ভোক্তির সমুচিত জবাব ভিয়েতনামী দেশপ্রেমিকরা দেবেই।"

বস্তুতঃ, হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করে সমস্ত ভিয়েতনামী ও তাদের বহু প্রতিবেশীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ছাড়া, অন্য কোনো ধরনের সামরিক সমাধান চাপিয়ে দিয়ে আমেরিকানরা কোনো দিনই দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।

উপসংহার

মুক্তিফৌজের নতুন অগ্রবর্তী ঘাঁটি

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৫ সাল।

১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষ থেকে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসের গোড়া অবধি আমি পুনরায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্ত অঞ্চল ও রণাঙ্গন পরিদর্শন করলাম। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে দেখলাম বিরাট পরিবর্তন। পূর্বে মুক্তিফৌজের যে সমস্ত কোম্পানি ও ব্যাটেলিয়ন দেখেছিলাম, সেগুলোকে এখন দেখলাম যথাক্রমে ব্যাটেলিয়ন ও রেজিমেন্ট বিকশিত অবস্থায়। গতবারে সায়গনের মাইল সাতেক দূরে শত্রু নিয়ন্ত্রিত যে 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট' দেখেছিলাম সেটিকে এবার দেখলাম, মুক্ত করা হয়েছে এবং হ্যামলেটের পাহারাদার ঘাঁটি দুটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে।

দেখলাম আরো অনেক কিছু। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে পূর্বে যে সমস্ত সড়ককে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলা হয়েছিল, সেগুলোকে মেরামত করা হয়েছে। কারণ ওই সমস্ত সড়ক এখন পড়ে গেছে মুক্ত অঞ্চলের অনেক ভিতরে, নিরাপদ এলাকার মধ্যে। কিন্তু উত্তর সায়গন থেকে বহির্গত, উচ্চ মালভূমির মধ্যস্থিত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বান্-মি-থুয়োট অভিমুখী অতি-প্রয়োজনীয় ১৩নং সড়কের মতো বহু রাস্তাকেই করে দেওয়া হয়েছে অকেজো। মাইলের পর মাইল ধরে পথের মাঝে নিয়মিত দূরত্বে গেরিলারা কাদা ও পাথর দিয়ে প্রতিবন্ধক ব্যূহ নির্মাণ করেছে, এবং সেগুলো কেউ যাতে সরাতে না পারে তার জন্য পাহারাদারীতে নিয়োগ করেছে তীক্ষ্ণ-সন্ধানী বন্দুকধারী সৈনিকদের। আমি ওই অঞ্চলে থাকতেই মার্কিন বৈমানিকরা নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া জঙ্গী বিমান থেকে রকেট নিক্ষেপ করে ওই সমস্ত ব্যূহ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যতটুকু তারা উড়িয়ে দিত, রাত্রিকালে সেটুকুকে মুহূর্তের মধ্যে পুনঃস্থাপিত করত গেরিলারা।

অসামরিক যান-বাহন চলাচলে গেরিলারা বাধা দিত না। সায়গন থেকে উত্তরগামী সমস্ত অসামরিক যান-বাহন ওই প্রতিবন্ধক ব্যূহ-শ্রেণীর মুখে আটকানো হত। বাসযাত্রীরা সেখানে নেমে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে ব্যূহশ্রেণীর শেষ প্রান্তে গিয়ে সেখান থেকে উত্তরগামী অন্য কোনো বাস ধরতে পারত। বয়স্ক এবং শিশুসন্তানসহ মাতাদের সাহায্য করত গেরিলারা। কিন্তু সামরিক যান-বাহন ব্যূহ শ্রেণীর নিকটে পৌঁছবার অনেক আগেই পড়ত গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমণের কবলে। ফলে তাদের যাতায়াত করতে হত অনেকখানি ঘোরা পথ দিয়ে।

বিখ্যাত ম্যাকনামারা 'পরিকল্পনা' রচিত হয়েছিল গেরিলাদের 'শায়েস্তা করবার' উদ্দেশ্যে। এবং তার জন্য প্রারম্ভিক পর্যায়ে বেছে নেওয়া হয়েছিল একটিমাত্র প্রদেশ লঙ-আন্‌কে। কিন্তু সেই পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়। বস্তুতঃ 'শায়েস্তাকরণ'

প্রচেষ্টা চালু থাকা কালেই লঙ-আন্ প্রদেশে মুক্ত অঞ্চল বিস্তার লাভ করে।

ম্যাকনামারা পরিকল্পনা কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে মধ্য ভিয়েতনাম থেকে সায়গনের নিয়মিত সেনাবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। মুক্তি-ফ্রন্ট সেই সুযোগে পরপর কতগুলো তীব্র আক্রমণ চালিয়ে, চারমাসে বারো লক্ষ অধিবাসীসহ বিরাট এলাকা মুক্ত করতে সমর্থ হয়। এটা ছিল ১৯৬৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের নিদারুণ বিধ্বংসী তাইফুন এবং বন্যার ঠিক আগের ঘটনা।

প্রসংগত বলে রাখি, বন্যা-পীড়িত এলাকা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সংগে আমি দেখা করেছিলাম। সায়গনের হিসাব অনুযায়ী বন্যায় মারা গিয়েছিল সাত হাজার মানুষ। উদ্বাস্তুরা সবাই আমাকে একবাক্যে জানিয়েছে যে, যে সমস্ত স্থানে অধিবাসীদের 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-এর মধ্যে গাদাগাদি করে আটকে রাখা হয়েছিল, সেই সমস্ত স্থানেই মারা গিয়েছিল অধিকাংশ মানুষ বহু স্থানে বন্যার জল ছয় কিংবা সাত ফুটে দাড়ালেও, হ্যামলেটগুলোকে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। নিরুপায় মানুষ পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দেওয়াল ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসার সংগে সংগে তাদের উপর চালানো হয়েছিল মেশিনগান। এবকম বহু ঘটনার কথা আমি শুনেছি। সব চাইতে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল কোয়ঙ নাই প্রাদেশিক রাজধানীর ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-এ। সেখানকার হ্রী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর তিন শ' অধিবাসীর মধ্যে রক্ষা পেয়েছিল মাত্র তিন জন। বাকীরা যখন পালিয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে, তখন তাদের গুলি করে মারা হয়। এবং, কোয়াঙ তিঙ প্রদেশের তাম-কাই গ্রামের একটি বন্দীশালার ভিতরে জল যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখনো প্রহরীরা দরজা খুলে দিতে অস্বীকার করে। ফলে বন্যার জলে ডুবে মারা যায় ৪০৭ জন রাজনৈতিক বন্দী। পক্ষান্তরে পুরনো অথবা নতুন যে সমস্ত মুক্ত অঞ্চলে 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'গুলোকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল, সেই সমস্ত

অঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে একটিও জীবনহানির ঘটনা ঘটে নি।

মুক্তিফৌজের 'শত্রু ঘাঁটি নিশ্চিহ্নকরণ তথা বাড়তি সরবরাহ ধ্বংস করা' কৌশলের একমাত্র যে জবাব মার্কিন সায়গন কমাণ্ড খুঁজে পেয়েছে, তা হল ছোট ছোট ঘাঁটি পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া, অথবা বলপূর্বক বিতাড়িত হওয়া, এবং তৎপরিবর্তে ব্যাটেলিয়ন কিংবা রেজিমেণ্ট আকারের ছাউনী গঠন করে সেখানে কেন্দ্রীভূত হওয়া। গেরিলারা অবশ্য এগুলোকেও ঘিরে রেখেছে চারিদিক থেকে। কিন্তু এই ধরনের একাধিক ঘাঁটি থেকে সায়গন বাহিনী যে-কোন একটি গ্রামের উপর একযোগে কামান দাগতে পারে ও ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পাঁচ শ'য়ের মতো গোলা বর্ষণ করবার সামর্থ রাখে। বস্তুতঃ মার্কিন-সায়গন পক্ষ যুদ্ধকে ক্রমশঃ বিমান ও কামান আক্রমণের দিকে নিয়ে চলেছে। মুক্তি ফৌজের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক কয়েকটি সামরিক তৎপরতা ছাড়া, ১৯৬৪ সালে স্থলপথে সামরিক তৎপরতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে. স্থলপথে বৃহদাকার সামরিক অভিযানের সংখ্যা ১৯৬৩ সালে যেখানে ছিল এক ডজনের মতো, ১৯৬৪ সালে তা কমে এসে দাঁড়ায় মাত্র চারটিতে। এর মধ্যে একটি আবার ছিল আত্মরক্ষামূলক। ১৯৬৪ সালের সারা বছরের মধ্যে মার্কিন-সায়গন কমাণ্ড একটি যুদ্ধেও জয়লাভ করতে পারে নি। বরং নিদারুণ বিপর্যয়করী পরাজয় বরণ করেছে। বছরের শেষের দিকের পরাজয়গুলো হয় আরো বড় আকারের। এবং ১৯৬৫ সাল, বিন্-গিয়া ও সক-ত্রাঙ-এর যুদ্ধে সর্বাত্মক জয়মাল্য পরিয়ে দেয় মুক্তি ফৌজের কণ্ঠে।

মার্কিন-সায়গন বিমান বহর ও গোলন্দাজ বাহিনীর হাতে এই যুদ্ধ ক্রমশঃ চলে যাবার সংগে সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নগ্ন আক্রমণকারী চরিত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ প্রতিটি বৈমানিক তথা বিমান-কর্মীদের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে অর্ধেক হল আমেরিকান; এবং আমেরিকান অফিসারেরাই প্রকৃতপক্ষে চালাচ্ছে প্রতিটি গোলন্দাজ ইউনিট। সেই 'অফিসার' পদমর্যাদায় শুধুমাত্র যদি সার্জেন্টও হয়,

তবুও সায়গনের জুনিয়র অফিসারদের উপর তার রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব।

১৯৬৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে যেদিন আমি প্রেসিডেন্ট ন্যুয়েন হু থোর সংগে সাক্ষাৎ করি, সেদিন ছিল মুক্তিফ্রন্টের চতুর্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই সময় প্রশ্ন করেছিলাম, 'বিশেষ যুদ্ধে'র জনক এবং অতি-রাষ্ট্রদূত জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর নতুন কোন পরিকল্পনা সংগে করে নিয়ে এসেছেন কি না।

থো জবাব দিয়েছিলেন, "নতুন কিছুই আনেন নি। অতীতে ফরাসীরা বহুবার সেনাপতি বদল করেছিল; এবং প্রতিটি নতুন সেনাপতিই সংগে করে নিয়ে এসেছিলেন নতুন সব পরিকল্পনা। কিন্তু জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলরের কাছ থেকে নতুন কিছু দেখবার জন্য এখনো আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি। বহুল প্রচারিত বিগত ওয়াশিংটন ভ্রমণের পরও নতুন কিছুই তিনি আনেন নি। এনেছেন শুধু আরো কয়েক শত মার্কিন 'উপদেষ্টা' এবং আরো কিছু বিমান, ট্যাংক ও কামান। কিন্তু বোমা আর কামান দিয়ে তো আর যুদ্ধ জয় করা যায় না। কোনো এলাকা দখল করতে হলে তা করতে হয় পদাতিক বাহিনী দিয়ে। এবং এখানেই হয়েছে ওদের সত্যিকারের সংকট। প্রকৃত তথ্য হল, ম্যাক্সওয়েল টেলর এখানে আসবার পর থেকে, ওদের পরাজয়গুলো হচ্ছে আরো বড় ধরনের এবং বিপর্যয় হচ্ছে আরো গুরুতর আকারের। এ দোষ হল আগ্রাসী যুদ্ধের; অন্যায় যুদ্ধের। এই ধরনের যুদ্ধে অতি উচ্চ পর্যায়ের সামরিক বিশেষজ্ঞ, সুদক্ষ সেনাবাহিনী অথবা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের প্রশ্ন বড় কথা নয়। বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের উপরে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অবশ্যই নির্ভরশীল। কিন্তু সেই শক্তি কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জামের নয়। সবার উপরে রয়েছে মনোবল, এবং সেইটিই হল আসল প্রশ্ন। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নির্ভর করে মানবিক শক্তির উপরে। কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্রের শক্তির উপরে জয়-পরাজয় নির্ভরশীল হলে, বহু পূর্বেই আমরা শেষ হয়ে যেতাম। কারণ ওদের তুলনায় অস্ত্র-শস্ত্রের শক্তি আমাদের অনেক কম। কিন্তু আসলে কি হচ্ছে? দিনের

পর দিন ধ্বংস হচ্ছে ওয়াই। কোনো ম্যাক্সওয়েল টেলরই এর কোন পরিবর্তন করতে পারবে না।"

আমাদের সাক্ষাৎকারের মধ্যে দু'বার বাধা উপস্থিত হয়েছিল। একবার এসেছিল একটি বোমারু বিমান। মাথার উপর চক্কর দিতে দিতে বিমানটি নেমে এসেছিল অনেকখানি নিচুতে। আরেকবার এসেছিল একজন বার্তাবাহক; সায়গনে 'নবীন জেনারেলদের' অভ্যুত্থান ও সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদের সদস্যদের গ্রেপ্তারের সংবাদ নিয়ে। আমেরিকানদের দ্বারা সায়গনে রাজনৈতিক স্থায়ীত্ব আনয়নের সম্পূর্ণ অসম্ভাব্যতা এবং অনুরূপ স্থায়ীত্ব ছাড়া ওদের পক্ষে যুদ্ধ যে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেই বিষয়ে তখন ব্যাখ্যা করছিলেন হুয়েন হু থো। এমন সময় হাজির হল বার্তা-বাহক; ঠিক একটি যতি চিহ্নের মতো। (বোমারু বিমানটি সম্বন্ধে আমরা মোটেই চিন্তিত ছিলাম না। কারণ বিশাল একটি অশ্বত্থ গাছের ডালপালা বিমানের শ্যেনদৃষ্টি থেকে আমাদের উপযুক্তভাবে আড়াল করে রেখেছিল। তা ছাড়া, বোমা বর্ষণ হলে আত্মরক্ষার্থে কয়েক গজ দূরেই ছিল চমৎকার আশ্রয়স্থল।)

মনোবলের উদাহরণ হিসাবে ৩১শে অক্টোবর তারিখের মধ্য-রাত্রির কয়েক মিনিট পূর্বে বিয়েন হোয়া বিমান ক্ষেত্রের উপর আক্রমণের ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। বি-৫৭ বিমান হল আমেরিকার পারমাণবিক বোমারু বিমান বহরের গর্বস্বরূপ। উক্ত আক্রমণে একুশটি বি-৫৭ বিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এছাড়া, আরো পনেরটি বিমান এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, সেগুলো আর মেরামত করা সম্ভব ছিল না। মুক্তিফৌজের যে দলটি ওই আক্রমণ চালায় তার অধিনায়ক ছিলেন হুইন মিন। ছোট-খাটো, হাসি-খুশী এই মানুষটির সংগেও আমার সাক্ষাৎকার হয়েছিল। আক্রমণের কথা বলতে গিয়ে একগাল হেসেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বৎসর পূর্বেও হুইন মিন ছিলেন সাধারণ একজন কৃষক। এবং যে স্থানটিতে তিনি ছাব্বিশ লক্ষ পাউণ্ড

মূল্যের পারমাণবিক বোমারু বিমান ধ্বংস করেছিলেন, ঠিক সেই স্থানেই কয়েক বৎসর পূর্বেও ছিল তাঁর ধানের ক্ষেত। সেই ক্ষেত তিনি চাষ করতেন। দলের অন্যান্য লোকদের মতো তাঁর বাড়ি-ঘরও বুলডোজার দিয়ে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন ক্ষুদ্র বিয়েন হোয়া বিমান বন্দরের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জমি দখল করা হয়েছিল তাঁদের ধান ক্ষেত ধ্বংস করে। দলের লোকদের পরিবার-বর্গ বর্তমানে ওই অঞ্চলেরই একটি 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'-এ বন্দী জীবন যাপন করছেন। সুতরাং দলের অধিনায়কের আসল নাম যদি হুইন মিন না হয়, তবে তার কারণও সহজবোধ্য।

অতি-উন্নত এই বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করতে আমেরিকানরা ৩৫ হাজার কৃষিজীবিকে ৩১০ হেক্টর জমি থেকে উৎখাত করেছিল। পরবর্তীকালে বিয়েন হোয়া প্রদেশের মুক্ত গ্রামগুলোতে বোমা বর্ষণ এবং বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ছড়াবার কাজে তারা ব্যবহার করত এই বিমানঘাঁটি। হুইন মিনের ইউনিটের প্রতিটি মানুষেরই কোনো না কোনো আপনজন হয় নিহত হয়, নতুবা অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে। এখনো অনেকে বন্দী-জীবন যাপন করছে ফাসিস্ত কারাগারে।

হুইন মিন-এর ইউনিট প্রথমে ছোট্ট একটি গেরিলাদল রূপেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু অধিকৃত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্রমশঃ তা একটি সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত সশস্ত্র ইউনিটে পরিণত হয়। এই প্রসংগে [illegible] বলেছিলেন, "প্রথমে যখন আমরা মর্টার অধিকার করি, তখন কি ভাবে সেগুলোকে ব্যবহার করতে হয় তা জানতাম না। তাই সেগুলোকে অর্পণ করতাম নিয়মিত বাহিনীর হাতে। কিন্তু পরে স্থির করলাম নিজেদেরই এই ব্যাপারে পাকাপোক্ত হতে হবে। এখন আমরা নিখুঁত নিশানায় মর্টার দাগতে পারি; এমন কি, প্রয়োজন হলে তেপায়া অথবা নি[illegible]র চাকতি ছাড়াই।

সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে যতগুলো অতীব সুরক্ষিত বিমান ঘাঁটি রয়েছে, বিয়েন হোয়া হল তাদের অন্যতম। মাকিন সংবাদপত্রগুলো

পরে জানায় যে, উক্ত বিমান ঘাঁটিতে বি-৫৭ বোমারু বিমানের উপস্থিতি ছিল অতীব গোপনীয় সামরিক তথ্য। কিন্তু বি-৫৭ বোমারু বিমান যে ওই ঘাঁটিতে রয়েছে সে কথা মিন এবং তাঁর দলের লোকেরা জানতেন। ঘটনার কয়েকদিন আগেই তাঁরা একখানা বি-৫৭ বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছিলেন। সেই বিমানের দলিলপত্র থেকেই বিয়েন হোয়াতে উক্ত বিমান বহরের উপস্থিতির কথা তাঁরা জ্ঞাত হন।

বিমান ঘাঁটিটিকে আগলে ছিল প্রধান প্রতিরক্ষা ব্যূহের তিনটি সারি। প্রথম সারিতে ছিল পর পর সৈন্য ঘাঁটি ও প্রহরা-মঞ্চ, এবং সেগুলোর মধ্যে মধ্যে 'স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট'। দ্বিতীয় সারিতে ছিল ১৮টি প্রহরা-মঞ্চ ও ১২টি সৈন্যঘাঁটি ; এবং সেগুলোর ভারপ্রাপ্ত ছিল সায়গন নিয়মিত বাহিনীর দুটি ব্যাটেলিয়ন। তৃতীয় সারিতে ছিল কাঁটাতারের পাঁচটি লাইন ও প্রতিটি লাইনের মধ্যবর্তী স্থানে মাইন পাতা। এ সমস্তর পিছনে ছিল বিমান ঘাঁটির রানওয়ে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আড়াই হাজার মার্কিন বৈমানিক ও প্রশাসনিক তথা সামরিক কর্মচারীদের জন্য গ্যারিসন সদন কার্যালয়। মূল ঘাঁটির বাইরে প্রায় আটশ' গজ দূরে ছিল নিয়মিত বাহিনীর তৃতীয় একটি ব্যাটেলিয়নের শিবির, এবং কয়েক মাইল দূরে বিয়েন হোয়া শহরে আরো দুটি ব্যাটেলিয়নের ছাউনী। এ ছাড়া বিমান ঘাঁটির প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সাত মাইল উত্তরে ফুয়োক থান প্রদেশের রাজধানী তান উয়েন শহরে ছিল ১৫৫ এম. এম. কামানের একটি গোলন্দাজ দল। (এই কামানের পাল্লা হল নয় মাইল।)

ঘটনাস্থলের অনতিদূরে অরণ্যের ভিতরে একটু ফাঁকা জায়গায় বসেছিল আমাদের ছোট্ট সাংবাদিক বৈঠক। সেই বৈঠকে মিন বলেছিলেন, "বিমান ঘাঁটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পরই প্রথম কর্তব্য হল ইউনিটের লোকদের কাছে কাজের মোটামুটি একটি খসড়া উপস্থাপিত করা। সৈনিকরা সবাই একত্রিত হয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। স্থির হল, তিনটি ঘটনার বদলা হিসাবে এই

আক্রমণ করা হবে। এক, সুয়েন ভান ত্রোই'-এর হত্যা (ত্রোই ছিলেন সায়গনের কর্মী। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তাঁকে গুলি করে মারা হয়েছিল); দুই, টনকিন উপসাগরে আমেরিকার জলদস্যু সুলভ আক্রমণ এবং তিন, থিয়েন হোয়া প্রদেশের নন ক্রচ গ্রামে আমাদের দেশভক্ত সাথীদের পাইকারী হত্যা (কয়েক সপ্তাহ আগে নন ক্রচ গ্রামের ধীবরদের সামপানের উপরে বিমান আক্রমণ চালিয়ে চারশ' ধীবর ও তাদের পরিবারবর্গকে হত্যা করা হয়েছিল।) দলের প্রতিটি মানুষ, এমন কি অসুস্থ ব্যক্তিরাও এই অভিযানে অংশ গ্রহণের দাবি জানাতে লাগল। অবশেষে বিশেষ একটি সভায় অসুস্থ ব্যক্তিদের বোঝান হল যে, তাদের সংগে নিলে কাজেরই বরং ক্ষতি হবে। আমাদের চলতে হবে তড়িৎগতিতে; প্রতিটি কাজ করতে হবে নিখুঁতভাবে।"

কিভাবে যে ওতগুলো সৈন্য ঘাঁটি ও প্রতিরক্ষা ব্যূহ অতিক্রম করে দলবল সহ মিন ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন, সে কথা অবশ্য তিনি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন নি। কিন্তু 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট'-গুলোর বাসিন্দাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সহায়তা যে তাঁদের প্রভূত সাহায্য করেছিল, সে কথা বলেছিলেন।

মিন আরো বলেছিলেন, "অনুপ্রবেশের ব্যাপারটি ছিল খুবই জটিল। যাই হোক, গুলি চালাবার হুকুম যখন দেওয়া হল, তখন প্রতিটি দলই প্রস্তুত হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত মর্টার ও কামান একই সংগে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য ছিল বিমান বহর। নিমেষের মধ্যে বজ্র নির্ঘোষে বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেল আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে লাফিয়ে উঠল আকাশে। উত্তেজনার আধিক্যে গোলন্দাজেরা যেন হয়ে পড়ল বেসামাল। প্রতিটি গোলা নিখুঁতভাবে গিয়ে পড়তে লাগল লক্ষ্যবস্তুর উপরে আর বিমানগুলো জ্বলে উঠতে লাগল দাউ দাউ করে। সেই সংগে গোলন্দাজেরা চীৎকার করে লাফিয়ে উঠতে লাগল: 'শুয়োর, এই নাও আমার স্ত্রীর বদলা,' 'এটা হল সুয়েন ভান ত্রোই'এর বদলা,'

"আর কখনো তোমায় বোমা ফেলতে হবে না।' বিমানগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটতে আরম্ভ হল। কোনো কোনোটির মধ্যে আবার বোমাও ছিল। বোমাসুদ্ধ বিস্ফোরিত হল সেগুলো। প্রচণ্ড গর্জনে বয়ে গেল আগুনের ঝড়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা শত্রু সৈন্যের ব্যারাকগুলোর উপরে গুলি চালাতে শুরু করলাম। প্রথম আক্রমণেই প্রহরামঞ্চটি ওদের হাতছাড়া হয়ে গেল। ভীতিগ্রস্ত আমেরিকান ও পুতুল সৈন্যরা ট্রেঞ্চ অভিমুখে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। পুতুল সৈন্যেরা বিদ্রোহ করেছে ভেবে আমেরিকানরা গুলি চালাতে আরম্ভ করল তাদের লক্ষ্য করে। জবাবে গুলি চালালো দিয়েমী সৈন্যেরাও। হতাহত হল একুশ জন আমেরিকান।

"অবস্থা বেগতিক দেখে আমেরিকানরা বিমানগুলোকে আকাশে উঠে সেখান থেকে আক্রমণ চালাবার আদেশ দিল। কিন্তু প্রথম বিমানটিকে আমরা উড়বার মুখেই গুলি করে নামালাম। প্রচণ্ড শব্দে সেটি ভেঙে পড়ল রানওয়ের উপরে। ফলে, বিমানের ওঠা-নামার পথও হয়ে গেল বন্ধ।

"যে মুহূর্তে বিয়েন হোয়াতে আমাদের মর্টারগুলো অগ্ন্যুদগার শুরু করেছিল, সেই মুহূর্তেই আমাদের অপর একটি ইউনিট তান-উয়েন' এ অবস্থিত গোলন্দাজ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়, এবং কয়েক মিনিটের ভিতরেই ১৫৫ এম. এম কামানদুটি ধ্বংস করে ফেলে। তান-উয়েন-এ তখনো আক্রমণ চলছে; সেই অবসরে আমরা সবাই সরে পড়লাম। তারপর গিয়ে যোগ দিলাম তান-উয়েন এ আক্রমণকারী ইউনিটের সংগে। আমাদের দুটি বাহিনীর কারোরই কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয় নি। এবং বিয়েন হোয়া বিমান ঘাঁটির অগ্নিশিখায় আলোকিত পথ দিয়ে মূল শিবিরে প্রত্যাবর্তনের সময়, সেই আলো আমাদের হৃদয়েও জ্বালিয়ে তুলল আশা-আনন্দের আলো।"

কাহিনীর সমাপ্তি টেনে মিন বললেন, "কাস্তের আঘাতে ধান গাছ যেভাবে ধরাশায়ী হয়, সেইভাবে পরে শাস্তি পেল পুতুল সৈন্যেরা। বিয়েন হোয়া বিমান ঘাঁটির ভারপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেলকে চরম সাজা

দেওয়া হল। প্রাদেশিক মুখ্য শাসনকর্তা, আটশ' গজ দূরে অবস্থিত ব্যাটেলিয়নটির অধিনায়ক, বিমান বন্দরে অবস্থিত উভয় ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত জনৈক ক্যাপ্টেন, সবারই অবস্থা হল তদনুরূপ। বিমান ঘাঁটি রক্ষার্থে কোনো ইউনিটই একটি আঙুলও তোলেনি।"

কাহিনী শেষ করলেন মিন। হুয়েন হু থো যে 'বিশেষ বিষয়টি'র কথা পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন, তারই একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করলেন হুইন মিন।

এই 'বিশেষ বিষয়ে'র অপর একটি উদাহরণস্বরূপ ১৯৬৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে উভচর ট্যাংকের একটি বাহিনীকে ধ্বংস করার ঘটনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। আলোচ্য বাহিনীতে ছিল চোদ্দটি ট্যাংক। মুক্তি ফৌজের আক্রমণকারী ইউনিটটি কেবলমাত্র হাল্কা পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। কিন্তু এত কাছ থেকে তারা আক্রমণ করে যে, ট্যাংকের ভারি কামানগুলোকে পাল্টা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সঠিক নিশানায় স্থির করবার অবকাশই পায় নি দিয়েমীরা। এই আক্রমণে চোদ্দটি ট্যাংকই ধ্বংস হয়, এবং নয় জন আমেরিকান নিহত হয়।

মার্কিন সায়গন বাহিনী ক্রমশঃ পিছু হটে সায়গন, হুয়ে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান শহরের চারিদিকে 'লৌহ বেষ্টনী' গঠনের চেষ্টা করছে। ফ্রন্ট বাহিনী ও জনসাধারণ বে বর্ষণের মোকাবিলা করছে ভূগর্ভস্থ সুড়ংগে আশ্রয় নিয়ে; এবং কামান আক্রমণের মোকাবিলা করছে জেলা ও গ্যারিসন কেন্দ্রগুলোর উপরে আরো ঘন ঘন আক্রমণ চালিয়ে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়েছে কামানগুলোকে ধ্বংস করা। বিয়েন হোয়ার মতো ঘাঁটিও রক্ষা করা যায় নি। সায়গনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'দি ব্রিংক' নামক অফিসারদের হোটেল তথা ক্লাবে চরম নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, ওই ছুটিকে খৃষ্টমাস ইভ-এর দিন বো। মেরে উড়িয়ে দিয়েছে গেরিলারা। এই দুটি ঘটনাই প্রমাণ করে যে, ফ্রন্ট বাহিনী ইচ্ছা করলে যে

কোনো স্থানে অনুপ্রবেশ করতে পারে। জনসাধারণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সংহতি থাকলে তবেই এ জিনিস সম্ভবপর।

যুদ্ধে যে ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে সেগুলোকে পূরণ করা সায়গন বাহিনীর পক্ষে আর সম্ভব নয়। কারণ সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তির ব্যাপারে যে গ্রামাঞ্চলের উপর তাদের সর্বাধিক ভরসা করে থাকতে হত, তা বলতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ফ্রন্টের হাতে চলে গেছে। এবং শহরগুলোর উপরে প্রতিটি আক্রমণের সংগে সংগেই নব নিযুক্ত সৈন্যেরা আরো অধিক সংখ্যায় পালিয়ে গিয়ে যোগদান করছে মুক্তি ফৌজে। মার্কিন-সায়গন কমাণ্ডকে ১৯৬৪ সালে নিয়মিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার ঘাটতি দেখাতে হবে প্রায় ৮০ হাজারের মতো। অর্থাৎ, সেনা-বাহিনীতে নতুন নিয়োগের সংখ্যার চাইতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষয়-ক্ষতির সংখ্যা অন্ততপক্ষে আশি হাজার বেশী। বহু ইউনিটের অস্তিত্ব রয়েছে কেবলমাত্র কাগজ-পত্রে। বহু রেজিমেন্ট আসলে হল ব্যাটেলিয়ন; এবং বহু ব্যাটেলিয়ন প্রকৃতপক্ষে হল কোম্পানি। যে সমস্ত অফিসার সায়গনবাহিনী ত্যাগ করে জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টে এসে যোগদান করেছে, তাদের অনেকের সংগে কথাবার্তা বলে জেনেছি যে, সায়গন বাহিনীর প্রতিটি ইউনিটেই ঘাটতি রয়েছে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ লোকের। এগারোটি 'ইলাইট' অথবা 'শক্' ব্যাটেলিয়ন নিয়ে গঠিত সায়গনের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত বাহিনীর মধ্যে ৩৩ নং রেন্জার্স ও ৪র্থ মেরিন রাইফেলস্ ব্যাটেলিয়ন দুটি ২৯শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারি অবধি স্থায়ী বিন গিয়া'র যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এবং ৩৫ নং রেনজার্সের দুটি কোম্পানি ১৯৬৫ সালের ৩রা জানুয়ারি তারিখের একটি অতর্কিত আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে কার্যকারীতা এবং সর্বোপরি আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তিতে মুক্তিফৌজ দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। বহু অঞ্চলে ইতিমধ্যেই তারা মার্কিন-সায়গন কমাণ্ডের সমান-সমান কার্যকারীতা শক্তি অর্জন করেছে। বর্তমান ভ্রমণকালে যে সমস্ত রেজিমেন্ট আমি দেখেছি, তাদের কোম্পানিগুলোর আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি শত্রু পক্ষের চাইতে অধিক:

ব্যাটেলিয়ন পর্যায়ে অন্তত পক্ষে সমান-সমান এবং রেজিমেণ্ট পর্যায়ে, যেখানে শত্রু পক্ষের রয়েছে ট্যাংক, ভারি কামান এবং বিমান বহরের সহায়তা, সেখানেই কেবলমাত্র তাদের শক্তি হল শত্রু পক্ষের চাইতে কম।

বিমান বহরের সহায়তার মূল্য অবশ্য খুবই সীমাবদ্ধ। বিয়েন হোয়ার বিপর্যয়ের পর, সায়গন বিমান বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল গুয়েন কাও কাই স্বয়ং একটি বৃহৎ বিমান আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। মুক্তি ফৌজের যে ইউনিট বিয়েন হোয়া বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করেছিল, আনুমানিকভাবে সেই ইউনিটের উপরে এক নৈশকালীন বিমান আক্রমণে ১২৫ টন বোমা বর্ষণ করা হয়। কাই দাবী করেছিলেন 'শত শত ভিয়েতকং নিহত হয়েছে।' বস্তুতঃ কিন্তু একজনও হতাহত হয় নি।

বিমান আক্রমণের বহু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই রয়েছে। সেই দিক থেকে বিচার করলে আমার এই দ্বিতীয় ভ্রমণ প্রথমটির চাইতে কিছুটা যে অধিকতর উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, এ কথা মানতেই হবে। ভ্রমণের একটি পর্যায়ে আমেরিকানরা আমাদের ছোট্ট দলটির উপস্থিতির কথা টের পেয়ে যায়। দলে ছিলেন ফরাসী লেখিকা তথা প্রতিরোধ সংগ্রামের নেত্রীস্থানীয়া মেডেলিন রিফো। তিনি এসেছিলেন ল' হিউম্যানাইট পত্রিকার তরফ থেকে। আর ছিলেন কয়েকজন দক্ষিণ ভিয়েতনামী ফটোগ্রাফার ও ক্যামেরাম্যান। একবার, সারাদিন ধরে টহলদারী বিমান আমাদের ছায়ার মতো অনুসরণ করবার পর, রাত্রিকালে যে ছোট্ট ঝোপের মধ্যে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম গ্রহণ করেছিলাম, সেই ঝোপের উপর শেষ রাত্রে বোমা বর্ষণ করল—বিশেষ লক্ষ্য ছিলাম আমরাই। সাধারণতঃ বোমাবর্ষণের পূর্বে বিমানগুলো কয়েকবার চক্কর দিয়ে থাকে। কিন্তু এবার সে সব কিছুই করল না। সরাসরি আমাদের ওই ঝোপের উপরে এসে বোমা বর্ষণ করল। প্রথম বিস্ফোরণটি হল প্রায় ৩০০ গজ দূরে। সেটির বজ্র নির্ঘোষ অরণ্যের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে না

হওয়েই আমরা খোলনা বিছানা ছেড়ে গভীর পরিখার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। এই বিমান আক্রমণটি আমি শুরু থেকে শেষ অবধি, টেপ রেকর্ডারে ধরে রেখেছি। কারণ সেই সময় কি-একটি নৈশ পাখির ডাক রেকর্ড কববার চেষ্টা কবছিলাম। এমন সময় শুনতে পেয়েছিলাম বিমানেব শব্দ।

আর একবার, নিখুঁত নিশানার জন্যই হোক অথবা ভাগ্যক্রমেই হোক, ঘণ্টাখানেক আগে যে টেবিলের উপব আমরা আহার পর্ব সমাধা করেছিলাম, সেটি বোমাব আঘাতে টুকবো টুকরো হয়ে যায়। অন্য আরেক বার দুটি বেনজার (কমাণ্ডো) প্লেটুনেব একটি দল চার জন আমেরিকানেব নেতৃত্বে সোজা এসে আমাদের উপব ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ওদেব ধারণাই ছিল না যে, ওবা যখন অতি সতর্কভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল, সেই সময় ওদেব দিকেও এগিয়ে আসছিল ফ্রন্টের একটি টহলদারী দল। অপব একটি ঘটনায়, বিমান, এম-১১৩ ট্যাংক ও জলযান নিয়ে আমাদের আক্রমণ করা হয়। কিন্তু সেবাবে আমাদের রক্ষা করেছিল গুপ্ত সুড়ংগপথ। বোমা বর্ষণের সময় মাথার উপরে কয়েক ফিট পুরু মাটি থাকলে অনেক নিরাপদ মনে হয। বিমান শক্তির এলোপাথারি ব্যবহারে চূড়ান্ত ফলাফলের কোনো ইতর বিশেষ হয না।

আমেরিকানরা কিংবা তাদেব পুতুলেরা পুতুল-সবকারের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অধঃপতনকে কোনোক্রমেই রুখতে পারবে না। অবিচ্ছিন্ন, অন্তহীন ধারায় অভ্যুত্থান ও প্রতি-অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক সংকট, পুতুল ও প্রভুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মত-বিরোধ, এ সমস্তই দক্ষিণ-ভিয়েতনামে মার্কিন দেউলিয়াপনাকেই আরো স্পষ্টভাবে লোক সমক্ষে তুলে ধরছে। আমেরিকানদের পক্ষে তাই সব চাইতে ভালো হবে নিজের দেশে ফিরে যাওয়া।

টিকিটের লাইনে অভাবনীয় ভিড় এবং বিরাট সংখ্যক দর্শকের ...তাই দুর্ঘটনার কারণ। তাঁরা লাইনের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছেন বা এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চলে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, খেলা দেখার চরম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য ভিড়ের চাপে পড়ে যাওয়া লোকদের মাড়িয়ে যেতেও দ্বিধা বোধ করেন নি।

এর সঙ্গে অকল্যাণ্ড রোডে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারদের ব্যর্থতা। ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ভোর পর্যন্ত ওখানকার গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে তাঁরা ভিড় নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ দেননি। ঊর্ধতন অফিসারদের সাহায্য চাননি। রাত্রে কোন সিনিয়র অফিসারও 'রুটিন' ভিজিটে আসা প্রয়োজন মনে করেন নি।

ঘোড়ার পায়ের নিচে কেউ পিষ্ট হন নি

শ্রীসেন বলেন, সেদিন সকালে যে ছ'জনের মৃত্যু হয়েছিল তাদের কারুর শরীরে লাঠি বা অন্য কোন অস্ত্রের আঘাত ছিল না, ঘোড়ার পায়েও কেউ চাপা পড়েন নি। ধাক্কাধাক্কিতে যাঁরা পড়ে যান, তাদের উপরেই আবার অনেকে হুমড়ি খেয়ে পড়লে ওঁদের দম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরের ওই ঘটনার কথা আজ হয়ত অনেকে ভুলেছেন ; হয়ত প্রত্যক্ষদর্শীরা বা যাঁরা ঘটন সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁরাও। কিন্তু যেহেতু সাংবাদিক হিসাবে সেদিনের ওই মর্মান্তিক সকাল থেকে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করার দিন পর্যন্ত আমি প্রতিটি ঘটনা লক্ষ্য করেছি। দেখেছি, ঘটনার পরদিনের প্রত্যেকটি কাগজের নিউজ কাটিং সামনে রেখেছেন শ্রীসেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমি বলেছি, আমার রিপোর্টের কথা। কিন্তু বিস্মিত হয়েছি, শ্রীসেনের ওই ৬১ জন সাক্ষীর তালিকায় এই অধম সাংবাদকের নাম পর্যন্ত ছিল না, অথচ আমি লিখিত বক্তব্যও পেশ করি।

জানিনা, শ্রীসেন কার নির্দেশে এবং কেন এমন অনেকের সা[illegible] নিয়েছেন, যাদের কেউ কেউ ওই ঘটনা থেকে সাত মাইল বা [illegible] সমুদ্র তের নদীর পারে ছিলেন ওই দিন! জানিনা কার নির্দে[illegible] তার রিপোর্টের কোথাও ঘোড়া পুলিশের দাপাদাপি সম্পর্কে আম[illegible] অভিযোগটিও স্থান পায় নি?

রিপোর্ট পেশের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যের কাছে আমার ওই অভিযোগের কথা বলেছিলাম। কিন্তু কারুর কাছে কোন উত্তর পাই নি। তাঁরা বলেন, উনি ঝানু আই. সি. এস। যা ফ্যাক্ট পেয়েছেন, তদনুযায়ী রিপোর্ট পেশ করেছেন।

আমি কিন্তু একটা মিল পেলাম। লালবাজার ১৬ই ডিসেম্বর ভোর বেলাকার ঘটনার প্রেস ব্রিফিং তৈরি করেছিল রাইটার্সের সঙ্গে সারাদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনার পর এবং সন্ধ্যায় (সারাদিন পুলিশ মুখ খোলেনি) বলা হয় 'ক্যাটিগরিক্যালি' যে, ঘোড়ার পায়ে কেউ চাপা পড়েনি। শ্রী কে কে সেনের রিপোর্টেও সে কথা ছিল। এটি কাকতালীয় ব্যাপার নয়তো?